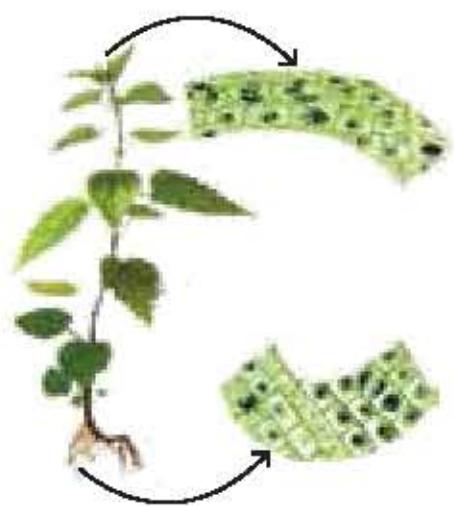
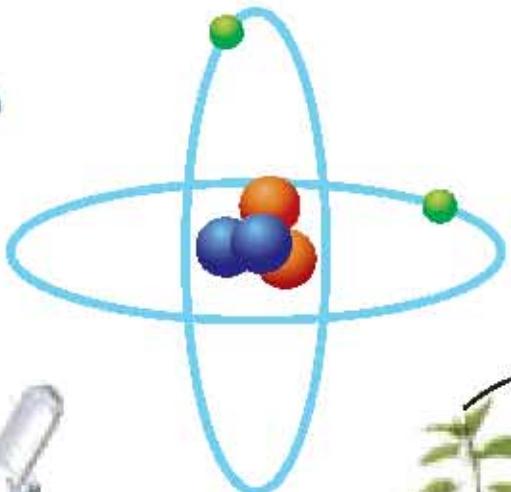


বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

বিজ্ঞান অষ্টম শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর ড. শাহজাহান তপন
প্রফেসর ড. সফিউর রহমান
প্রফেসর এস এম হায়দার
প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহানআরা
প্রফেসর ড. এস এম হাফিজুর রহমান
মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
ড. মোঃ আব্দুল খালেক
গুল আনার আহমেদ

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মোঃ আজিজুর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলা ও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাহাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের নিকট সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক করার লক্ষ্য বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলোর পাশাপাশি হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের কাজ দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির সাহায্যে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে উভরণের প্রয়োজনীয় জীবনদক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সক্ষম হবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিরাক্ষন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

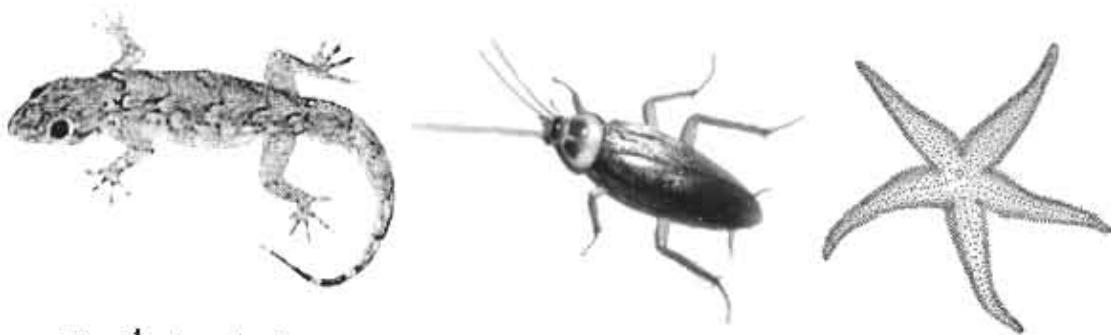
সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস	১-১২
দ্বিতীয়	জীবের বৃদ্ধি ও বংশগতি	১৩-২৩
তৃতীয়	ব্যাপন, অভিস্রবণ ও প্রস্তেবন	২৪-৩৩
চতুর্থ	উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি	৩৪-৪৪
পঞ্চম	সমন্বয় ও নিঃসরণ	৪৫-৫৪
ষষ্ঠ	পরমাণুর গঠন	৫৫-৬৪
সপ্তম	পৃথিবী ও মহাকর্ষ	৬৫-৭৪
অষ্টম	রাসায়নিক বিক্রিয়া	৭৫-৮৮
নবম	বর্তনী ও চলবিদ্যুৎ	৮৯-৯৭
দশম	আল্ল, ক্ষারক ও লবণ	৯৮-১০৭
একাদশ	আলো	১০৮-১১৮
দ্বাদশ	মহাকাশ ও উপগ্রহ	১১৯-১২৮
ত্রয়োদশ	খাদ্য ও পুষ্টি	১২৯-১৪৬
চতুর্দশ	পরিবেশ এবং বাস্তুতত্ত্ব	১৪৭-১৫৫

প্রথম অধ্যায়

প্রাণিজগতের প্রশিক্ষিন্যাস

পৃষ্ঠীতে অস্থি বিটিও ছেট বড় প্রাণী বাস করে। এদের মধ্যে রয়েছে নানাবৃক্ষ ফিল ও অফিল। এই বৈচিত্র্যময় প্রাণিগুলো রয়েছে আগুণীকৃতিক প্রাণী অ্যামিবা থেকে শুরু করে বিশাল আকাঙ্ক্ষীর তিথি। প্রাণীর বিভিন্নতা নির্ভর করে পরিবেশের বৈচিত্র্যের উপর। তিনি তিনি পরিবেশ ও বাসস্থানে প্রাণিবৈচিত্র্য তিনি মূল্য হয়। বিশাল এই প্রাণিগুলি সম্পর্কে জানা অভ্যন্তর কষ্টসাধ্য। সহজে সুসংজ্ঞাতাবে বিশাল প্রাণিগুলোকে জানার সহ্য এবং বিন্যস্তকরণ প্রয়োজন, আর বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে প্রশিক্ষিন্যাস বলে। প্রশিক্ষিন্যাস প্রাণিজগতেকে জানার পথ সহজ করে দিয়েছে।



এ অধ্যায় পাঠ শেবে আমরা—

- অমেরিকানী প্রাণীর প্রশিক্ষিন্যাস করতে পারব;
- মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রশিক্ষিন্যাস করতে পারব;
- জীবজগতের প্রশিক্ষিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ : প্রাণিজগতের প্রশিক্ষিন্যাস

তোমাদের চারপাশের ছোটবড় নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণী দেখতে পাও। তোমাদের বাঠ প্রশিক্ষে অর্জিত জ্ঞানের তিনিই প্রাণিগুলি নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর। তোমার দেখা প্রাণীগুলো দেখতে কি একই রকম? এদের সবগুলোরই কি মেরুদণ্ড আছে? এরা স্বাই কি একই পরিবেশে বাস করে? এরা স্বাই কি একই রকম খাবার খাও? এরা কি একইভাবে চলাকেরা করে?

এবার সুনি নিচের উত্তরগুলোর সাহে তোমার চিন্তাকে মিলিয়ে নাও। আমাদের চারপাশে আমরা যে প্রাণীগুলোকে দেখি তার সবগুলো দেখতে এক রকম হয় না। এদের দেখের আকৃতি, গঠন ও অন্যান্য জৈবিক কার্যকর্মের প্রকৃতিও তিনি। এদের কোনোটির মেরুদণ্ড আছে, আবার কোনোটির মেরুদণ্ড নেই। এদের কোনোটি যাঁচিতে, কোনোটি পানিতে, কোনোটি গাছে বাস করে। এদের খাদ্যও বিভিন্ন রূপান্বয় হয়। এরা বিভিন্ন অঙ্গ (সিপিয়া, গা, উপাঞ্চ ইত্যাদি) দিয়ে চলাকেরা করে, আবার কোনোটির চলনশৰ্করা নেই।

পৃষ্ঠীতে এ রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণীর সংখ্যা আমাদের সাঠিক জানা নেই। আজ পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রতিনিয়ন্ত এদের সংখ্যা বেছেই চলেছে। বিশুল সংখ্যাক প্রাণীর গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জান অর্জনের সহজ উপায় হলো প্রশিক্ষিন্যাস। প্রাণিদেহে বিস্মান বিভিন্ন বৈশিক্ষ্য ও বিভিন্ন প্রাণীর

মধ্যে মিল, অমিল ও পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। এদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর বা ধাপে সাজানো হয়। জীবজগতকে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করার এই পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে। প্রয়োজনের তাগিদে বর্তমানে জীববিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা গড়ে উঠেছে। এর নাম শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা।

প্রজাতি হলো শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে নিচের ধাপ বা একক। যেমন— মানুষ, কুনোব্যাং, করুতর ইত্যাদি এক একটি প্রজাতি। কোনো প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করতে হলে সেই প্রাণীকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধাপে ধাপে সাজাতে হয়। এই সকল ধাপের প্রত্যেকটিকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করতে হয়।

শ্রেণিবিন্যাসের ইতিহাসে অ্যারিস্টটল, জন রে ও ক্যারোলাস লিনিয়াসের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াসকে শ্রেণিবিন্যাসের জনক বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম প্রজাতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন এবং দ্বিপদ বা দুই অংশ বিশিষ্ট নামকরণ পথা প্রবর্তন করেন। একটি জীবের বৈজ্ঞানিক নাম দুই অংশ বা পদবিশিষ্ট হয়। এই নামকরণকে দ্বিপদ নামকরণ বা বৈজ্ঞানিক নামকরণ বলে। যেমন— মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম— *Homo sapiens*। বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাটিন অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখতে হয়।

এখন তুমি তোমার নিজের খাতায় নিচের ছকটি আঁক এবং ছকটি পূরণ কর।

প্রাণীর নাম	বাসস্থান	গঠন	উপকারিতা	অপকারিতা
বানর				
কেঁচো				
ঝিনুক				
পাখি				
মাছ				

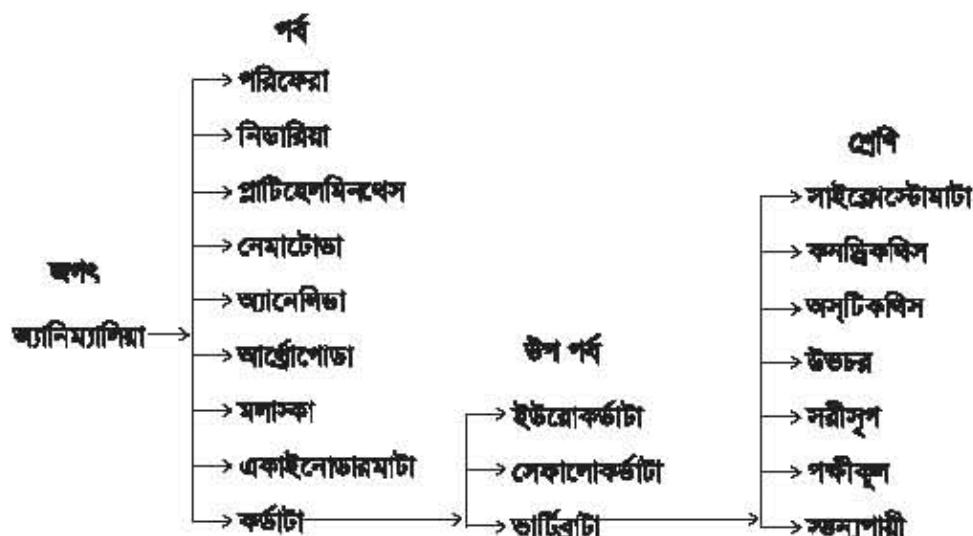
পাঠ ২-৫ : অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস

আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসে সকল প্রাণী অ্যানিম্যালিয়া (Animalia) জগতের (kingdom) অঙ্গরূপ। এই শ্রেণিবিন্যাসে পূর্বের প্রোটোজোয়া পর্বটি প্রোটিস্টা (Protista) জগতে একটি আলাদা উপজগৎ (Subkingdom) হিসেবে স্থান পেয়েছে।

অ্যানিম্যালিয়া জগতের প্রাণীদের নয়টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। এই নয়টি পর্বের প্রথম আটটি পর্বের প্রাণীরা অমেরুদণ্ডী এবং শেষ পর্বের প্রাণীরা মেরুদণ্ডী।

প্রাণিগতের প্রেমিক্যালস

একলভে অ্যানিম্যালিস অংশের প্রেমিক্যালস



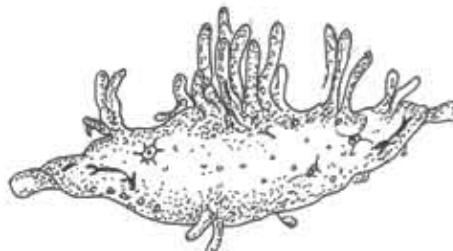
১. পর্য : পরিফেরা (Porifera)

স্তরায় ও বাসস্থান : পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা সাধারণভাবে সঙ্ঘ নামে পরিচিত। পৃষ্ঠীয় সর্ফাই এদের পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক। তবে কিছু কিছু প্রাণী স্থান পানিতে বাস করে। এরা সাধারণত সলুব্ধ হয়ে বসবাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- সরলকৃত বহুকেন্দ্রী প্রাণী।
- সেহলাটীর অসংখ্য ছিদ্রসূক্ত। এই ছিদ্রসমূহে পানির সাথে অঙ্গজোন ও খাদ্যবস্তু প্রবেশ করে।
- কোনো পৃথক সূগঠিত কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র থাকে না।

উদাহরণ : *Spongilla, Scypha*



চিত্র ১.১ : *Spongilla*

২. পর্য : নিউচিনিয়া (Cnidaria)

এই পর্য ইভেগুর্যে সিলেটারেটা নামে পরিচিত হিল।

স্তরায় ও বাসস্থান : পৃষ্ঠীয় প্রাণী সকল অংশে এই পর্বের প্রাণী দেখা যায়। এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক। তবে অনেক প্রজাতি ধান, কি঳, নদী, হ্রদ, বরফা ইত্যাদিতে দেখা যায়। এই পর্বের প্রাণীগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণ ও আকার-আকৃতির হয়। এদের কিছু প্রজাতি এককভাবে আবায় কিছু প্রজাতি সলুব্ধভাবে কলোনি গঠন করে বাস করে। এরা সাধারণত পানিতে ভাসমান কাণ্ড, পাতা বা অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে সেহলেক আটকে রেখে বা মুক্তভাবে সৌভাগ্য কাটে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ দুটি ত্বরীয় কোষস্তর দ্বারা গঠিত। দেহের বাইরের দিকের স্তরটি এক্টোচার্ম এবং তিতেরের স্তরটি এজেচার্ম।
- দেহ পর্যায়কে সিলেন্টেন বলে। এটা একাধারে পরিশাক ও সংবহনে অংশ নেয়।
- এক্টোচার্মে নিডেড্রাস্ট নামে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষ থাকে। এই কোষগুলো শিকায় ধূমা, আস্থারক্তা, চলন ইত্যাদি কাছে অংশ নেয়।

উদাহরণ : *Hydra, Obelia*



চিত্র ১.২ : *Hydra*

অভ্যাস ও বাসস্থান : এই পর্যবেক্ষণের প্রাণীদের জীবনধারা বেশ বৈচিত্র্যময়। এই পর্যবেক্ষণে বহু প্রজাতি বাইপ্লাজিমী বা অক্সিপ্লাজিমী হিসেবে অন্য জীবদেহের বাইরে বা তিতেরে বসবাস করে। তবে কিছু প্রজাতি মুক্তজীবী হিসেবে স্বাদু পানিতে আবাস কিছু প্রজাতি শব্দশক্ত পানিতে বাস করে। এই পর্যবেক্ষণে কোনো প্রাণী জ্ঞেয়া ও সৈতেসৈতে মাটিতে বাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ চাঁচা, উভলিঙ্গ।
- বাইপ্লাজিমী বা অক্সিপ্লাজিমী।
- দেহ গুরু কিন্তু টিক্কল দ্বারা আচৃত।
- দেহে চোৰক ও আঁচা থাকে।
- দেহে শিখা অঙ্গ নামে বিশেষ অঙ্গ থাকে, এগুলো রেচন অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত করে।
- সৌক্ষিকতাৰ অসম্পূর্ণ বা অনুগ্রাহিত।

উদাহরণ : শব্দুৎ কৃমি, ফিল্ডা কৃমি



চিত্র ১.৩ : (ক) শব্দুৎ কৃমি



(খ) ফিল্ডা কৃমি

৪. পর্যবেক্ষণ : নেমাটোডা (Nematoda)

অনেকে একে নেমাথেলিনথেস বলে।

অভ্যাস ও বাসস্থান : এই পর্যবেক্ষণে অনেক প্রাণী অক্সিপ্লাজিমী হিসেবে প্রাণীর অঙ্গ ও গ্রন্থে বসবাস করে। এসব প্রজাতি বিভিন্ন প্রাণী ও মানবদেহে বাস করে মানববক্ষ ক্ষতি সাধন করে। তবে অনেক প্রাণীই মুক্তজীবী, যারা পানি ও মাটিতে বাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ নলাকার ও পুরু ত্বক দ্বারা আবৃত।
- পৌষ্টিকনালি সমূর্ধ, মুখ ও পায়ু ছিদ্র উপস্থিত।
- শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুগম্যিত।
- সাধারণত একলিঙ্গ।
- দেহ গহর অনাবৃত ও প্রকৃত সিলোম নাই।

উদাহরণ : গোলকৃমি, ফাইলেরিয়া কৃমি



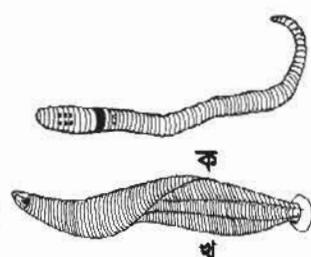
চিত্র ১.৪ : গোলকৃমি

৫. পর্ব : অ্যানেলিডা (Annelida)

স্বত্ত্বাব ও বাসস্থান : পৃথিবীর প্রায় সকল নাতিশীতোষ্ণ ও উচ্চমানভূমি অঞ্চলে এই পর্বের প্রাণীদের পাওয়া যায়। এদের বহু প্রজাতি স্বাদু পানিতে এবং কিছু প্রজাতি অগভীর সমুদ্রে বাস করে। এই পর্বের বহু প্রাণী সৈতেসেতে মাটিতে বসবাস করে। কিছু প্রজাতি পাথর ও মাটিতে গর্জ খুড়ে বসবাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ নলাকার ও খড়ায়িত।
- নেফ্রিডিয়া নামক রেচন অঙ্গ থাকে।
- প্রতিটি খণ্ডে সিটা থাকে (জোকে থাকে না)। সিটা চলাচলে সহায়তা করে।



উদাহরণ : কেঁচো, জোক

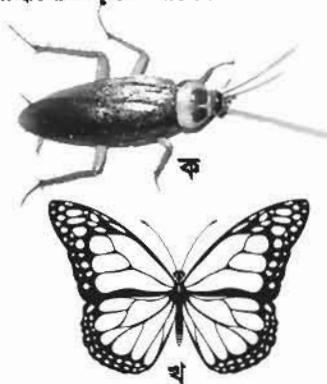
চিত্র ১.৫ : (ক) কেঁচো (খ) জোক

৬. পর্ব : আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)

স্বত্ত্বাব ও বাসস্থান : এই পর্বটি প্রাণিজগতের সবচেয়ে বৃহৎসম পর্ব। এরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সকল পরিবেশে বাস করতে সক্ষম। এদের বহু প্রজাতি অস্তঃপরজীবী ও বহিঃপরজীবী হিসেবে বাস করে। বহু প্রাণী স্থলে, স্বাদু পানিতে ও সমুদ্রে বাস করে। এ পর্বের অনেক প্রজাতির প্রাণী ডানার সাহায্যে উড়তে পারে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ও সম্মিলিত উপাঙ্গ বিদ্যমান।
- মাথায় একজোড়া পুঁজাক্ষি ও অ্যাস্টেনা থাকে।
- নরম দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত।
- দেহের রক্তপূর্ণ গহর হিমোসিল নামে পরিচিত।



উদাহরণ : প্রজাপতি, চিখড়ি, আরশোলা, কাঁকড়া

চিত্র ১.৬ : (ক) আরশোলা (খ) প্রজাপতি

৭. পর্ব : মলাস্কা (Mollusca)

স্বত্ত্বাব ও বাসস্থান : এই পর্বের প্রাণীদের পঠন, বাসস্থান ও স্বত্ত্বাব বৈচিত্র্যপূর্ণ। এরা পৃষ্ঠিয়ির প্রায় সকল পরিবেশে বাস করে। প্রায় সবাই সামুদ্রিক এবং সালভের বিভিন্ন স্তরে বাস করে। কিন্তু কিন্তু অজাতি পাহাড়ি অঞ্চলে, বনেছকালে ও স্বামু পানিতে বাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ নরম। নরম দেহটি সাধারণত শক্ত খেলেস হাতা আবৃত্ত থাকে।
- শেশিবহুল গা দিয়ে এরা চলাচল করে।
- ফুসফুস বা ফুলকার সাহার্যে শুসলকার্য চলায়।

উদাহরণ : শামুক, খিসুক



চিত্র ১.৭ : শামুক

৮. পর্ব : একাইনোডার্মাটা (Echinodermata)

স্বত্ত্বাব ও বাসস্থান : এই পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক। পৃষ্ঠিয়ির সকল ঘসসাগরে এবং সকল গভীরতার অদের বসবাস করতে দেখা যাব। অদের স্থলে বা ঘিঠা পানিতে পাওয়া যাব না। এরা অধিকাংশ মূরগীয়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহবৃক কাটিসুজ।
- দেহ শীচাটি সমান তাপে বিচ্ছুর্ণ।
- পানি সংবেদনশীল থাকে এবং নালিপদের সাহার্যে চলাচল করে।
- শূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে অক্ষীয় ও পৃষ্ঠাদেশ নির্মাণ করা যাব কিন্তু যাব চিহ্নিত করা যাব না।

উদাহরণ : তারামাছ, সমুদ্র শশা



চিত্র ১.৮ : তারামাছ

পাঠ ৬-৮ : মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস

৯. পর্ব : কর্ডাটা (Chordata)

স্বত্ত্বাব ও বাসস্থান : এরা পৃষ্ঠিয়ির সকল পরিবেশে বাস করে। অদের বহু অজাতি ডাঙীয় বাস করে। অল্পতর কর্ডাটাদের মধ্যে যতু অজাতি শামুক পানিতে অবস্থা সম্মতে বাস করে। যতু অজাতি বৃক্ষবাসী, যন্ত্ৰবাসী, মেরুবাসী, পুষ্পবাসী ও খেচৰ। কর্ডাটা পর্বের যতু প্রাণী বহিপ্রাণীয়ী হিসেবে অন্য প্রাণীর দেহে সহজে হয়ে জীবনবাসন করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- এই পর্বের প্রাণীর সামা জীবন অধিক ভূগুণ অবস্থার পৃষ্ঠাদেশে বরাবর নটোকর্ত অবস্থান করে। নটোকর্ত হলো একটি নরম, নমনীয়, দক্ষাকর, দৃঢ় ও অধ্যাত্মিক অঙ্গ।
- পৃষ্ঠাদেশে একক, কীণা স্নামুক্র থাকে।
- সামা জীবন অধিক জীবন চক্রের কোনো এক পর্যায়ে পার্শ্বীয় গোবিলীয় সূলকা ছিল থাকে।

উদাহরণ : মানুব, বৃন্দাব্যাক, ঝুই মাছ

ଆମ୍ବଲାତର ଶ୍ରେଣିବିନ୍ୟାସ

୧

କଣ୍ଡିଟି ପର୍ବକେ ଡିନଟି ଉପପର୍ବେ ଭାଗ କରା ଯାଉ । ଯଥୀ-

୧. ଇଟୋକର୍ତ୍ତି (Urochordata)

ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- ଆଧୁନିକ ଅବଶ୍ୟାଯ ମୂଳକାରୀସ୍ତ୍ର, ପୃଷ୍ଠୀର କିଣିପା ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ଥାକେ ।
- ଶୁଧୁମାତ୍ର ଲାର୍ଭ ଦଶା ଏବେଳେ ନଟୋକର୍ତ୍ତ ଥାକେ ।

ଉଦ୍‌ଦୟାନନ୍ଦ : *Ascidia*



ଚିତ୍ର ୧.୯ : *Ascidia*

୨. ସେବାଲୋକର୍ତ୍ତି (Cephalochordata)

ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- ସାରାଜୀବନି ଏବେଳେ ନଟୋକର୍ତ୍ତର ଉପଶିଖି ଶକ କରା ଯାଉ ।
- ଦେଖିତେ ଯାହାରେ ଯତୋ ।

ଉଦ୍‌ଦୟାନନ୍ଦ : *Branchiostoma*



ଚିତ୍ର ୧.୧୦ : *Branchiostoma*

୩. ଭାର୍ତ୍ତି (Vertebrata)

ଏହି ଉପ-ପର୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦି ସେହୁନ୍ତି ଆଶି ହିସେବେ ପରିଚିତ । ଗଠନ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଭିନ୍ନିଭିନ୍ନ ମେହୁନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦି ଏବେଳେ ଭାଗ କରା ହାଜରେ ।

୧. ପ୍ରେମି- ସାଇଙ୍ଗୋସ୍ଟୋମାଟା (Cyclostomata)

ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- ଲମ୍ବାଟି ଦେହ ।
- ମୁଖଛିରୁ ପୋଳାକାର ଏବେ ଚୋଯାଳବିହୀନ ।
- ଏବେଳେ ଦେହ ବୌଇଶ ବା ମୁଖ ପାଖନା ଅନୁପରିଷିତ ।
- ମୂଳକାରୀହୀନ ନାହାଯେ ଶାଳ ନେଇ ।

ଉଦ୍‌ଦୟାନନ୍ଦ : *Petromyzon*



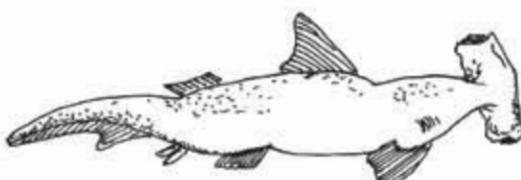
ଚିତ୍ର ୧.୧୧ : *Petromyzon*

୨. ପ୍ରେମି- କନ୍ଦିରିକପିଲି (Chondrichthyes)

ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- ଏ ପର୍ବର ନକଳ ଆଶି ସମୟେ ବାସ କରେ ।
- କନକଳ ତୁଳାଶିଥିଯାଇ ।
- ଦେହ ପ୍ରୟାକର୍ଯ୍ୟ ବୌଇଶ ଦାରୀ ଆବୃତ, ମାଥର ମୁହି ପାଶେ ୫-୭ ଜୋଡ଼ା ମୂଳକାରୀହୀନ ଥାକେ ।
- କାନକୋ ଥାକେ ନା ।

ଉଦ୍‌ଦୟାନନ୍ଦ : ହାଙ୍ଗର, କରାତ ମାଛ, ହାତୁଡ଼ି ମାଛ



ଚିତ୍ର ୧.୧୨ : ହାତୁଡ଼ି ମାଛ ।

৩. প্রেমি- অস্টেলিক্ষিস (Ostelichthyes)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- অধিকাংশই স্বাদু পানির মাছ।
- সেহ সাইডেজেড, প্যানডেড বা টিনডেড বয়নের ঔইশ ঘাসা আছে।
- মাথার দুই পাশে চার জোড়া কুলকা থাকে। কুলকাগুলো কানকে দিয়ে ডাকা থাকে। কুলকার সাহায্যে খাসকর্ম চালায়।

উদাহরণ : ইলিশ মাছ, সি-হর্স



চিত্র ১.১৩ : ইলিশ মাছ

কাজ : পাইটা, মৃগটাঙা, পোরা, কেজল, পাকা, বৈ, পি. ও মানুর মাছ সজ্জ কর।
এগুলো কেন প্রেমিক্ষিত মাছ? এদের বৈশিষ্ট্যগুলো খনন কর।

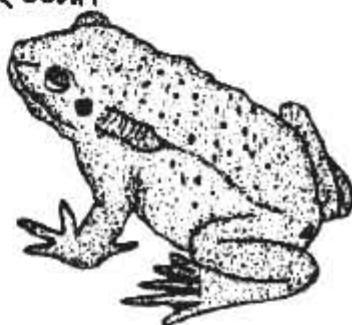
৪. প্রেমি- উভচর (Amphibia)

মেহুদাঙ্গী থাণীর মধ্যে ঘাসা জীবনের প্রথম অবস্থার সাধারণত পানিতে থাকে এবং মাঝের মতো বিশেষ কুলকার সাহায্যে খাসকর্ম চালায়, পরিষিক্ত বয়নে ভালোর ঘাস করে তাইহাই উভচর।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- মেহুদুক ঔইশবিহীন।
- দ্বক নরম, পাতলা, তেজা ও প্রশিক্ষিত।
- শীতল মজবুত থাণী।
- পানিতে তিম পাঢ়ে। জীবনচক্রে সাধারণত ঘাসাটি দশা দেখা যায়।

উদাহরণ : সোনাবাড়, কুনোবাড়



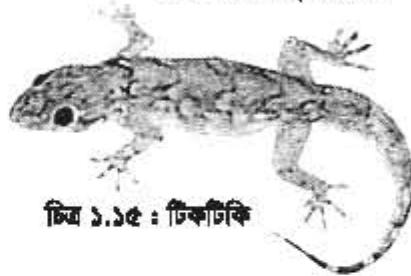
চিত্র ১.১৪ : কুনোবাড়

৫. প্রেমি- স্কেলিস্ট (Reptilia)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- বুকে কর করে চলে।
- দ্বক শুক ও অইশবৃত্ত।
- চার পায়েই পাঁচটি করে নখরযুক্ত আঙুল আছে।

উদাহরণ : টিকটিকি, কুমির, সাপ



চিত্র ১.১৫ : টিকটিকি

৬. প্রেমি- পর্ণিমূল (Aves)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- সেহ পাশকে আছুত।
- দুটি ভানা, দুটি পা ও একটি চৰু আছে।
- কুসকুসের সাথে বাহুথলি ধাকায় সহজে উঠতে পারে।
- উক মজবুত থাণী।
- ঘাস খেত, ঘাসকা ও কৌশা।

উদাহরণ : কাক, দোয়েল, হাঁস



চিত্র ১.১৬ : সোজেল

೭. ಪ್ರೇಮಿ - ಸತ್ಯಪಾಠಿ (Mammalia)

ಸಾಧಾರಣ ಬೈಷಿಕ್ಟ್

- ದೇಹ ಲೋಮೆ ಆಬೃತ್ತ |
- ಜಲ್ಯಪಾಠಿ ಥಾಲೀರಾ ಸಂಕಾಳ ಧ್ವನಿ ಕರೆ | ಈ ರೇ ಏರ ವ್ಯಾತಿಕ್ರಿಯ ಆಛೆ, ಯೆಮನ - ಪ್ರಾಟಿಪಾಸ |
- ಉರು ಇತ್ತಲೆಯ ಥಾಲೀ |
- ಚೋಳಾಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧರನೆರ ದೌತ ಥಾಕೆ |
- ಶಿಶ್ವರಾ ಮಾತ್ರದ್ವಾರೆ ಗಾನ ಕಾರೆ ಕಡು ಹಯ |
- ಹರಪಿಂಡ ಚಾರ ಪ್ರಕೋಷ್ಟ ಬೈಷಿಕ್ಟ್ |



ಚಿತ್ರ ೧.೧೭ : ಬಾಢ

ಉದಾಹರಣೆ : ಶಾನುಷ, ಉಟ, ಬಾಢ

ಬಾಢ : ತೋಷರಾ ಶೀಂಜನೆರ ಏಕಟಿ ಕರೆ ದಲ ಗಠನ ಕರ | ಏಂಬ ಯೆರ್ಡಾಂತಿ ಓ ಅಮೆರ್ಡಾಂತಿ ಥಾಲೀದೆರ ಚಾರ್ಟ ದೇರೆ ಏದೆರ ಬೈಷಿಕ್ಟ್ ನಿರ್ಧರ ಕರ ಓ ವಿಸಿರಖ ಕರ | ಏಂಬ ತೋಷರಾ ಪ್ರೇಮಿತೆ ಉಪಧಾರಣ ಕರ | ಸಂಕಲ ದಲೆರ ಲೆಖಾ ಬೈಷಿಕ್ಟ್ಯಾಸ್ಲೋ ಮಿಲಿಯ್ ನಾಂ |

ಪಾಠ ೯ : ಪ್ರೋಫೆಸಿಲಿಯಾಸ್ ಅರ್ಥಾಜಲ್ಲಿಗಳ್ತಾ

ಎಕ ಮಹ ಥಾಲೀಕೆ ಪ್ರಥಕ ತಾರೆ ಶನಾಕ್ತ ಕರಾ ಅಸಹಿ ವಾಪಾರ | ಕ್ರೆಬಲ್ಯಾತ್ ಪ್ರೋಫೆಸಿಲಿಯಾಸ್ ಕರಣ ಪರ್ವತಿ ಅವಳಿಸ್ತಣ ಕರೆ ಏ ಕಾಜಟಿ ಕರಾ ಸಹಿಬಣ ಹಯ | ಏಕಟಿ ಥಾಲೀಕೆ ಶನಾಕ್ತ ಕರತೆ ಹಳೆ ಅಧಾನತ ಸಾತ್ತಿ ಥಾಪೆ ಏರ ಬೈಷಿಕ್ಟ್ಯಾಸ್ಲೋ ಮಿಲಿಯ್ ನಿತೆ ಹಯ | ಏ ಥಾಪಸ್ಲೋ ಹಳೊ ಜಂಗ (kingdom), ಪರ್ಮ (Phylum), ಪ್ರೇಮಿ (Class), ವರ್ಡ (Order), ಪೋರ್ (Family), ಗಂ (Genus) ಓ ಪ್ರಾಂತಿ (Species) | ಅನೇಕ ಸಮಾ ಪರ್ವಕೆ ಉಪಪರ್ವ ಬಾ Sub Phylum -ಏ ತಾಂಗ ಕರಾ ಹಯ |

ಪ್ರೋಫೆಸಿಲಿಯಾಸ್ ಸಾಹಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಸಂಘತ ಉಪಾಗೆ ಸಹಜೆ, ಅಂ ಪರಿಣಾಮೆ ಓ ಅಂ ಸಮಯೆ ಪೃಥಿವೀರ ಸಂಕಲ ಉಡ್ಡಿಸ ಏಂ ಥಾಲೀ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಜಾನಾ ಯಾಯ | ನಾತ್ತಲ ಪ್ರಾಂತಿ ಶನಾಕ್ತ ಕರತೆ ಪ್ರೋಫೆಸಿಲಿಯಾಸ್ ಅಪರಿಹಾರ್ಥ | ಥಾಲೀಕ್ಲೋರ ಮಹ್ಯೆ ಪಾರ್ಮಸಿಕ ಸಂಪರ್ಕೆರ ವಿಶಿಷ್ಟ ತರ್ಹ ಓ ಉಪಾಗೆ ಪಾಡುವಾ ಯಾಯ | ಥಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಥಾಲೀಕ್ಲೋರ ಮಾರೆ ಯೆ ಪರಿವರ್ತನ ಘಟೆಹೆ ಬಾ ಘಟೆಹೆ ಸೆ ಸಂಪರ್ಕೆ ಧಾರಣಾ ಪಾಡುವಾ ಯಾಯ | ಅಸಂಖ್ಯ ಥಾಲೀಕ್ಲೋರ ಏಕಟಿ ನಿರ್ದಿಕ್ಟ ಕ್ರಾಂತಿತೆ ವಿನ್ಯಾಸತ ಕರೆ ಪೋಷ್ಟೆಹೆ ಕರಾ ಯಾಯ | ಥಾಲೀ ಸಂಪರ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥಿಕ ಓ ಪರಿಕಲ್ಪಿತ ಜಾನ ಅರ್ಜನ ಕರಾ ಯಾಯ | ಯೆಮನ - ಸರ ಏಕಕೋಷಿ ಥಾಲೀಕೆ ಏಕಟಿ ಪರ್ವೆ ಏಂ ಬಹುಕೋಷಿ ಥಾಲೀದೆರ ನಯಾಟಿ ಪರ್ವೆ ತಾಂಗ ಕರಾ ಹಯ |

ಫರ್ಮ-೨, ವಿಜ್ಞಾನ-ಅಂತರ್ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಮಿ

নতুন শব্দ : শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা, দ্বিপদ নামকরণ, প্রজাতি, অ্যানিম্যালিয়া, সিলোম, সিলেন্টেরন, হিমোসিল, সিটা, নটোকর্ড, লাৰ্ভা, সাইক্লোয়েড, গ্যানয়েড

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম

- প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দেহগহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। এটা একাধারে পরিপাক ও সংবহনের কাজ করে।
- ভূপের যে সকল কোষীয় স্তর থেকে পরবর্তীতে টিস্যু বা অঙ্গ সৃষ্টি হয় তাদের ভূগস্তর বলে।
- বহুকোষী প্রাণীর পৌষ্টিকনালি এবং দেহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে সিলোম বলে।
- হিমোসিলের ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়।
- প্রাণিজগতে আর্দ্রোপোডা পর্বের প্রাণীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।
- মলাসকা পর্বের প্রাণীদের নরম দেহ ম্যাষ্টিল দ্বারা আবৃত থাকে। মাংসল পা দিয়ে চলাফেরা করে।
- যে সমস্ত প্রাণীকে এদের দেহের কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর একাধিকবার সমান দুই অংশে ভাগ করা যায় তাকে অরীয় প্রতিসম প্রাণী বলে। যেমন - তারামাছ।
- কর্ডটা প্রাণিজগতের একটি পর্ব। এই পর্বের প্রাণীদের নটোকর্ড, স্নায়ুরঞ্জু ও গলবিলীয় ফুলকাছিদ্র আছে এবং এরা কর্ডেট নামে পরিচিত।
- ভার্ট্রিওটা উন্নত প্রাণী। এদের নটোকর্ড শক্ত কশেরুকাযুক্ত মেরুদণ্ডে পরিবর্তিত হয়।
- স্নায়ুরঞ্জুর সমূখ প্রান্ত স্ফীত হয়ে মন্তিক্ষে পরিণত হয়। মন্তিক্ষ করোটির মধ্যে সুরক্ষিত থাকে।
- জলজ ভার্ট্রিওটা ফুলকার সাহায্যে আর যারা স্থলে বাস করে তারা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।
- স্ফীতিকর পোকাদের পেস্ট বলে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. যকৃৎ কৃমির রেচন অঙ্গ হলো _____।
২. চিথড়ির রক্তপূর্ণ গহ্বরকে _____ বলে।
৩. _____ পেশিবহুল পা দিয়ে চলাচল করে।
৪. _____ উপপর্বের প্রাণীরা মেরুদণ্ডী।
৫. ইউরোকর্ডটা উপপর্বভুক্ত প্রাণীদের লেজে _____ থাকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোনো প্রাণীর দিপদ নামে কয়টি অংশ থাকে? এ অংশগুলো কী কী? মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
২. তোমার চেনাজানা পাঁচটি আর্থিকোডার নাম লেখ?
৩. চিঠি কোন পর্বের প্রাণী? এদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
৪. স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
৫. ইউরোকর্ডাটার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি Mollusca পর্বের প্রাণী?

- | | |
|------------|----------|
| ক. কাঁকড়া | খ. জৌক |
| গ. তারামাছ | ঘ. ঘিনুক |

২. স্কাইফা ও হাইড্রা উভয়ই—

- i. দ্বিমতৰী
- ii. বহুকোষী
- iii. সুগঠিত তত্ত্ববিহীন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

m	প্রাণীর ডানা এবং হিমোসিল নামক দেহগহরের থাকে
n	প্রাণীর পালক এবং ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকে
o	প্রাণী ডিম পাড়ে এবং শীতল রক্তবিশিষ্ট
p	প্রাণীর আইশ এবং যুগ্ম পাখনা থাকে

৩. ছকের কোন প্রাণীটি অমেরুদণ্ডী?

- | | | |
|----------|------|------|
| ১০
১২ | ক. m | খ. n |
| | গ. o | ঘ. p |

৪. উড়তে পারে—

- $m \oplus n$ প্রাণী
- $n \oplus o$ প্রাণী
- $m \oplus p$ প্রাণী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

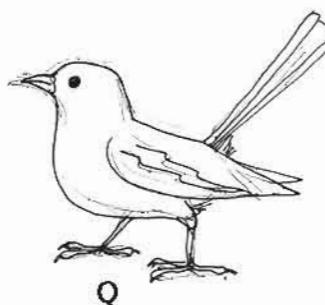
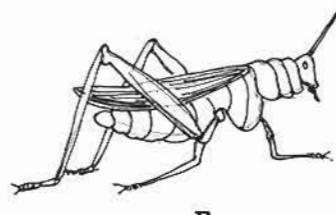
খ. i \oplus ii

গ. i \oplus iii

ঘ. i, ii \oplus iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১.



ক. শ্রেণিবিন্যাস কী?

খ. বৈজ্ঞানিক নাম বলতে কী বোঝায়?

গ. P প্রাণীটি কোন শ্রেণির? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রাণী দুইটি ভিন্ন শ্রেণিতে থাকার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. রাহাতের গায়ে মশায় কামড় দেওয়া মাত্র সে এটিকে হাতচাপা দিয়ে ধরে ফেলল। একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সে এর উগাছা, চক্ষু ও দেহাবরণ পর্যবেক্ষণ করল। পরবর্তীতে সে তার পাঠ্যগুস্তকের জানের আলোকে এটির শ্রেণিগত অবস্থান বোঝার চেষ্টা করল।

ক. ফিতাকৃমি কোন পর্বের প্রাণী?

খ. মানবদেহে নটোকর্ডের অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

গ. রাহাতের পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রাণীটির শ্রেণিগত অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রাণীটির শ্রেণিগত অবস্থান জানা রাহাতের জন্য প্রয়োজন কেন? বিশ্লেষণ কর।

নিচে কর

১. ভূমি তোমার পরিবেশ থেকে কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণী সংগ্রহ কর এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলো শিপিবদ্ধ কর।

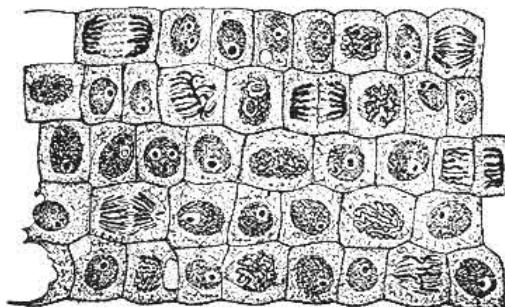
২. কেঁচো, চিঠ্ঠি, ঘাসফড়ি, শামুক, কিনুক, দোমেল, বুই মাছ কোন পর্বতুক্ত প্রাণী? এদের শনাক্তকারী

বৈশিষ্ট্যগুলো শিপিবদ্ধ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবের বৃদ্ধি ও বৎসরগতি

প্রতিটি জীবের দেহ কোষ দিয়ে গঠিত। এককোষী জীবগুলো কোষ বিভাজনের দ্বারা একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি কোষে বিভক্ত হয় এবং এভাবে বৎসরগতি করে। বহুকোষী জীবের দেহকোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে জীবদেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে। ডিস্কাপু নিবিক্ষু হওয়ার পর বহুকোষী জীবের জীবন শুরু হয় একটি মাত্র কোষ থেকে। নিবিক্ষু ডিস্কাপু অর্থাৎ এককোষী জাইটোট ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ কোষ দিয়ে গঠিত বিশাল দেহ।



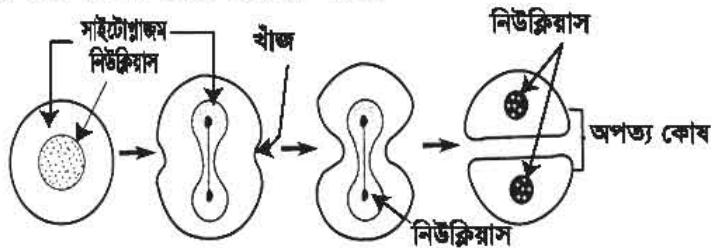
এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জীবদেহের বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জীবের বৎসরগতির ধারা রক্ষায় কোষ বিভাজনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ : কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ

জীবদেহে তিনি ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়, যথা— (১) অ্যামাইটোসিস (২) মাইটোসিস এবং (৩) মিরোসিস।

অ্যামাইটোসিস : এ ধরনের কোষ বিভাজন ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, ছক্কা, অ্যামিবা ইত্যাদি এককোষী জীবে হয়। এককোষী জীবগুলো অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে বৎসরগতি করে। এ ধরনের কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াসটি ভাস্টেলের আকার ধারণ করে এবং প্রায় মাঝে মাঝে বরাবর সংকুচিত হয় ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি অপর্যাপ্ত নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। একই সময়ে সাইটোপ্লাজমণ মাঝে বরাবর সংকুচিত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। এ ধরনের বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি অপর্যাপ্ত কোষ সৃষ্টি করে তাই একে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলে।



চিত্র ২.১ : অ্যামাইটোসিস

মাইটোসিস : উন্নত প্রেপির প্রাণীর ও উদ্ভিদের দেহকোষে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার বিভাজিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস একবার বিভাজিত হয়ে সমাকৃতির, সমগুণ সম্পন্ন ও সমসংখ্যক ক্রোমোজোম বিনিটি দুটি অপর্যাকোষ সৃষ্টি করে। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে প্রাণী এবং উদ্ভিদ দৈর্ঘ্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের বিভাজনের ফল উদ্ভিদের ভাস্ক টিসুস কোষের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে।

মিওসিস : অনন্ত কোষ উৎপন্নের সময় মিওসিস কোষ বিভাজন ঘটে। এ ধরনের কোষ বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি পরশের দূবার বিভাজিত হলেও ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে মাত্র একবার। ফলে অপর্যাকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। এ বিভাজনে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পায় বলে এ ধরনের বিভাজনকে হ্রাসমূলক বিভাজনও বলা হয়। অনন্ত মাতৃকোষ থেকে পুরুষ স্তোৱ প্যারেট উৎপন্নের সময় এ ধরনের কোষ বিভাজন হয়।

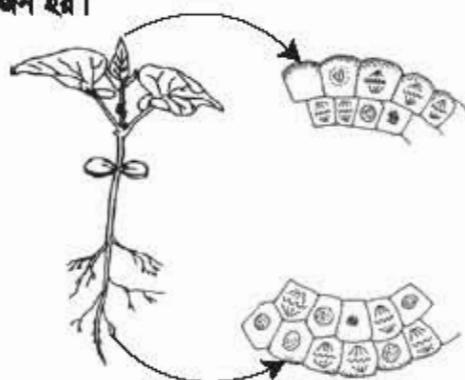
মাইটোসিস

মাইটোসিসের বৈশিষ্ট্য

- মাইটোসিস কোষ বিভাজন দেহকোষের এক ধরনের বিভাজন পদ্ধতি।
- এ প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি একবার মাত্র বিভাজিত হয়।
- মাতৃকোষটি বিভাজিত হয়ে সমগুণ সম্পন্ন দুটি অপর্যাকোষ সৃষ্টি করে।
- এ ধরনের বিভাজনে মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা এবং অপর্যাকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকে অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।
- এ ধরনের বিভাজনে প্রতিটি ক্রোমোজোম সম্বালিতভাবে মুক্ত হয়। ফলে সৃষ্টি নতুন কোষ সৃষ্টিতে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার সমান থাকে। তাই মাইটোসিসকে ইকুরেশনাল বা সমীক্ষণিক বিভাজনও বলা হয়।

মাইটোসিস কোষার হয়

মাইটোসিস বিভাজন প্রকৃত নিউক্লিয়াসকৃত জীবের দেহকোষে ঘটে। উদ্ভিদের বর্ণনীল অংশের ভাস্ক টিস্যু যেমন— কাঠ, মূলের অংতাল, ঝুঁঁঝুঁল ও ঝুঁঁঝুঁল, বর্ণনীল শাতা, মূল ইত্যাদিতে এ ইকায় বিভাজন দেখা যায়। প্রাণিদেহের দেহকোষে, ঝুঁঁঝুঁল পরিবর্ণনের সময়, নিয়ন্ত্রণির প্রাণীর ও উদ্ভিদের অধীন জননের সময় এ ধরনের বিভাজন হয়।



চিত্র ২.২ : পুরুষ ও মূলের বর্ণনীল অংশে কোষ বিভাজন

কোন কোন কোষে মাইটোসিস বিভাজন ঘটে না

প্রাণীর স্নায়ুটিস্যুর স্নায়ুকোষে, স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিণত লোহিত রক্ত কণিকা ও অনুচক্রিকা এবং উড়িদের স্থায়ী টিস্যুর কোষে এ ধরনের বিভাজন ঘটে না।

পাঠ ২ : মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতি

মাইটোসিস বিভাজনটি দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয়। নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে। মাইটোসিস কোষ বিভাজন একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি। প্রথমে ক্যারিওকাইনেসিস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজন হয়, পরবর্তীতে সাইটোকাইনেসিস অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয়। তবে ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস শুধু হওয়ার আগে কোষটির নিউক্লিয়াসকে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয়। কোষটির এ অবস্থাকে ইন্টারফেজ বলে।

ক্যারিওকাইনেসিস

বিভাজিত কোষে নিউক্লিয়াসটির একটি জটিল পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্যারিওকাইনেসিস সম্পন্ন হয়। পরিবর্তনগুলো ধারাবাহিকভাবে ঘটে। বোবার সুবিধার্থে এই পর্যায়টিকে পাঁচটি ধাপে বিভক্ত করা হয়েছে। ধাপগুলো— ১. প্রোফেজ, ২. প্রো-মেটাফেজ, ৩. মেটাফেজ, ৪. অ্যানাফেজ ও ৫. টেলোফেজ।

প্রোফেজ : এটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ধাপ। এ ধাপে কোষে নিম্নলিখিত ঘটনাবলি ঘটে—



উডিদকোষ



প্রাণিকোষ

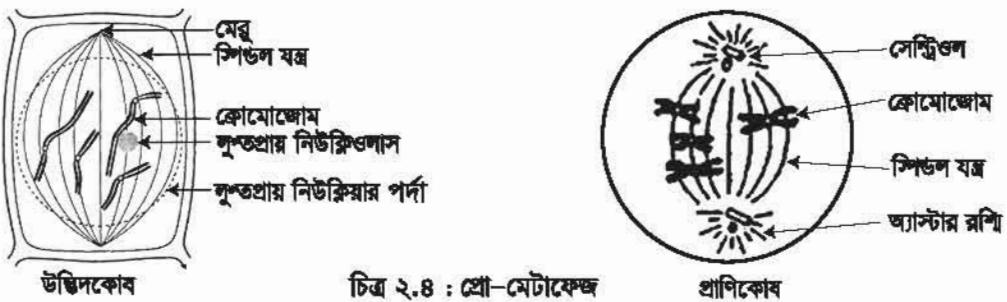
চিত্র ২.৩ : প্রোফেজ

- কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয়।
- পানি বিয়োজনের ফলে নিউক্লিয়ার জালিকা ভেঙ্গে গিয়ে কতগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যক আঁকাবাঁকা সূতার মতো অংশের সৃষ্টি হয়। এগুলোকে ক্রোমোজোম বলে। এরপর প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালভিতাবে বিস্তৃত হয়ে দুটি ক্রোমাটিড গঠন করে। এগুলো সেন্ট্রোমিয়ার নামক একটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে।

পাঠ ৩ : প্রো-মেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ

প্রো-মেটাফেজ : এ ধাপটি স্বত্ত্বস্থায়ী। এ ধাপে—

- নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিওলাস প্রায় বিস্তৃত হয়ে যায়।
- কোষের উভার মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত কতগুলো তত্ত্ব আবির্ভাব ঘটে। এগুলো মাঝের আকৃতি ধারণ করে তাই একে স্পিন্ডল যন্ত্র বলে। স্পিন্ডল যন্ত্রের মধ্যভাগকে বিশুবীয় অঞ্চল বলে। প্রাণিকোষে সেন্ট্রোল দুটির চারদিক থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির মতো অ্যাস্টর রশ্মির আবির্ভাব ঘটে এবং কোষের দুই বিপরীত মেরুতে পৌছাতে স্পিন্ডল তত্ত্ব গঠন করে। তত্ত্বগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে স্পিন্ডল যন্ত্র গঠন করে।



চিত্র ২.৪ : প্রো-মেটাফেজ

মেটাফেজ— এ ধাপে

- ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল যন্ত্রের বিশুবীয় অঞ্চলে আসে এবং সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে তত্ত্ব দিয়ে আটকে থাকে।
- এ ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে খাটো ও মোটা দেখায়।



চিত্র ২.৫ : মেটাফেজ

অ্যানাকেজ - এ ধাপে

১. প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোসিলার মূলাগে বিভক্ত হওয়ে যায়, ফলে প্রত্যেক ক্রোমাটিডে একটি করে সেন্ট্রোসিলার থাকে।
২. ক্রোমাটিডগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ে যায়। এ অবস্থার প্রতিটি ক্রোমাটিডকে অপর্য ক্রোমোজোম বলে।
৩. এরপর ক্রোমোজোমগুলোর সাথে সূত্র জড়গুলোর সহকারে ফলে অপর্য ক্রোমোজোমের অর্ধেক উভয় মেরুর দিকে এবং অর্ধেক দক্ষিণ মেরুর দিকে অঙ্গসর হতে থাকে। এ সময় ক্রোমোজোমগুলো ইন্ট্রালি বর্ণমাত্রা V, L, J অথবা I আকৃতি বিশিষ্ট হয়।



চিত্র ২.৬ : অ্যানাকেজ

পার্ট ৪ : টেলোফেজ - এ ধাপে

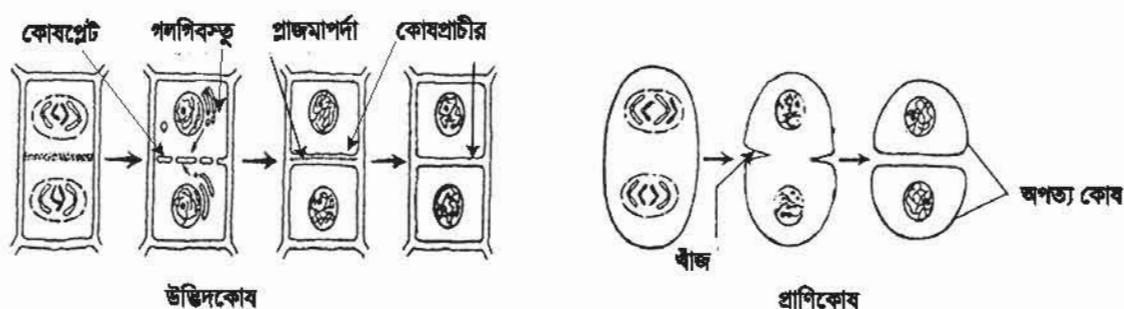
১. অপর্য ক্রোমোজোমগুলো বিপরীত মেরুতে এসে পৌছায়।
২. এরপর উভয় মেরুর ক্রোমোজোমগুলোকে ধ্যে নিউক্লিয়ার পর্শি এবং নিউক্লিওলাসের পুনঃ আবর্তন ঘটে। প্রাণিকেবে উভয় মেরুতে একটি করে সেন্ট্রিল সৃষ্টি হয়।
৩. এ অবস্থায় ক্রোমোজোমগুলো সরু ও দৃশ্য আকার ধারণ করে পরস্পরের সাথে জট পাকিয়ে নিউক্লিয়ার অটিকুলাম গঠন করে। এভাবে কেবের দুই মেরুতে দুটি অপর্য নিউক্লিওলাস গঠিত হয় এবং ক্যারিওবাইনেসিসের সমাপ্তি ঘটে।



চিত্র ২.৭ : টেলোফেজ

সাইটোকাইনেসিস

নিউক্লিয়াসের বিভাজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়। প্রক্রিয়াক্ষে টেলোফেজ দশাতেই সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়। টেলোফেজ ধাপের শেষে বিমূর্চিয় তলে এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো জমা হয় এবং পরে এরা মিলিত হয়ে কোষপ্লেট গঠন করে। কোষপ্লেট পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে কোষপাচীর গঠন করে। ফলে একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়।



চিত্র ২.৮ : সাইটোকাইনেসিস

প্রাণিকোষের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সাথে সাথে কোষের মাঝামাঝি অংশে কোষপর্দার উভয় পাশ থেকে দুটি কীজ সৃষ্টি হয়। কোষপর্দার এ কীজ ক্রমশ ভিতরের দিকে গিয়ে নিরঙীয় তল বরাবরে বিস্তৃত হয় এবং মিলিত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। তাহলে আমরা জানতে পারলাম উত্তিদ কোষের কোষপ্লেট গঠিত হয় এবং প্রাণিকোষে ক্লিনেজ বা ফারোয়িং পদ্ধতিতে সাইটোকাইনেসিস ঘটে।

পাঠ ৫ ও ৬ : মিয়োসিস

এ অধ্যায়ের শুরুতে জেনেছি মিয়োসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মিয়োসিস কেন হয়?

মাইটোসিস কোষ বিভাজনে অপত্য কোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের সমান থাকে। বৃদ্ধি ও অবৌন জননের জন্য মাইটোসিস কোষ বিভাজন অপরিহার্য। যৌন জননে পুরুষ ও স্ত্রী জনন কোষের মিলনের প্রয়োজন পড়ে। যদি জননকোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যার দেহকোষের সমান থেকে যায় তাহলে জাইগোট কোষে জীবটির ক্রোমোজোম দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার বিপুল হয়ে যাবে। মিয়োসিস কোষ বিভাজনে জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যাবে। ফলে দুটি জননকোষ একত্রিত হয়ে যে জাইগোট গঠন করে তার ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার অনুরূপ থাকে। এতে নির্দিষ্ট প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার ধূবতা বজায় থাকে।

জনসকোষ সৃষ্টির সময় এবং নিম্নলিপির উদ্দিষ্টের জীবন চক্রের কোনো এক সময় বর্ণন অনুকরণ ঘটে তখন কোনোর ক্লোমোজোম সংখ্যার সে অক্ষরাকে হ্যাপ্টেড (n) বলে। বর্ণন সূচি হ্যাপ্টেড কোনোর ফিলম ঘটে তখন সে অক্ষরাকে ডিপ্রোড ($2n$) বলে।



চিত্র ২.৯ : মিরোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জাইপোটি সৃষ্টি

সূতরাং মিরোসিস কোষ বিভাজন হয় বলেই প্রতিটি থ্রিআরি বৈশিষ্ট্য বর্ণনাক্রমের টিকে ধাকতে পারে।

মিরোসিসের বৈশিষ্ট্য

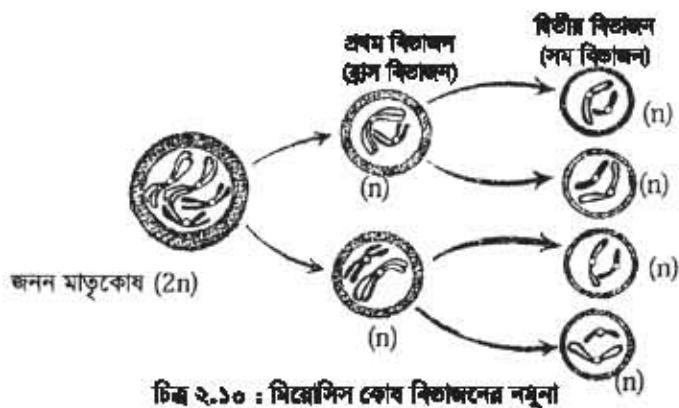
১. ডিপ্রোড জীবের জনস মাতৃকোষ ও হ্যাপ্টেড জীবের জাইপোটি মিরোসিস ঘটে।
২. এ ধরনের কোষ বিভাজনে একটি কোষ থেকে চারটি কোনোর সৃষ্টি হয়।
৩. ক্লোমোজোম একবার বিভক্ত হয় এবং নিউক্লিওস মূল্য বিভক্ত হয়।
৪. সৃষ্টি চারটি কোনোর নিউক্লিওসে ক্লোমোজোম সংখ্যা যাকৃ নিউক্লিওসের ক্লোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়।

মিরোসিস ক্ষেত্রের ঘটনা

মিরোসিস কোষ বিভাজনের অধিকার জীবের জনস কোষ বা প্যামেট সৃষ্টির সময় জনস মাতৃকোষে ঘটে। সম্পূর্ণ উদ্দিষ্টের প্রাপ্তিশাস্ত্রী ও ডিপ্লাকের মধ্যে এবং উন্নত প্রাপ্তিশাস্ত্রে শুকাশ ও ডিপ্লাকের মধ্যে মিরোসিস ঘটে।

মিরোসিস ক্ষেত্রে বিভাজন

মিরোসিস কোষ বিভাজনের সময় একটি জনস মাতৃকোষ প্রশংস সুই থাপে বিভাজিত হয়। প্রথম বিভাজনকে মিরোসিস-১ এবং বিভীতি বিভাজনকে মিরোসিস-২ বলা হয়। প্রথম বিভাজনের সময় সৃষ্টি সুইটি অপ্রত্যক্ষ কোনোর ক্লোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্লোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়। বিভীতি বিভাজনটি মাইটোসিস বিভাজনের অনুসূত। অর্ধেক অথবা বিভাজনে উৎপন্ন প্রতিটি কোষ শুকাশ বিভাজিত হয়ে সুইটি অপ্রত্যক্ষ কোনোর সৃষ্টি করে। একেজে অপ্রত্যক্ষ কোনোর ক্লোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্লোমোজোম সংখ্যার সমান হয়। কলে একটি জনস মাতৃকোষ ($2n$) থেকে চারটি অপ্রত্যক্ষের (n) সৃষ্টি হয়।



পাঠ ৭-৯ : বংশগতি নির্বাচনে ক্লোমোজোম, DNA এবং RNA এর ভূমিকা

মা ও বাবাৰ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সম্ভাস্ততি পেয়েই থাকে। মাতৃপিতার বৈশিষ্ট্য বে অক্ষিকার সম্ভাস্ততিতে সংকীর্ণ হয়, তাকে বংশগতি বলে। আৱ সভানৰা পিতামাতার মেসব বৈশিষ্ট্য পায়, সেগুলোকে বলে বহুগত বৈশিষ্ট্য। বংশগতি সম্বলেখ এক সময় মানুষৰ ধাৰণা হিল কাৰণিক। পৰবৰ্তীতে বিজ্ঞানীয়া ব্যাখ্যা দিয়োছেন কীভাৱে পিতামাতার বৈশিষ্ট্য তাৰ সভানৰস্ততিতে সংকীর্ণ হয়। উনবিল শভাবীয় হিতীয়াৰ্থে প্ৰথম যিনি বংশগতিৰ ধাৰা সম্বলেখ সঠিক ধাৰণা দেন তাৰ নাম ফেল্প জোহান মেডেল। বৰ্তমানে বংশগতি সম্বলেখ আধুনিক যে তত্ত্ব প্ৰচলিত আছে তা মেডেলৰ আবিষ্কাৰ ভৱেয়ে উপৰ ভিত্তি কৱে প্ৰতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জন্য মেডেলকে জিনতত্ত্বৰ জনক বলা হয়।

নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নিৰ্মিট সংখ্যক সূতাৰ মতো যে অণগুলো জীৱেৰ বংশগত বৈশিষ্ট্য বহু কৱে তাৰে ক্লোমোজোম বলে। ক্লোমোজোমেৰ গঠন ও আকাৰ সমৰূপে আমৰা যে ধাৰণা পাই তা প্ৰধানত মাইটোসিস কোষ বিভাজনেৰ প্ৰোক্রেছ ধাৰণ সৃষ্টি ক্লোমোজোম থেকে পাই। প্ৰতিটি ক্লোমোজোমেৰ প্ৰধান সূচি অল্প থাকে—ক্লোমাটিড ও সেল্ফোমিয়াৰ। মাইটোসিস কোষ বিভাজনেৰ প্ৰোক্রেছ ধাৰণ প্ৰত্যেকটা ক্লোমোজোম অস্থাবৰ্সিতাৰে বিচৰ্ত হওয়াৰ পৰি যে সূচি সময় আকৃতিৰ সূতাৰ মতো অল্প গঠন কৱে তাৰে প্ৰত্যেকটিকে ক্লোমাটিড বলে। ক্লোমাটিড সূচি বে নিৰ্মিট স্থানে প্ৰকল্পৰ সূচি থাকে তাকে সেল্ফোমিয়াৰ বলে। কোষ বিভাজনেৰ সময় শিখল তত্ত্ব সেল্ফোমিয়াৰেৰ সাথে সূচক হয়।



জোহান মেডেল
১৯২২-১৯৮৮

নিউক্লিক এসিড দুই ধৰনেৰ ঘৰা— DNA (ডিঅসিইআইডো নিউক্লিক এসিড) এবং RNA (আইডো নিউক্লিক এসিড)। ক্লোমোজোমেৰ প্ৰধান উপাদান DNA। বংশগতি ধাৰা গ্ৰিবহনে ক্লোমোজোমেৰ বৈশিষ্ট্য নিৱৰ্জনকৰী DNA ও RNA এৰ পুনৰুৎপন্নিসীম। সাধাৱণত ক্লোমোজোমেৰ DNA অগুণ্ঠোই ১১ জীৱেৰ চারিপিণ্ডীকৈৰ প্ৰকৃত ধাৰণ এবং জীৱদেহেৰ বৈশিষ্ট্যগুলো পুনৰুৎপন্নমে বহন কৱে। তাই ১১

বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী DNA এর অংশকে জিন নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং DNA হলো ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনের রাসায়নিক রূপ। যেসব জীবে DNA থাকে না কেবল RNA থাকে সে ক্ষেত্রে RNA জিন হিসেবে কাজ করে। যেমন- তামাক গাছের মোজাইক ভাইরাস (TMV)।

জীবের একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একাধিক জিন কাজ করে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটিমাত্র জিন বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চোখের রং, চুলের প্রকৃতি, চামড়ার রং ইত্যাদি সবই জিন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। মানুষের মতো অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলোও তাদের ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রোমোজোম জিনকে এক বৎসর থেকে পরবর্তী বৎসে বহন করার জন্য বাহক হিসাবে কাজ করে বংশগতির ধারা অঙ্কৃত রাখে।

মিয়োসিস কোষ বিভাজনের দ্বারা বংশগতির এ ধারা অব্যাহত থাকে। ক্রোমোজোম বংশগতির ধারা অঙ্কৃত রাখার জন্য কোষ বিভাজনের সময় জিনকে সরাসরি মাতাপিতা থেকে বহন করে পরবর্তী বৎসধরে নিয়ে যায়। এ কারণে ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌতিকিতা বলা হয়।

সুতরাং এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম মিয়োসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বংশগতির ধারা অব্যাহত থাকে এবং ক্রোমোজমের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বংশানুক্রমে প্রতিটি প্রজাতির স্বকীয়তা রক্ষিত হয়।

মানুষের প্রতিটি দেহকোষে ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। জনন কোষে এবং ভ্রূণের কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত হবে?

নতুন শব্দ : অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস, মিয়োসিস, হ্যাপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড, সিন্ডল তত্ত্ব, সাইটোকাইনেসিস, DNA, RNA, অপত্য কোষ, জাইগোট

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম—

- জীবের বৃদ্ধি কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ঘটে।
- কোষ বিভাজন কয় প্রকার এবং এগুলো কোথায় ঘটে ?
- জীবে ক্রোমোজোম সংখ্যা কীভাবে ধ্রুবক থাকে ?
- হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড বলতে কী বোঝায় ?
- বংশগতির ধারক জিন এবং বংশানুক্রমে এগুলোর বাহক ক্রোমোজোম।
- গ্রেগর জোহান মেন্ডেল বংশগতির জনক।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ————— ধাপে ক্রোমোজোম ক্রোমাটিড সহ বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান নেয়।
২. ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পায় ————— বিভাজনে।
৩. অ্যামিবায় ————— বিভাজন দেখা যায়।
৪. জীবের দেহকোষে ক্রোমোজোমের প্রকৃতি —————।
৫. নিউক্লিয়াস বিভাজন পদ্ধতিকে ————— বলে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাইটোসিস বিভাজনের কোন ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সর্বাধিক খাটো ও মোটা হয়?

ক. প্রোফেজ	খ. প্রো-মেটাফেজ
গ. মেটাফেজ	ঘ. অ্যানাফেজ
২. মানুষের চোখের রং নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি?

ক. DNA	খ. RNA
গ. নিউক্লিওলাস	ঘ. সেন্ট্রোমিয়ার

নিচের অংশটুকু পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সাফওয়ান অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পিয়াজের মূলের কোষ পর্যবেক্ষণ করছিল। সে কোষ বিভাজনের একটি দশায় কোষের নিউক্লিয়াসে কোনো আবরণী ও নিউক্লিওলাস দেখতে পেল না, তবে ক্রোমোজোমগুলো কোষের ঠিক মাঝ বরাবর অবস্থান করতে দেখল।

৩. সাফওয়ান কোষ বিভাজনের কোন দশাটি পর্যবেক্ষণ করেছিল ?

ক. প্রোফেজ	খ. প্রো-মেটাফেজ
গ. মেটাফেজ	ঘ. অ্যানাফেজ
৪. সাফওয়ান এর পর্যবেক্ষণকৃত দশাটির পরবর্তী দশায়-
 - i. ক্রোমোজোমগুলো সেন্ট্রোমিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে
 - ii. ক্রোমাটিডগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে
 - iii. সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১. ফারাবী স্যার বিজ্ঞান ক্লাসে কোষ বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন, কোষ বিভাজনের একটি বিশেষ ধাপে নিউক্লিয়াসে অবস্থিত সুতার মতো অংশের সেন্ট্রোমিয়ার দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। ফলে বিভাজিত কোষে এর সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

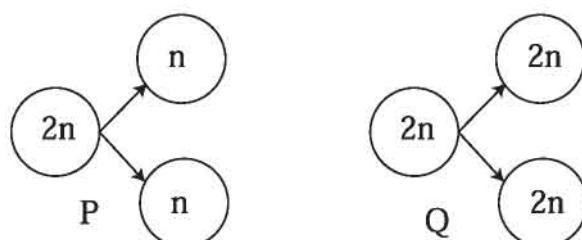
ক. কোন ধরনের কোষ বিভাজনে জননকোষ উৎপন্ন হয়?

খ. অ্যামাইটোসিস বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. ফারাবী স্যারের বর্ণিত বিশেষ ধাপটির সচিত্র বর্ণনা দাও।

ঘ. ফারাবী স্যারের বর্ণিত সুতার মতো অংশটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

২.



ক. মানুষের প্রতিটি দেহকোষে কয়টি ক্রোমোজোম রয়েছে?

খ. জিন বলতে কী বোঝায়?

গ. P কোষ বিভাজনটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উন্নত প্রাণীতে P ও Q কোষ বিভাজন দুইটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যাপন, অভিস্তৰণ ও প্রস্বেদন

উক্তিদ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ সবগ শোষণ করে এবং সেই পানি ও রস কাঁড়ের ভিতর দিয়ে পাতায় পৌছায়। আবার দেহে শৈথিল পানি উক্তিদ বাস্তু আকারে দেহ থেকে বের করে দেয়। উক্তিদ যে প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রহরণ করে এবং অঙ্গিজেন গ্যাস ত্যাগ করে, দেহে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ সবগ শোষণ করে ঐ রস দেহের নানা অঙ্গে পরিবহন করে ও দেহ থেকে পানি বাস্তু আকারে বের করে দেয় সেই সব প্রক্রিয়া ব্যাপন, অভিস্তৰণ, শোষণ, পরিবহন ও প্রস্বেদনের মাধ্যমে ঘটে।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- ব্যাপন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অভিস্তৰণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উক্তিদের পানি পরিত্যাগ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উক্তিদের পানি শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ ও ২ : ব্যাপন

আমরা জানি সব পদার্থই কতগুলো স্ফুল স্ফুল অণু দিয়ে তৈরি। এ অণুগুলো সবসময় গতিশীল বা চলমান অবস্থায় থাকে। তরল ও গ্যাসের ক্ষেত্রে অণুগুলোর চলন স্রুত হয় এবং বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের দিকে অণুগুলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণ না অণুগুলোর ঘনত্ব সুই স্থানে সমান হয়। অণুগুলোর এরূপ চলন প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে। ব্যাপনকারী পদার্থের অণু-পরমাণুগুলোর গতিশক্তির প্রভাবে এক প্রকার চাপ সৃষ্টি হয় যার প্রভাবে অধিক ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে কম ঘনত্বযুক্ত স্থানে অণুগুলো ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রকার চাপকে ব্যাপন চাপ বলে। কোনো পদার্থের অণুর ব্যাপন ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ না উক্ত পদার্থের অণুগুলোর ঘনত্ব সর্বত্র সমান হয়। অণুগুলোর ঘনত্ব সমান হওয়া মাত্রাই পদার্থের ব্যাপন বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যাপন কলতে কী বোবায় তা কয়েকটি পরীক্ষার মাধ্যমে সহজে বোবা যায়। পরীক্ষার্থ জ্ঞানের ভিত্তিতে আলোচনা করে ব্যাপন সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান পাওয়া যায়। নিচে ব্যাপন প্রক্রিয়ার কয়েকটি পরীক্ষা আলোচনা করা হলো—

ব্যাপনের অনেক প্রমাণ আমাদের আশে পাশেই দেখা যায়। যেমন— ঘরে সেন্ট বা আতর ছড়ালে বা ধূপ ঝালালে সমস্ত ঘরে তার সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। এটি ব্যাপনের কারণে ঘটে। ধূপের ধোয়া ও সেন্টের অগুগুলো অধিক ঘনত্ব সম্পন্ন হওয়ায় সম্পূর্ণ ঘরে কম ঘনত্ব সম্পন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সমস্ত ঘর সুবাসে ভরে যায়।



চিত্র ৩.১ : সেন্টের ব্যাপন।

কাজ : পানিতে তুঁতের ব্যাপন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : তুঁতে, বিকার, পানি

পদ্ধতি : কিছু পরিমাণ তুঁতে বিকারের পানিতে ফেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তুঁতে পানিতে দ্রবীভূত হবে এবং পানির রং তুঁতের রং ধারণ করবে। কেন এমন হলো ব্যাখ্যা কর। পরিশেষে আমাদের চারপাশে সংঘটিত বিভিন্ন ব্যাপন ক্রিয়ার তালিকা তৈরি কর।



ব্যাপনের পুরুষ্ট : জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যাপন প্রক্রিয়া ঘটে। যেমন— উদ্বিদ সালোকসংশ্লেষণের সময় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অঙ্গিজেন ত্যাগ করে। এই অত্যাবশ্যক কাজ ব্যাপন দ্বারা সম্ভব হয়। জীবকোষে শ্বসনের সময় গ্লুকোজ জ্বরণের জন্য অঙ্গিজেন ব্যবহৃত হয়। ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা কোষে অঙ্গিজেন প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যায়। উদ্বিদ দেহে শোষিত পানি বাষ্পাকারে প্রয়েদনের মাধ্যমে দেহ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বের করে দেয়। প্রাণীদের শ্বসনের সময় অঙ্গিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের আদান-প্রদান ও রক্ত থেকে পৃষ্ঠি উপাদান, অঙ্গিজেন প্রভৃতি সমিকায় বহন ও সমিকা থেকে কোষে পরিবহন করা ব্যাপন দ্বারা সম্পন্ন হয়।

গাঠ ৩ : অভিন্নবৎ

অভিন্নবৎ প্রক্রিয়াটি বোবার জন্য আমাদের যে বিষয়ের ধারণা দরকার তার মধ্যে অন্যতম হলো ভিন্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট দুইটি দ্রবণের মধ্যে অবস্থিত পর্দার বৈশিষ্ট্য জ্ঞান। পর্দাকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, অভেদ্য পর্দা, ভেদ্য পর্দা ও অর্ধভেদ্য পর্দা।

অভেদ্য পর্দা : যে পর্দা দিয়ে দ্রাবক ও দ্রাব উভয় প্রকার পদার্থের অগুগুলো চলাচল করতে পারে না তাকে অভেদ্য পর্দা বলে। যেমন— পলিথিন, কিউটিনযুক্ত কোষপ্রাচীর।

ভেদ্য পর্দা : যে পর্দা দিয়ে দ্রাবক ও দ্রাব উভয়েরই অণু সহজে চলাচল করতে পারে তাকে ভেদ্য পর্দা বলে। যেমন— কোষপ্রাচীর।

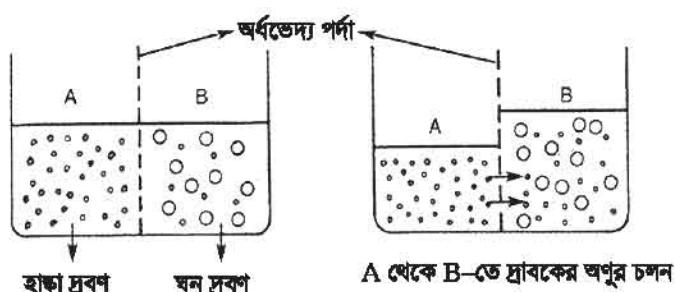
অর্ধভেদ্য পর্দা : যে পর্দা দিয়ে কেবল ঘনত্বের দ্রাবক অণু (উত্তিরের ক্ষেত্রে পানি) চলাচল করতে পারে কিন্তু দ্রাবক অণু চলাচল করতে পারে না তাকে অর্ধভেদ্য পর্দা বলে। যেমন— কোষপর্দা, ডিমের খোসার ভিতরের পর্দা, মাছের পটকার পর্দা ইত্যাদি।

আমরা লক্ষ করেছি যদি একটা শূকনা কিশমিশকে পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখি তাহলে সেটি ফুলে উঠে। এটি কিশমিশ দ্বারা পানি শোষণের কারণে ঘটে এবং পানি শোষণ অভিস্রবণ দ্বারা ঘটে। অভিস্রবণও এক প্রকার ব্যাপন। অভিস্রবণ কেবলমাত্র তরলের ক্ষেত্রে ঘটে এবং একটি অর্ধভেদ্য পর্দা অভিস্রবণের সময় দুটি তরলকে পৃথক করে রাখে। কিশমিশের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা এখানে বোঝানো হলো।

আমরা জানি দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একত্রে মিশ্রিত হলে স্বাভাবিকভাবেই এদের মধ্যে ব্যাপন সংঘটিত হয়। লক্ষ করে দেখ কিশমিশের ভিতরের পানি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে কিশমিশগুলো কুচকে গেছে। কিশমিশগুলো পানিতে রাখলে পানি শোষণ করে ফুলে উঠবে। কারণ কিশমিশের ভিতরে শর্করার গাঢ় দ্রবণ একটি পর্দা দ্বারা পানি থেকে পৃথক হয়ে আছে। ফলে শুধু পানির অণু কিশমিশের অভ্যন্তরে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে, কিন্তু শর্করা অণু এই রকম পর্দা তে করে বাইরে আসতে পারছে না। এ ধরনের পর্দাকে অর্ধভেদ্য পর্দা বলে। যে প্রক্রিয়ায় একই পদার্থের কয় ঘনত্ব এবং বেশি ঘনত্বের দুটি দ্রবণ অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক করা হলে দ্রাবক পদার্থের অণুগুলো কয় ঘনত্বের দ্রবণ থেকে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যায় তাকে অভিস্রবণ বা অসমোসিস বলে (চিত্র ৩.৩)।



চিত্র ৩.২ : কিশমিশের সাহায্যে অভিস্রবণ পরীক্ষা



চিত্র ৩.৩ : অভিস্রবণ প্রক্রিয়া

পাঠ ৪ : অভিস্রবণের প্রকৃতি

জীবকোষের কোষাবরণ বা প্লাজমা পর্দা অর্ধভেদ্য পর্দা হিসেবে কাজ করে। প্লাজমা পর্দা দিয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাটিত্ত পানি মূলরোমের মধ্যে প্রবেশ করে বা বাইরে আসে। কোষস্থিত পানি খনিজ লবণকে

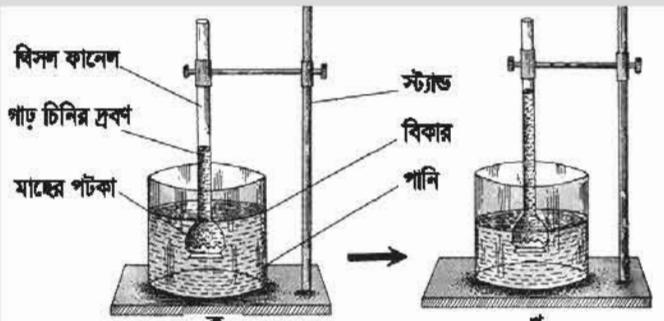
দ্রবীভূত করে কোষ রসে পরিণত হয়। সুতরাং কোষের মধ্যে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোকে সচল রাখার জন্য অভিস্রূতগের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রক্রিয়ার দ্বারা উষ্টিদ কোষের রসস্ফীতি ঘটে। কাণ্ড ও পাতাকে সতেজ এবং খাড়া রাখতে সাহায্য করে। ফুলের পাপড়ি বল্দ বা খুলতে পারে। তাছাড়া প্রাণীর অঙ্গে খাদ্য শোষিত হতে পারে।

কাজ : অভিস্রূতগের পরীক্ষা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : থিসল ফালেল, মাছের পটকা, বিকার, চিনির গাঢ় মুখণ্ড, স্ট্যাঙ্ড-ক্ল্যাম্প

পদ্ধতি : থিসল ফালেলের চওড়া মুখটি মাছের পটকায় ঢেকে সূতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে এবং বিকারটিতে অর্ধেক পানি নিতে হবে। বিকারে পানি

নেওয়ার পর থিসল ফালেলের নল দিয়ে চিনির গাঢ় মুখণ্ড ঢালতে হবে। এবার ফালেলের চওড়া মুখটি বিকারের পানিতে সম্পূর্ণ দুবিয়ে ফালেলটিকে ক্ল্যাম্পের সাহায্যে স্ট্যাঙ্ডের সাথে আঁটকে রাখতে হবে। এরপর ফালেলের নলে চিনির মুখণ্ডের তলটি মার্কর পেন দিয়ে চিহ্নিত করে পরীক্ষা - ব্যবস্থাটিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিতে হবে।



চিত্র ৩.৪ : অভিস্রূতগের পরীক্ষা ক. পরীক্ষার শুরুতে, খ. পরীক্ষার কয়েক ঘণ্টা পরে

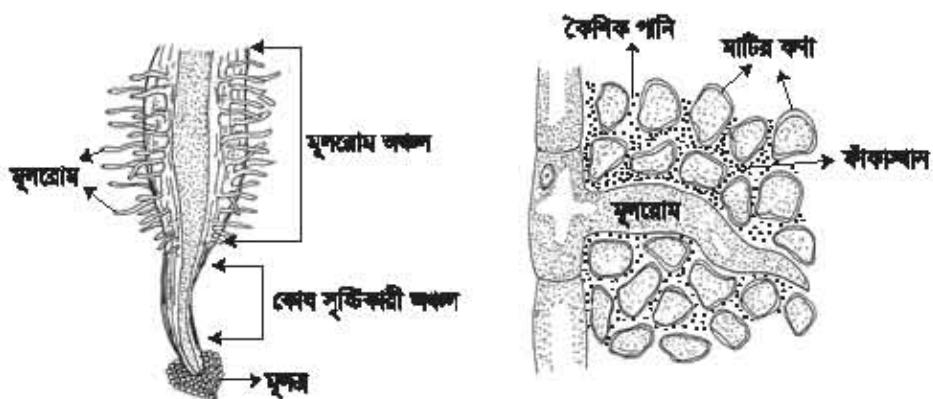
পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে থিসল ফালেলের নলের মুখণ্ডের তল উপরের দিকে উঠে গেছে। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ফালেলের নলের মুখণ্ডের তল আর উপরে উঠে না।

এ পরীক্ষায় তুমি যা পর্যবেক্ষণ করলে তা থেকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ-

১. মাছের পটকার পর্দাটি কী ধরনের পর্দা?
২. চিনির মুখণ্ড কেন ফালেলের নলের উপরে উঠে আসলো?
৩. কিছুক্ষণ পর ফালেলের মুখণ্ড উপরে না উঠে স্থায়ীভাবে কেন অবস্থান করল?

পাঠ ৫ : উষ্টিদের পানি ও খনিজ লবণ শোষণ

উষ্টিদের পানি শোষণ পদ্ধতি : মাটি থেকে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ উষ্টিদ দেহের সঙ্গীব কোষে টেনে নেওয়ার পদ্ধতিকে সাধারণভাবে শোষণ বলা যেতে পারে। স্থলে বসবাসকারী উষ্টিদগুলো মূলতোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি শোষণ করে। পানিতে নিমজ্জিত উষ্টিদ সারাদেহ দিয়ে পানি শোষণ করে। স্থলজ উষ্টিদগুলোর মূলতোম মাটির সূক্ষ্মকণার ফাঁকে লেগে থাকা কৈশিক পানি অভিস্রূতণ প্রক্রিয়ায় নিজ দেহে টেনে নেয়।

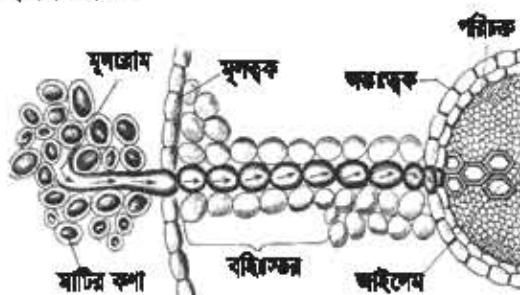


চিত্র ৩.৫ : মূলের বিভিন্ন অংকল

মূলজ্বামের আটোরাটি হৈছে, তাই প্রথমে ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ কৰে এবং কোকোটীজের নিচে অবস্থিত অর্ধতেজ প্রাণমূল পর্যায় সহস্রী আসে। মূলজ্বামের কোধীয় মুখশের ঘনত্বের ফুলনাম তার পরিবেশের মুখশের ঘনত্ব কম থাকায় পানি (প্রাবক) কোধের মধ্যে অক্ষয়অতিক্রম প্রক্রিয়ায় প্রবেশ কৰে। মূলের বাইরের আবস্থণ থেকে কেবল পর্যাপ্ত সব কোধের কোধ অসের ঘনত্ব সমান নয়। ফলে কেন্দ্ৰীয় অতিক্রমশের কাছাপে মূলের এক কোধ থেকে অন্য কোধে পানির পতি অব্যাহত থাকে এবং পরিষেবে পানি কাঠের জাইলেম বাহিকের মাঝামে পাতার পৌছায়।

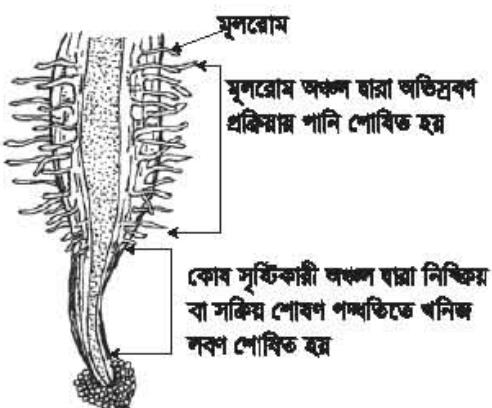
ইমবাইবিশন : অধিকাল কলমেডথমী পদাৰ্থী পানিয়াছী। উত্তিদেহে বিভিন্ন ধৰনের কলমেডথমী পদাৰ্থ বিদ্যুমান। বৰ্ধা— স্ট্যাট, সেলুলোজ, জিলেটিন ইত্যাদি। এসব পদাৰ্থ তাদেৱ কলমেডথমী গুপ্তে অন্যাই পানি শোষণ কৰতে সক্ষম। কলমেডথমী বিভিন্ন পদাৰ্থ (উত্তিদেহ কেতো কেন্দ্ৰ পদাৰ্থ) বে প্রক্রিয়াৰ নামা ধৰনেৱ তৱল পদাৰ্থ (উত্তিদেহ কেতো পানি) শোষণ কৰে তাকে ইমবাইবিশন বলে।

উত্তিদেহ অনিজ শবণ শোষণ পৰ্যাপ্তি : উত্তিদেহ স্বাভাৱিক বৃক্ষৰ অন্য কলগুলো অনিজ শবণেৱ থাবোজন হয়। উত্তিদেহ অন্য অযোজনীয় অনিজ শবণেৱ উৎস মাটিস্ব পানি। মাটিস্ব পানিতে অনিজ শবণ মুৰৰুত অবস্থাৰ থাকে।



চিত্র ৩.৬ : মূলের কোধে অক্ষয়ক প্রক্রিয়াৰ পানি শোষণ

খনিজ লবণগুলো মাটিস্থ পানিতে দ্রুতভূত থাকলেও পানি শোষণের সঙ্গে উষিদের লবণ শোষণের কোনো সম্ভর্তা নেই, সুটি প্রক্রিয়াই তিন্নধর্মী। উষিদ কখনো লবণের সম্মূল অণুকে শোষণ করতে পারে না। লবণগুলো কেবল আয়ন হিসেবে শোষিত হয়। উষিদ মাটির ইস্তেকে খনিজ লবণ শোষণ দুইভাবে সম্ভব করে। যথা— ১. নিচৰ্ক্ষয় শোষণ; ২. সক্রিয় শোষণ।



চিত্র ৩.৭ : মূল দ্বারা পানি ও খনিজ লবণ শোষণ

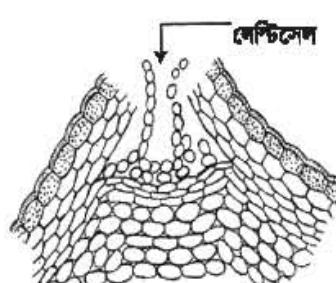
পাঠ ৬ : প্রয়েদন

প্রয়েদন বা বাস্তুমোচন উষিদের একটি বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। আমরা পূর্বের পাঠে জেনেছি, উষিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য পানি অপরিহার্য। তাই উষিদ মূলরোমের সাহায্যে শাটি থেকে ফ্লুর পরিমাণ পানি শোষণ করে। শোষিত পানির কিছু অংশ উষিদ তার বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে ব্যবহার করে এবং বাকি অংশ বাস্তাকারে বায়ুমণ্ডলে পরিষ্কারণ করে। উষিদের দেহাভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে বাস্তাকারে পানির এই নির্গমনের প্রক্রিয়াকে প্রয়েদন বা বাস্তুমোচন বলে।

প্রয়েদন প্রধানত পত্ররস্ত্রের মাধ্যমে হয়। এছাড়া কাণ্ড ও পাতার কিউটিকুল এবং কাণ্ডের ভূকে অবস্থিত লেপ্টিসেল নামক এক বিশেষ ধরনের অঙ্গের মাধ্যমেও অর পরিমাণ প্রয়েদন হয়। প্রয়েদন কোরায় সংবিত্ত হচ্ছে তার ভিত্তিতে প্রয়েদন তিন প্রকার যথা— ১. পত্ররস্ত্রীয় প্রয়েদন, ২. ভূকীয় বা কিউটিকুলার প্রয়েদন এবং ৩. লেপ্টিসেল প্রয়েদন।



পরৱর্তন বা স্টোমাটা



লেপ্টিসেল

চিত্র ৩.৮ : প্রয়েদনের স্বাক্ষর

কাজ : প্রয়োজনীয় উপকরণ :

প্রয়োজনীয় উপকরণ : টবে শাপানো পাহ, টেবিল, পানি, পলিথিন,
সূতা ও তেসলিন

পদ্ধতি : মুটি টবে শাপানো পাহ টেবিলের উপর অথবা পাহের পোড়ার
পরিমাণ সতো পানি সাও। একটি পাহকে পাতামুক্ত অথবা পলিথিনের
মোড়ক দিয়ে দেকে দাও। তাইবার পাহের পোড়ার পলিথিনটি সূতা দিয়ে
বেঁধে এ আনে তেসলিনের প্রসেপ দাও। যাতে বাইজের থেকে বাতাস
বা পানি যেতে না পারে। অপর পাহটির পাতামুক্ত হিচে বেলে
একইভাবে প্রথম পাহটির মতো পলিথিন মোড়ক দিয়ে দেকে কেল।
পাহ দুটিকে সুর্যের আলোতে রাখ।



চিত্র ৩.৯ : প্রয়োজনীয় পরীকা

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখব পাতামুক্ত পাহের টবে পলিথিনের ডিতারে বিলু বিলু পানি জমেছে কিছু
পাতাবিহীন পাহের টবে পলিথিনের ডিতারে পানি জমেনি। পাতামুক্ত পাহের টবে পলিথিনের ডিতারে কেল বিলু
বিলু পানি জমেছে এবং পাতাবিহীন টবে পলিথিনে কেল পানি বিলু জমেনি? এ পরীকা থেকে ভূমি কী
গ্রাম করলে? তোমার এ পর্যবেক্ষণ থেকে ভূমি কী সিদ্ধান্তে উপনীত হবে?

পাঠ ৭ : প্রয়োজনীয় পুরুষ

উত্তিস জীবনে প্রয়োজন একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া। প্রয়োজনের ফলে উত্তিসদেহ থেকে প্রচুর পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে
যায়। এতে উত্তিসের মৃত্যুও হতে পারে। তাই আশাভদ্রক্তিতে উত্তিসের জীবনে প্রয়োজনকে ক্ষতিকর প্রক্রিয়া
হচ্ছেই মনে হয়। এজন্য প্রয়োজনকে কোন হয় উত্তিসের জন্য এটি একটি "Necessary evil", অন্যও
প্রয়োজন উত্তিস জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রয়োজনের ফলে উত্তিস ভার দেহ থেকে পানিকে কেবল
অতিরিক্ত পানির চাপ থেকে মুক্ত করে। প্রয়োজনের ফলে উত্তিসকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণে সাহায্য করে। উত্তিসদেহকে ঠাঁকা রাখে
এবং পাতার আর্দ্ধতা বজার রাখে। প্রয়োজনের ফলে খাদ্য কৈরিয় জন্য পাতার অক্ষিয়ায় পানি সরবরাহ সম্ভব
হয়। পাতায় প্রয়োজনের ফলে জাইলের বাইকায় পানিয় যে টাম সৃষ্টি হয় তা মূল্যোয় কর্তৃক পানি শোষণ
ও উত্তিসের শীর্ষে পরিবহনে সাহায্য করে।

উত্তিসের প্রয়োজন প্রক্রিয়া সালোকসংযোগে ও ক্ষসনের মতো পরিবেশে তেমন কেমনো থাকার রাখে না। তবে
পানিচক্রে বাস্তীভবনে অর্ধাং কৃপুষ্টের পানি জলীয়বাচ্চ হিসেবে বায়ুমণ্ডলে ঝোপ করতে স্বল্প উত্তিসের
প্রয়োজন প্রক্রিয়া ভূমিকা রাখে। প্রয়োজনের ফলে প্রচুর পানি বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে পৌছায়।

পাঠ ৪-১০ : পানি ও খনিজ সংবলের পরিবহন

আমরা জেনেছি যে উত্তিস মূলের মূলজোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি ও খনিজ সংবল পোৰণ করে। এই পানি ও খনিজ সংবলের প্রবণকে কাট এবং শার্ষা-শার্ষাৰ মধ্য দিয়ে পাতার পৌষ্টি সরকার। কারণ পাতাই প্রথান্ত এগুলোকে সালোকসংযোগ প্রক্রিয়ায় আদ্য তৈরির রসন হিসেবে ব্যবহার করে। আবার পাতার তৈরি আদ্য উত্তিস তার দেহের বিভিন্ন অংশে বৰা—কাট ও শার্ষা-শার্ষাৰ পাঠিয়ে দেয়। উত্তিসের মূলজোয় আৱা শোষিত পানি ও খনিজ সংবল মূল থেকে পাতায় পৌষ্টি এবং পাতার তৈরি আদ্যবস্তু সাঁা দেহে ছড়িয়ে পড়াকে পরিবহন বলে। পোৰণের মতো পরিবহন পদ্ধতি ও উত্তিসের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। আইলেম ও ফোয়েম নামক পরিবহন চিনুয়ে মাধ্যমে উত্তিসে পরিবহন ঘটে। আইলেমের মাধ্যমে মূল আৱা শোষিত পানি পাতায় আৱ এবং ফোয়েম আৱা পাতায় উৎসন্ন তারল আদ্য সাঁা দেহে পরিবাহিত হয়। সৃতৱাঁ আইলেম ও ফোয়েম হলো উত্তিসের পরিবহনের পথ। উত্তিসের পরিবহন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিতভাবে সম্পূর্ণ হয়—
উত্তিসের মূলজোয় দিয়ে পানি অভিযোগ প্রক্রিয়ায় এবং পানিতে স্বীকৃত খনিজ সংবল নিষ্কারণ ও সকৃত শোষণ পদ্ধতিতে শোষিত হয়ে আইলেম চিনুতে পৌষ্টি। আইলেমের মাধ্যমে উত্তিসেহে জনসের উর্ভৰমূলী পরিবহন হয়। ফোয়েমের মাধ্যমে পাতায় তৈরি আদ্যসের উর্ভৰমূলী পরিবহন হয়।

উত্তিসের সংবলন বা পরিবহন বলতে প্রথান্ত উর্ভৰমূলী পরিবহন এবং নিম্নমূলী পরিবহনকে বোৱাৰ।

মাটি থেকে মূলজোমের আৱা শোষিত পানি ও খনিজ সংবলের সংবল (জল) যে আইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে পাতায় পৌষ্টি তা একটি পৌষ্টি মাধ্যমে প্রয়োগ কৰা বাব। এ জন্য আৱোজন পেপাজোমিয়া উত্তিস। এ পাইজে কাট ও মধ্য শিরা আছে।



চিত্ৰ ৪.১০ : উত্তিসেহে পরিবহন (উর্ভৰমূলী)

কাছ : পানি পরিবহনের পৰীক্ষা

পোপাজোমীয়া উত্তিসে : সোপাটি অথবা পেপাজোমিয়া উত্তিস, বোতল, ঘূৰু, সাল রঁ, পানি

পদ্ধতি : একটি নীলম কাটের সোপাটি অথবা পেপাজোমিয়া উত্তিস মাটি থেকে মূলসহ ঘূৰে ঘূৰলুলো পানিকে তালো কৰে ধূঘো দিতে হবে। এখন একটি বোতল পানি দিয়ে ভাতে ফৰেক কোঁচা সাল রঁ যোগাতে হবে। এবার পাইজের মূলসহ অংগটি রাত্তি পানিতে ঘূৰিয়ে রাখতে হবে।

কাছেক ঘন্টা পঞ্জে দেখা যাবে যে কাট এবং পাতায় পীরাসুলো সাল রঁ ধূৱল কৰেছে। পাহাটি বোতল থেকে ঘূৰে কাটের অস্থজ্জেদ বা অস্বজ্জেদ কৰে অধুৰীকৰণ কৰে দেখ এবং তা শিপিবল্প কৰ। তোমার পৰ্যবেক্ষণ থেকে জুমি কী সিজ্জাতে উপনীত হলে এবং ধাতে কী প্রয়োগ হলো।



চিত্ৰ ৪.১১ : পানি পরিবহনের পৰীক্ষা

নতুন শব্দ : ব্যাপন, অর্ধভেদ্য পর্দা, ভেদ্য পর্দা, অন্তঃঅভিস্তৰণ, বহিঃঅভিস্তৰণ, আয়ন, কোষরস, সক্রিয় শোষণ, নিষ্ক্রিয় শোষণ, প্রস্বেদন

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম—

- ব্যাপন ও অভিস্তৰণ প্রক্রিয়া কী?
- উষ্ণিদ-ব্যাপন ও অভিস্তৰণ প্রক্রিয়ায় পানি, খনিজ লবগের আয়ন মাটিস্থ দ্রবণ থেকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় মূলের মূলরোম দ্বারা শোষণ করে।
- উষ্ণিদের জাইলেম দিয়ে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ পাতায় পরিবাহিত হয়।
- উষ্ণিদের ফ্লোয়েম দিয়ে পাতায় তৈরি খাদ্য উষ্ণিদ দেহের শাখা ও প্রশাখায় পৌছায়।
- অভিস্তৰণের ফলে খাদ্য তৈরির জন্য পাতায় অবিরাম পানি সরবরাহ সম্ভব হয়।
- প্রস্বেদনের ফলে জাইলেম বাহিকায় যে টান সৃষ্টি হয় তা মূলরোম কর্তৃক পানি শোষণে সাহায্য করে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. খলজ উষ্ণিদে প্রস্বেদন ঘটে———— দিয়ে।
২. কোষপর্দা এক ধরনের ————— পর্দা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উষ্ণিদের দেহাভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে পানি নির্গমন প্রক্রিয়াকে কী বলে?

ক. ব্যাপন	খ. অভিস্তৰণ
গ. প্রস্বেদন	ঘ. ইমবাইবিশন
২. অভিস্তৰণ প্রক্রিয়া—
 - i. অর্ধভেদ্য পর্দার প্রয়োজন হয়
 - ii. দ্রাব কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয়
 - iii. দ্রাবক কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ঘর সাজানোর জন্য আনোয়ারা কিছু রঞ্জনীগুৰু ফুল ফুলদানিতে রাখল। সন্ধ্যাবেলো সে লক্ষ করল, ফুলের সুবাসে সম্পূর্ণ ঘর ভরে গেছে। এই ঘটনার সৎগে তার বিজ্ঞান বইয়ে পাঠিত একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মিল লক্ষ করল।

৩. উদ্দীপকের বিশেষ প্রক্রিয়াটি কী?

- | | |
|--------------|-------------|
| ক. ব্যাপন | খ. অভিস্তৰণ |
| গ. প্রস্বেদন | ঘ. শ্঵সন |

৪. উল্লিখিত প্রক্রিয়ায়-

- i. জীবকোষে অক্সিজেন প্রবেশ করে
- ii. উল্কিদ দেহ থেকে পানি বের করে দেয়
- iii. উল্কিদ সালোকসংশ্লেষণের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. জারিফের আশ্মা একদিন সেমাই রান্না করার জন্য কিশমিশ ভিজিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণ পরে জারিফ লক্ষ করল, কিশমিশগুলো ফুলে গেছে। অন্যদিকে জারিফের বোন রংতুলি দিয়ে ছবি আঁকছিল। এ সময় হঠাতে করে রং তুলিতে থাকা কিছুটা রং গ্লাসের পানির মধ্যে পড়ে পানিতে ছড়িয়ে গেল।

- ক. ভেদ্য পর্দা কাকে বলে?
- খ. ইমবাইবিশন বলতে কী বোঝায়?
- গ. কোন প্রক্রিয়ায় জারিফের বোনের রং পানিতে ছড়িয়ে গেল? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. জারিফের লক্ষ করা কিশমিশ ফুলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি উল্কিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? বিশ্লেষণ কর।

২. স্কুল থেকে বাসায় ফিরে আদিবা লক্ষ করল, টবে থাকা গাছগুলো সব নেতৃত্বে পড়েছে। বিকাল বেলা সে গাছগুলোতে পানি দিল। পরদিন সকালে দেখল গাছগুলো সতেজতা ফিরে পেয়েছে।

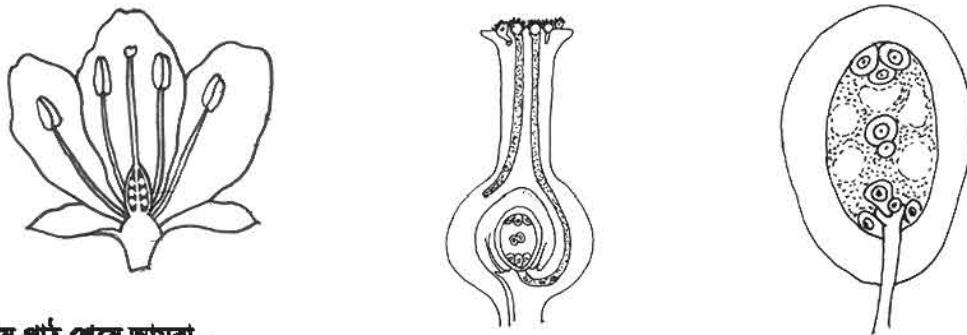
- ক. ব্যাপন কাকে বলে?
- খ. প্রম্বেদনকে কেন Necessary evil বলা হয়?
- গ. টবে থাকা গাছগুলো নেতৃত্বে পড়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পরবর্তীতে গাছগুলো কীভাবে সতেজতা ফিরে পেল? বিশ্লেষণ কর।

প্রজেষ্ঠ : একটা টবে মরিচ/টমেটো চারা গাছ লাগাও। টবে ইউরিয়ার ঘন দ্রবণ দাও। কয়দিন পরে পর্যবেক্ষণ কর চারা গাছটির কী অবস্থা হয়েছে? পর্যবেক্ষণে যা দেখবে তা লিপিবদ্ধ কর এবং এর কারণ কী লেখ। এটি কী প্রমাণ করে তা শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর? তোমার এই পর্যবেক্ষণ থেকে তুমি তোমার এলাকার কৃষক ভাইদের কী উপদেশ দিবে?

চতুর্থ অধ্যায়

উষ্ণিদে বৎস বৃক্ষ

তোমরা লক্ষ করলে দেখবে একটি উষ্ণিদে বহু বীজ সৃষ্টি হয়। এই বীজগুলো থেকে নতুন উষ্ণিদ উৎপন্ন হয়। এছাড়া উষ্ণিদের বিভিন্ন অঙ্গ থেকেও নতুন উষ্ণিদের সৃষ্টি হয়। এ সবই উষ্ণিদের প্রজনন বা বৎস বৃক্ষের উদাহরণ।



এ অধ্যায় পাঠ শেবে আমরা—

- যৌন এবং অযৌন প্রজননের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব;
- পরাগায়ন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিভিন্ন প্রকার পরাগায়নের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব;
- পরিবেশে সংযুক্ত স্ব-পরাগায়ন এবং পর-পরাগায়ন চিহ্নিত করে কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরীক্ষার মাধ্যমে অভ্যর্তোদাগম প্রদর্শন করতে পারব।

পাঠ ১-৩ : প্রজনন বা জনন

পৃথিবীর প্রতিটি জীব মৃত্যুর পূর্বে তার বৎসধর রেখে যেতে চায়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। যে জটিল প্রক্রিয়ায় জীব তার প্রতিবূপ বা বৎসধর সৃষ্টি করে তাকে প্রজনন বা জনন বলে। প্রজনন বা জনন প্রধানত দুই প্রকার, যথা-অযৌন ও যৌন জনন।

অযৌন জনন : যে প্রক্রিয়ায় দুটি শিল্পধর্মী জনন কোষের মিলন ছাড়াই জনন সম্পন্ন হয় তাই অযৌন জনন। নিম্নলিখিত জীবে অযৌন জননের প্রবণতা বেশি। অযৌন জনন প্রধানত দুই ধরনের, যথা-স্পোর উৎপাদন ও অক্তাজ জনন।

(ক) স্পোর উৎপাদন : প্রধানত নিম্নলিখিত উষ্ণিদে স্পোর বা অণুবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে বৎস রক্ষা করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। উষ্ণিদের দেহকোষ পরিবর্তিত হয়ে অণুবীজবাহী একটি অঙ্গের সৃষ্টি করে। এদের অণুবীজথলি বলে। একটি অণুবীজথলিতে সাধারণত অসংখ্য অণুবীজ থাকে। তবে কখনো কখনো একটি থলিতে একটি অণুবীজ থাকতে পারে। অণুবীজ থলির বাইরেও উৎপন্ন হয়। এদের বহিঃঅণুবীজ বলে। বহিঃঅণুবীজের কোনো কোনোটিকে কনিডিয়াম বলে। *Mucor* এ থলির মধ্যে অসংখ্য অণুবীজ উৎপন্ন হয়। *Penicillium* কনিডিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে বৎস বৃক্ষ করে।

(খ) অঙ্গজ জনন : কোনো ধরনের অযৌন রেণু বা জনন কোষ সৃষ্টি না করে দেহের অংশ খন্ডিত হয়ে বা কোনো অঙ্গ রূপান্তরিত হয়ে যে জনন ঘটে তাকে অঙ্গজ জনন বলে। এ ধরনের জনন প্রাকৃতিক নিয়মে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটলে তাকে প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন বলা হয়। যখন কৃত্রিমভাবে অঙ্গজ জনন ঘটানো হয় তখন তাকে কৃত্রিম অঙ্গজ জনন বলে।

প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন : বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্বাভাবিক নিয়মেই এ ধরনের অঙ্গজ জনন দেখা যায়, যেমন—

১. দেহের খড়ায়ন : সাধারণত নিম্নশ্রেণির উক্তিদে এ ধরনের জনন দেখা যায়। *Spirogyra, Mucor* ইত্যাদি উক্তিদের দেহ কোনো কারণে খন্ডিত হলে প্রতিটি খন্ড একটি স্বাধীন উক্তিদ হিসেবে জীবনযাপন শুরু করে।
২. মূলের মাধ্যমে : কোনো কোনো উক্তিদের মূল থেকে নতুন উক্তিদের সৃষ্টি হতে দেখা যায়, যেমন—পটল, সেগুন ইত্যাদি। কোনো কোনো মূল খাদ্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে বেশ মোটা ও রসাল হয়। এর গায়ে কুঁড়ি সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে নতুন উক্তিদ গজায়, যেমন—মিষ্টি আলু।
৩. রূপান্তরিত কাণ্ডের মাধ্যমে : উক্তিদের কোন অংশকে কাণ্ড বলে তা নিশ্চয়ই তোমরা জান। তবে কিছু কাণ্ডের অবস্থান ও বাইরের চেহারা দেখে তাকে কাণ্ড বলে মনেই হয় না। এরা পরিবর্তিত কাণ্ড। বিভিন্ন প্রতিকূলতায়, খাদ্য সঞ্চয়ে অথবা অঙ্গজ জননের প্রয়োজনে এরা পরিবর্তিত হয়। এদের বিভিন্ন রূপ নিম্নে দেওয়া হলো :

(ক) টিউবার : কিছু কিছু উক্তিদে মাটির নিচের শাখার অগ্রভাগে খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে স্ফীত হয়ে কল্পের সৃষ্টি করে, এদের টিউবার বলে। তবিষ্যতে এ কল্প জননের কাজ করে। কল্পের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত থাকে। এগুলো দেখতে চোখের মতো তাই এদের চোখ বলা হয়। একটি চোখের মধ্যে একটি কুঁড়ি থাকে। আঁশের মতো অসবুজ পাতার (শক্ষপত্র) কক্ষে এসব কুঁড়ি জন্মে। প্রতিটি চোখ থেকে একটি স্বাধীন উক্তিদের জন্ম হয়, যেমন—আলু।

কাজ : আলু ও আদা থেকে কীভাবে অঙ্গজ জনন ঘটে তা হাতেকলমে দেখাও।

(খ) রাইজোম : এরা মাটির নিচে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। কাণ্ডের মতো এদের পর্ব, পর্বসন্ধি স্পষ্ট। পর্বসন্ধিতে শক্ষপত্রের কক্ষে কাঞ্চিক মুকুল জন্মে। এরাও খাদ্য সঞ্চয় করে মোটা ও রসাল হয়। অনুকূল পরিবেশে এসব মুকুল বৃক্ষি পেয়ে আলাদা আলাদা উক্তিদ উৎপন্ন করে, যেমন—আদা।

(গ) কল্প (বাল্ব) : এরা অতি ক্ষুদ্র কাণ্ড। এদের কাঞ্চিক ও শীর্ষ মুকুল নতুন উক্তিদের জন্ম দেয়, যেমন—পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি।

(ঘ) স্টেলন : তোমরা কচুর লতি দেখে থাকবে। এগুলো কচুর শাখা কাণ্ড। এগুলো জননের জন্যই পরিবর্তিত হয়। স্টেলনের অগ্রভাগে মুকুল উৎপন্ন হয়। এভাবে স্টেলন উক্তিদের জননে সাহায্য করে, যেমন—কচু, পুদিনা।

(ঙ) অফসেট : কচুরিপানা, টোপাপানা ইত্যাদি জলজ উষ্ণিদে শাখা কাণ্ড বৃদ্ধি পেয়ে একটি নতুন উষ্ণিদ উৎপন্ন করে। কিছুদিন পর মাতৃউষ্ণিদ থেকে এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন উষ্ণিদে পরিণত হয়, যেমন— কচুরিপানা।

(চ) বুলবিল : কোনো কোনো উষ্ণিদের কাষ্ঠিক মুকুলের বৃদ্ধি যথাযথভাবে না হয়ে একটি পিণ্ডের মতো আকার ধারণ করে। এদের বুলবিল বলে। এসব বুলবিল কিছুদিন পর গাছ থেকে খসে মাটিতে পড়ে এবং নতুন গাছের জন্ম দেয়, যেমন— চুপড়ি আলু।

৪. পাতার মাধ্যমে : কখনো কখনো পাতার কিনারায় মুকুল সৃষ্টি হয়ে নতুন উষ্ণিদ উৎপন্ন হয়। যেমন— পাথরকুচি।

এতক্ষণ যেসব প্রক্রিয়ার কথা বলা হলো তা প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে। অঙ্গজ জননে উৎপাদিত উষ্ণিদ মাতৃউষ্ণিদের মতো গুণসম্পন্ন হয়। এর ফলে কোনো নতুন বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটে না। উন্নত গুণসম্পন্ন অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে তাই অনেক সময় কৃত্রিম অঙ্গজ জনন ঘটানো হয়।

কৃত্রিম অঙ্গজ জনন : ভালো জাতের আম, কমলা, লেবু, পেয়ারা ইত্যাদি গাছের কলম করতে তোমরা দেখেছ। কেন কলম করা হয় তা কি ভেবে দেখেছ? যেসব উষ্ণিদের বীজ থেকে উৎপাদিত উষ্ণিদের ফলন মাতৃউষ্ণিদের তুণনায় অনুন্নত ও পরিমাণে কম হয় সাধারণত সেসব উষ্ণিদে কৃত্রিম অঙ্গজ জননের মাধ্যমে মাতৃউষ্ণিদের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা হয়। এবার এসো কৃত্রিম অঙ্গজ জনন সম্পর্কে আমরা জানি।

১. কলম (**Grafting**) : কলম করার জন্য প্রথমে একটি সুস্থ গাছের কঢ়ি ও সতেজ শাখা নির্বাচন করতে হবে। উপযুক্ত স্থানে বাকল সামান্য কেটে নিতে হবে। এবার ঐ ক্ষত স্থানটি মাটি ও গোবর মিশিয়ে ভালোভাবে আবৃত করে দিতে হবে। এবার সেলোফেন টেপ অথবা পলিথিন দিয়ে ঐ স্থানটি মুড়ে দিতে হবে যাতে পানি লেগে মাটি ও গোবরের মিশ্রণ খসে না পড়ে। নিয়মিত পানি দিয়ে এ অংশটি ভিজিয়ে দিতে হবে। এভাবে কিছুদিন রেখে দিলে এ স্থানে মূল গজাবে। এর পরে মূলসহ শাখার এ অংশটি মাতৃউষ্ণিদ থেকে কেটে নিয়ে মাটিতে রোপণ করে দিলে নতুন একটি উষ্ণিদ হিসেবে বেড়ে উঠবে।

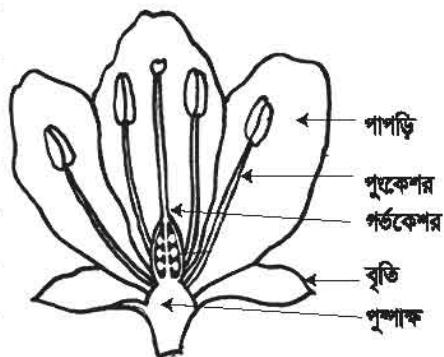
২. শাখা কলম (**Cutting**) : তোমরা লক্ষ করেছ যে গোলাপের ডাল কেটে ভেজা মাটিতে পুঁতে দিলে কিছুদিনের মধ্যেই তা থেকে নতুন ঝুঁড়ি উৎপন্ন হয়। এসব ঝুঁড়ি বড় হয়ে একটি নতুন গোলাপ গাছ উৎপন্ন করে।

কাজ : শাখা কলম বা কাটিং কীভাবে প্রস্তুত করতে হয় তা একটি গোলাপের ডাল দিয়ে প্রদর্শন কর।

পাঠ ৪ : যৌন জনন

ফুল থেকে ফল এবং ফল থেকে বীজ হয়। বীজ থেকে নতুন গাছের জন্ম হয়। এভাবে একটি সম্পূর্ণক উদ্ভিদ যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে। তাই ফুল উদ্ভিদের যৌন জননের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

ফুল : তোমার বিদ্যালয় বা বাড়ির আশেপাশে বহু ফুল ফুটে থাকে। এগুলো থেকে কয়েকটি এনে পর্যবেক্ষণ করে দেখ। তুমি কী সব কয়টি ফুলে মোট পাঁচটি অংশ যেমন- পুষ্পাক, বৃত্তি, দল বা পাপড়ি, পুৎকেশর ও গর্ভকেশর দেখতে পেয়েছ? যদি পাঁচটি অংশ পেয়ে থাক তবে ফুলগুলো সম্পূর্ণ ফুল। আর যদি কোনো কোনোটিতে এই পাঁচটি অংশের মধ্যে একটি বা দুটি অংশ না থাকে তবে ফুলগুলো অসম্পূর্ণ ফুল। কখনো কখনো ফুলে এই পাঁচটি অংশ ছাড়াও বৃত্তির নিচে একটি অতিরিক্ত অংশ থাকে। একে উপবৃত্তি বলে। জবা ফুলে এমন উপবৃত্তি দেখা যায়। আবার কোনো কোনো ফুলে বৃত্ত থাকে। এগুলো সবৃত্তক ফুল এবং যে ফুলগুলোয় বৃত্ত থাকে না সেগুলো অবৃত্তক ফুল।



চিত্র ৪.১ : একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ

ফুলের বিভিন্ন অংশ

বৃত্তি : ফুলের সবচেয়ে বাইরের স্তরককে বৃত্তি বলে। সাধারণত এরা সবুজ রঞ্জের হয়। বৃত্তি খণ্ডিত না হলে সেটি যুক্ত বৃত্তি, কিন্তু যখন এটি খণ্ডিত হয় তখন বিযুক্ত বৃত্তি বলে। এর প্রতি খণ্ডকে বৃত্যাখ্য বলে।

বৃত্তি ফুলের অন্য অংশগুলোকে বিশেষত ফুঁড়ি অবস্থায় রোদ, বৃক্তি ও পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করে।

দলমণ্ডল : এটি বাইরের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তরক। কতগুলো পাপড়ি মিলে দলমণ্ডল গঠন করে। এর প্রতিটি অংশকে পাপড়ি বা দলাংশ বলে। পাপড়িগুলো পরম্পরায় যুক্ত (যেমন-ধূতরা) অথবা পৃথক (যেমন-জবা) থাকতে পারে। এরা বিভিন্ন রঞ্জের হয়।

দলমণ্ডল রঞ্জিন হওয়ায় পোকা-মাকড় ও পশুপাখি আকর্ষণ করে এবং পরাগায়ন নিশ্চিত করে। এরা ফুলের অন্য অংশগুলোকে রোদ, বৃক্তি থেকে রক্ষা করে।

পুস্তবক বা পুৎকেশর : এটি ফুলের তৃতীয় স্তরক। এই স্তরকের প্রতিটি অংশকে পুৎকেশর বলে। পুৎকেশেরের দড়ের মতো অংশকে পুদ্দন এবং শীর্ষের থলির মতো অংশকে পরাগধানী বলে। পরাগধানীর মধ্যে পরাগরেণ্য উৎপন্ন হয়। পরাগরেণ্য থেকে পুঁজনকোষ উৎপন্ন হয়। এরা সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে।

স্ত্রীস্তবক বা গর্ভকেশর : এটি ফুলের চতুর্থ স্তরক। এক বা একাধিক গর্ভগত্র নিয়ে একটি স্ত্রীস্তবক গঠিত হয়। একের অধিক গর্ভগত্র সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে যুক্তগর্ভগত্রী, আর আলাদা থাকলে বিযুক্তগর্ভগত্রী বলে। একটি গর্ভগত্রের তিনটি অংশ, যথা- গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমূড়। গর্ভাশয়ের

কাজ : একটি জবা ও একটি ধূতরা ফুল সংগ্রহ কর এবং এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করে দেখাও।

ভিতরে ডিপক সাজানো থাকে। ডিপকে স্তৰী জননকোষ বা ডিহাই সৃষ্টি হয়। এরা পুস্তবকের মতো সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে।

বৃত্তি ও দলমণ্ডলকে ফুলের সাহায্যকারী স্তবক এবং পুস্তবক ও স্তৰীস্তবককে অত্যাবশ্যকীয় স্তবক বলে।

পুল্পমঞ্জরি

পুল্পমঞ্জরি তোমার সবাই দেখেছ। কাঠের শীর্ষমুকুল বা কাঞ্চিক মুকুল থেকে উৎপন্ন একটি শাখার ফুলগুলো বিশেষ একটি নিয়মে সাজানো থাকে। ফুলসহ এই শাখাকে পুল্পমঞ্জরি বলে। পরাগায়নের জন্য এর পুরুষ খুব বেশি। এ শাখার বৃদ্ধি অসীম হলে অনিয়ন্ত পুল্পমঞ্জরি ও বৃদ্ধি সসীম হলে তাকে নিয়ন্ত পুল্পমঞ্জরি বলে।

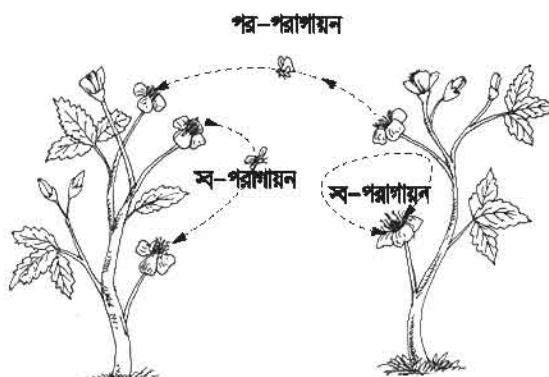
পাঠ ৫ ও ৬ : পরাগায়ন

পরাগায়নকে পরাগসংযোগও বলা হয়। পরাগায়ন ফল ও বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত। একটি ফুলের পুস্তবকের পরাগধানীতে তোমার আঙুলের ডগা ঘৰে দেখ। তোমার হাতে নিচরই হলুদ বা কমলা রঙের গুড়ো লেগেছে। এই গুড়ো বস্তুই পরাগরেণ্ড।

ফুলের পরাগধানী হতে পরাগরেণ্ড একই ফুলে অথবা একই জাতের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে। পরাগায়ন দু'প্রকার, যথা— স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন।

স্ব-পরাগায়ন : একই ফুল বা একই গাছের ভিন্ন দুটি ফুলের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটে তখন তাকে স্ব-পরাগায়ন বলে। সরিষা, কুমড়া, শুভুরা ইত্যাদি উচ্চিদে স্ব-পরাগায়ন ঘটে।

পর-পরাগায়ন : একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন উচ্চিদের ফুলের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটে তখন তাকে পর-পরাগায়ন বলে। শিমুল, শৈঁপে ইত্যাদি গাছের ফুলে পর-পরাগায়ন হতে দেখা যায়।



চিত্র ৪.২ : স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন

পরাগায়নের মাধ্যম : পরাগরেণ্ড স্থানান্তরের কাজটি

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো মাধ্যমের দ্বারা হয়ে থাকে। যে বাহক পরাগরেণ্ড বহন করে গর্ভমুণ্ড পর্যন্ত নিয়ে যায় তাকে পরাগায়নের মাধ্যম বলে।

বায়, পানি, কীট-পতঙ্গ, পাখি, বাদুড়, শামুক এমনকি মানুষ এ ধরনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। মধু খেতে অথবা সুস্পর রঙের আকর্ষণে পতঙ্গ বা পাখি ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়। এ সময়ে পরাগরেণ্ড বাহকের গায়ে লেগে যায়। এই বাহকটি যখন একই প্রজাতির অন্য ফুলে গিয়ে বসে তখন পরাগরেণ্ড এই ফুলের গর্ভমুণ্ডে লেগে যায়। এভাবে তাদের অভাসে পরাগায়নের কাজটি হয়ে যায়।

পরাগায়নের মাধ্যমগুলোর সাহায্য পেতে ফুলের গঠনে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। একে অভিযোজন বলা হয়। বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য অভিযোজনগুলোও আলাদা। অভিযোজনগুলো নিম্নরূপ :

পতঙ্গপরাগী ফুলের অভিযোজন : ফুল বড়, রঙিন, মখুঘাষিতুক্ত। পরাগরেণু ও গর্তমুড় আঠালো এবং সুগংথ্যবৃক্ত, যেমন— জবা, কুমড়া, সরিবা ইত্যাদি।

বাহুপরাগী ফুলের অভিযোজন : ফুল বর্ণ, গন্ধ ও মখুঘাষিতীন। পরাগরেণু হালকা, অসংখ্য ও আকারে ক্ষুদ্র। এদের গর্তমুড় আঠালো, শাখাবিত, কখনো পালকের ন্যায়, যেমন— ধান।

পালিপরাগী ফুলের অভিযোজন : এরা আকারে ক্ষুদ্র, হালকা এবং অসংখ্য। এরা সহজেই পানিতে ভাসতে পারে। এসব ফুলে সুগংথ নেই। স্ত্রীফুলের বৃক্ত লালা কিছু পৃঁ ফুলের বৃক্ত ছেট। পরিণত পৃঁ ফুল বৃক্ত থেকে ঝুলে পানিতে ভাসতে থাকে, যেমন— পাতাশ্যালো।

আলিপরাগী ফুলের অভিযোজন : এসব ফুল মোটামুটি বড় ধরনের হয়। তবে ছেট হলে ফুলগুলো পুশ্পমঞ্জরিতে সজ্জিত থাকে। এদের রং আকর্ষণীয় হয়। এসব ফুলে গন্ধ থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। যেমন— কদম, শিমুল, কচু ইত্যাদি।

পাঠ ৭ ও ৮ : নিষিক্তকরণ ও ফলের উৎপত্তি

জননকোষ (Gamete) সৃষ্টি নিষিক্তকরণের পূর্বশর্ত। একটি পৃঁ গ্যামেট অন্য একটি স্ত্রী-গ্যামেটের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিলিত হওয়াকে নিষিক্তকরণ বলে।



চিত্র-৪.৩ : নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া

পরাগায়নের ফলে পরাগরেণু গর্তমুড়ে স্থানান্তরিত হয়। এখান থেকে নিঃসৃত রস শুষে নিয়ে এটি ফুলে উঠে এবং এর আবরণ তেল করে একটি নালি বেরিয়ে আসে। এটি পরাগনালি। পরাগনালি গর্তদণ্ড তেল করে গর্তশয়ে ডিহাইকের কাছে গিয়ে পৌছে। ইতোমধ্যে এই পরাগনালিতে দুটি পৃঁ গ্যামেট সৃষ্টি হয়। ডিহাইকের

তিতৰ পৌছে এ নামিকা ফেটে যাব এবং পুঁ গ্যামেট দৃঢ়ি মৃত্যু হয়। ডিমকের তিতৰ ভূগর্ভস্থি থাকে। এর মধ্যে স্ত্রী গ্যামেট বা ডিমাশু উৎপন্ন হয়। পুঁ গ্যামেটের একটি এই স্ত্রী গ্যামেটের সঙ্গে মিলিত হয়। এভাবে নিষিদ্ধকরণ প্রক্রিয়া শেষ হয়। অন্য পুঁ গ্যামেটটি সোণ নিউক্লিওসের সাথে মিলিত হয় এবং সস্য উৎপন্ন করে।

কলের উৎপত্তি : আমজা কল বলতে সাধারণত আম, কাঠাম, শিকু, কলা, আকুল, আপেল, পেঁয়াজা, সহেলা ইত্যাদি সুস্থিত ফলগুলোকে বুঝি। এগুলো থেকে পেলে রাস্তা ছাড়াই খাওয়া বাব। শাট, কুমড়া, পিঙা, পটল ইত্যাদি সবজি হিসেবে খাওয়া হলেও অকৃতশক্ত এগুলো সবই কল। নিষিদ্ধকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলেই কল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নিষিদ্ধকরণ প্রক্রিয়া গর্ভাশয়ে যে উজ্জীবনার সূচি করে তার কাছে ধীরে ধীরে গর্ভাশয়টি কলে পরিণত হয়। এর ডিবকগুলো ধীরে মূল্যবান হয়। নিষিদ্ধকরণের পর গর্ভাশয় এককভাবে অথবা কুলের অন্যান্য অংশসহ পরিপূর্ণ হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে তাকে কল বলে।

শুধু গর্ভাশয় কলে পরিণত হলে তাকে অকৃত কল বলে, যেমন— আম, কাঠাম। গর্ভাশয় ছাড়া কুলের অন্যান্য অংশ পুরু হয়ে বখন কলে পরিণত হয় তখন তাকে অপ্রকৃত কল বলে, যেমন— আপেল, চালজা ইত্যাদি। অকৃত ও অপ্রকৃত কলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যাব, যেমন— সরল কল, পুরু কল ও ধৌপিক কল।

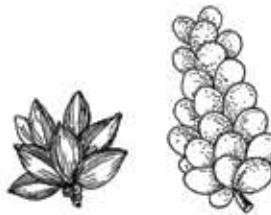
১) **সরল কল :** কুলের একটি মাত্র গর্ভাশয় থেকে যে কলের উৎপত্তি তাকে সরল কল বলে, যেমন— আম। এরা রসাল বা শুক হতে পারে। সরল কল দুই প্রকার।

রসাল কল : যে কলের কলকৃক পুরু এবং রসাল তাকে রসাল কল বলে। এ ধরনের কল পাকলে কলকৃক ফেটে যাব না। যেমন— আম, আম, কলা ইত্যাদি।

নীরস কল : যে কলের কলকৃক পাতলা এবং পরিপক্ষ হলে তুক শুকিয়ে ফেটে যাব তাকে নীরস কল বলে। যেমন— পিম, টেক্স, সরিষা ইত্যাদি।



চিত্র ৪.৪ : সরল কল



চিত্র ৪.৫ : পুরু কল



চিত্র ৪.৬ : ধৌপিক কল

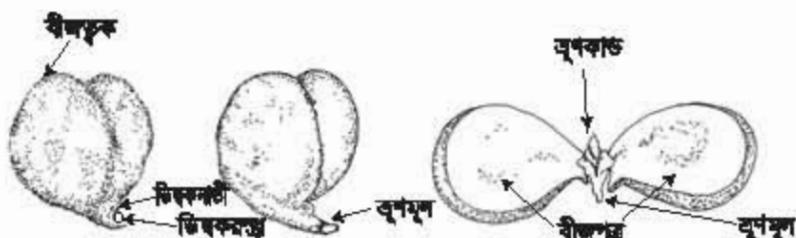
২) **পুরু কল :** একটি কুলে বখন অনেকগুলো গর্ভাশয় থাকে এবং প্রতিটি গর্ভাশয় কলে পরিণত হয়ে একটি বৈটির উপর পুরুকারে থাকে তখন তাকে পুরু কল বলে, যেমন— চম্পা, নরমতারা, আকদ, আতা, শরীফা ইত্যাদি।

৩) বৌপিক বল : একটি মালভিজ সম্পূর্ণ অল্প যথন একটি বলে পঞ্চিত হয় তখন তাকে বৌপিক বল বলে, যেমন- আলারস, কাঁঠাল।

কাজ : কয়েকটি বল সংজড় কর এবং এগুলো কী বয়নের বল তা খাবার দেখ।

পাঠ ৯ ও ১০ : বীজের গঠন ও অঙ্গুরোদগম

বীজের গঠন : একটি বাটির মধ্যে একটি ফিল্টার পেগার রেখে পানি দিয়ে ডিছিনে তার উপর ৮/১০টি তেজা হোলা বীজ ৩/৪ দিন দেকে রেখে দিলে এগুলো থেকে অঙ্গুর বের হবে। বীজের সূচালো অঙ্গের কাছে একটি ছিদ্র আছে, একে মাইক্রোপাইল বা ডিসকোন্ট্রা বলে। এর ডিতর দিয়ে দুধমূল বাইজে বেরিয়ে আসে। অঙ্গুর বের হওয়া বীজটিকে দুইআঙ্গুর দিয়ে সামান্য চাপ দিয়ে হোলা বীজের আকস্মাতি সরিয়ে ফেললে হলুদ রংতের একটি অল্প বের হবে, এটিকে আরও একটু চাপ দিলে পুরু বীজগুলো দুটি দুই দিকে খুলে যাবে। এ দুটো বেরান্দে শেলে আছে সেখানে সাদা ঝাঁকের একটি লশাটে অঙ্গ দেখা যাবে। এর নিচের দিকের অংশকে দুধমূল এবং উপরের অল্পকে ভূখকাণ্ড বলে।



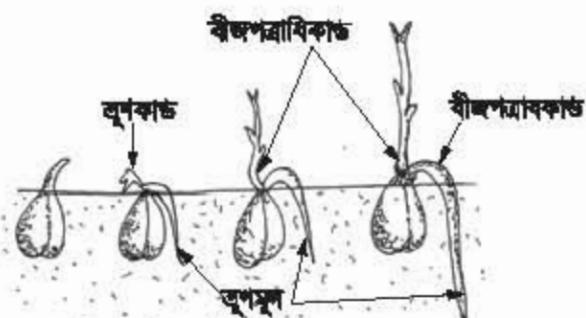
চিত্র ৪.৭ : একটি হোলা বীজের বিত্তিন্দু অল্প

দুধকাণ্ডের নিচের অংশকে বীজগ্রাহিকাণ্ড (এপিকোর্টাইল) ও দুধমূলের উপরের অংশকে বীজগ্রাবকাণ্ড (হাইপোকোর্টাইল) বলে। দুধমূল, দুধকাণ্ড ও বীজগ্রাবকাণ্ডে একত্রে দুধ এবং বাইজের আকরণটিকে বীজকুক বলে। বীজকুক দুর্ভৱিষিক। বাইজের অল্পকে টেস্টা এবং ডিতরের অল্পকে টেলমেল বলে।

কাজ : পরীক্ষার মাধ্যমে একটি মাটির বীজের বিত্তিন্দু অল্প প্রদর্শন কর।

অঙ্গুরোদগম : বীজ থেকে শিশু উচ্চিদে উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে অঙ্গুরোদগম বলে। বৰ্ধাবধতাবে অঙ্গুরোদগম হওয়ার জন্য পানি, তাপ ও অভিজ্ঞেন প্রয়োজন হয়। যথন দুধকাণ্ড মাটি তেস করে উপরে উঠে আসে কিন্তু বীজগ্রাব মাটির ডিতরে থেকে শার তখন তাকে মুদগত অঙ্গুরোদগম বলে, যেমন হোলা, ধান ইত্যাদি। কখনো বীজগ্রাব দুধমূল মাটি তেস করে উপরে উঠে আসে তখন তাকে মুদতেসী অঙ্গুরোদগম বলে। কুমড়া, অঞ্জী, টেঁচুল ইত্যাদি বীজে মুদতেসী অঙ্গুরোদগম দেখা যায়।

কর্ম-৬, বিজ্ঞান-অভ্যন্তরীণ



চিত্র ৪.৮ : মূলগত অঙ্গুরোদগম



চিত্র ৪.৯ : মূসতেসী অঙ্গুরোদগম

হোলা বীজের অঙ্গুরোদগম : একেতে মূলগত অঙ্গুরোদগম হয়। এ প্রকার অঙ্গুরোদগমে বীজপত্র দুটি মাটির নিচে রেখে ভূগকাণ্ঠ উপরে উঠে আসে। বীজ প্রাধিকাণ্ডের অভিস্থিত বৃত্তি এবং কারণ। হোলা বীজ একটি অসম্ভব ধিবীজপত্রী বীজ। মাটিতে হোলা বীজ বুনে পরিষিত পানি, তাপ ও বায়ুর ব্যবস্থা করলে সুই তিনি দিনের মধ্যে বীজ হতে অঙ্গুর ফোর হবে এবং মাটির উপরে উঠে আসবে। পানি পেষে বীজটি প্রথমে ফুলে উঠে এবং ডিবকরলেস্ট্র তিতির দিয়ে ভূগমূল বেরিয়ে আসে। এটি বীজে বীজে প্রথম মূল গরিষ্ঠত হয়। হিতীর ধাপে ভূগকাণ্ঠ মাটির উপরে উঠে আসে। একেতে বীজপত্র দুটি মাটির নিচে থেকে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় ভূগ তার খাদ্য বীজপত্র থেকে পেয়ে থাকে।

সহজ শব্দ: অয়োন ও ঘোন দাঙনন বা অনন, পরালয়েন্স, টিটিবার, ইলাজোম, কল, বুলবিল, প্যামেট, বীজপত্রাবিকাণ্ঠ, বীজপত্রাবকাণ্ঠ, টেলেমেন, টেস্টা

এ অব্যাহার পাঁচ শেবে বা শিখলাহ-

- প্রজনন প্রাণনত সুই ধরনের, যথা—অয়োন ও ঘোন।
- সুল উন্নত উল্লিদের অনন অল।
- একটি আসৰ্চ ফুলের পাঁচটি অল।
- ফল প্রাণনত তিনি ধরনের সরল, গুছ ও যৌগিক।
- অঙ্গুরোদগম সুই ধরনের, যথা—মূলগত ও মূসতেসী।

অনুশীলনী

শূল্যস্থান পূরণ কর

১. প্রজনন প্রথানত দুই রকম, _____ ও _____।
২. মখন একটি মাত্র গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় তখন তাকে _____ ফল বলে।
৩. যে ফলে _____ টি অংশ থাকে তাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে।
৪. পরাগায়ন দু'ধরনের _____ ও _____।
৫. একটি সম্পূর্ণ পুষ্পমঞ্জরি ফলে পরিণত হলে তাকে _____ ফল বলে।
৬. ডিস্ক পরিণত ফলের _____ পরিণত হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অবোন প্রজনন উচ্চিদের জন্য পুরুত্পূর্ণ কেন ?
২. আম গাছের কলম কেন করা হয় ?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

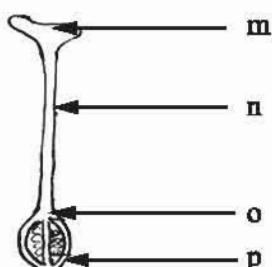
১. কোনটি গুচ্ছ ফল ?

- | | |
|----------|----------|
| ক. আম | খ. শরীফা |
| গ. কাঠাল | ঘ. আনারস |

২. পতঙ্গপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য কোনটি ?

- | | |
|------------------|------------------------------|
| ক. বর্ণহীন | খ. গুরুত্বহীন |
| গ. খুব হালকা হয় | ঘ. রঙিন ও মধুভাষিত্যুক্ত হয় |

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও



৩. চিত্রের কোন অংশটি পরাগারেণ ধারণ করে ?

- | | |
|------|------|
| ক. m | খ. o |
| গ. n | ঘ. p |

৪. চিত্রের P অংশটি—

- i. ফলে পরিণত হয়
- ii. বীজে পরিণত হয়
- iii. বংশবিস্তারে সাহায্য করে

নিচের কোনটি সঠিকঃ

ক. i ও ii

গ. ii ও iii

খ. i ও iii

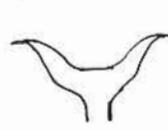
ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১.



M



N



O



P

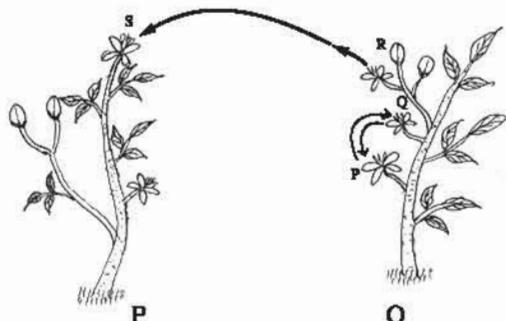
ক. প্রজনন কাকে বলে?

খ. পরাগায়ন বলতে কী বোঝায়?

গ. M, N, O, P অংশের সমন্বয়ে গঠিত উদ্ভিদ অঙ্গটির শস্ত্রছেদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

ঘ. M, O, P এর মধ্যে কোন দুটি অংশ উদ্ভিদের বংশবিস্তারে অধিক গুরুত্বপূর্ণ? মুক্তিসহ তুলে ধর।

২.



ক. অঙ্গাঙ প্রজনন কাকে বলে?

খ. অঙ্কুরোদগম বলতে কী বোঝায়?

গ. P ও Q ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে কোন পরাগায়নটি নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে? তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতান্বয় দাও।

নিচে কর

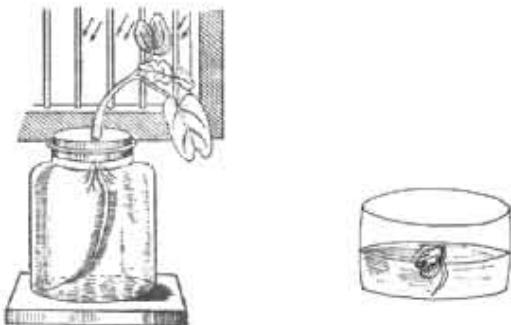
১. লাউ, কুমড়া, ধুতুরা, বেগুন, কলকে ফুল, জবা ও শিমের ফুল সংগ্রহ কর এবং দেখ কোন কোন ফুলে পাচাটি অংশ রয়েছে।

২. একটি তেঁতুল বীজ নিয়ে অঙ্কুরোদগমের পরীক্ষা কর এবং পরিবর্তনগুলো লিখে রাখ।

পঠনযোগ্য অধ্যায়

সমস্যার ও নিঃসরণ

জীবে সমস্যার একটি অঙ্গীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাণীর মতো উদ্ধিদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমস্যার গভোজন হয়। জীবের বৃদ্ধি, প্রজনন, বংশবিস্তার, অনুভূতিশৈলী ও প্রতিক্রিয়া সূচি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উদ্ধিদের এ কাজগুলো করার জন্য হয়মোনের পুরুষ অপরিসীম। একেছে প্রাণীর মতো উদ্ধিদের আলাদা কোনো ভৱ্য ধাকে না। নিম্নলিপি ব্যক্তিগত উচ্চশ্রেণির প্রাণীর দেহে বিভিন্ন জৈবিক কার্যাদি সম্মানের জন্য নির্মিত ভৱ্য ধাকে। দেহের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সহিতে সাধন এবং এদের কাজের মধ্যে সমস্যার সাধন করে উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে স্থায়ীভূত হয়।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- উদ্ধিদ ও মানুকের ক্ষেত্রে সমস্যার ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রবাহ চিকিৎসার সাহায্যে স্থায়ীভূতস্থার কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উদ্ধিদের উদ্দীপনামূলক ক্রিয়া উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মানুকের উদ্দীপনামূলক ক্রিয়া উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উদ্ধিদ ও প্রাণীর বর্জ্য নিঃসরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১-৩ : উদ্ধিদে সমস্যা

প্রতিটি উদ্ধিদকেরে বিভিন্ন পানীয়বৃক্ষীয় কার্যক্রম একটি নিয়ম স্বীকৃতায় মাধ্যমে সংযুক্ত হয়। এ কারণে সমস্যার উদ্ধিদের একটি অপরিহার্য কার্যক্রম। এ সমস্যার না থাকলে উদ্ধিদের জীবনে বিশুভ্রতা দেখা দেবে। একটি উদ্ধিদের জীবন চক্রের পর্যাপ্তগুলো বেমন—অভ্যন্তরোদগম, পুষ্পায়ন, ফস সূচি, বার্ষিক প্রাপ্তি, সুস্থাবস্থা ইত্যাদি একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম মেনে চলে। এ কাজে আবহাওয়া ও অল্পব্যাহুনিত প্রভাবকগুলোর পুরুষও লক্ষ করায় মতো। উদ্ধিদের বৃদ্ধি ও চলনসহ বিভিন্ন পানীয়বৃক্ষীয় কাজগুলো অভ্যন্তরীণভাবে বিশেষ নিয়ম মেনেই সম্ভব হয়। একটি কাজ অন্য কাজকে বাধা থালান করে না। বিভিন্ন কাজের সমস্যাসাধন কৌশলে হয় তা ছানতে বিজ্ঞানীরা চেক্ট করতে থাকেন এবং যত প্রকাশ করেন যে, উদ্ধিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ, বিভিন্ন অঙ্গ সূচি ইত্যাদি উদ্ধিদ দেরে উৎপাদিত বিশেষ কোনো জৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে হয়ে থাকে।

১০

উদ্ধিদের সকল কাজ নিরুত্সর্পকারী এই জৈব রাসায়নিক পদার্থটিকে কাইটোক্যামোল বা বৃদ্ধিকারক বস্তু

হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ফাইটোহরমোন কোষে উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্নিস্থল থেকে বাহিত হয়ে দূরবর্তী স্থানের কোষের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। উক্ষিদে যেসব হরমোন পাওয়া যায় তার মধ্যে অক্সিন, জিবেরেলিন ও সাইটোকাইনিন বৃক্ষি সহায়ক এবং অ্যাবসাইসিক এসিড ও ইথিলিন বৃক্ষি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। পাতায় ফ্লোরিজেন নামক হরমোন উৎপন্ন হয় এবং তা পত্রমূলে স্থানান্তরিত হয়ে পত্র মুকুলকে পুরুষমুকুলে পরিণত করে। তাই দেখা যায় ফ্লোরিজেন উক্ষিদে ফুল উৎপন্ন করে।

অক্সিন : চার্সেস ভারটাইন এ হরমোন প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি উক্ষিদের ভূগর্ভস্থাবরণীর উপর আলোর প্রভাব লক্ষ করেন। যখন আলো তীব্রকভাবে একদিকে শাগে তখন ভূগর্ভস্থাবরণী আলোর উৎসের দিকে বাঁকা হয়ে বৃক্ষি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ভূগর্ভস্থাবরণীর অঞ্চলগে অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থটি ছিল বৃক্ষি সহায়ক হরমোন অক্সিন। অক্সিন প্রয়োগে শাখা কলমে মূল গজায়, ফলের অকালে বারেপড়া গ্রোধ করে।

জিবেরেলিন : চারাগাছ, বীজগত ও পত্রের বর্ধিক্ষ অঞ্চলে এদের দেখা যায়। এর প্রভাবে উক্ষিদের পর্বমধ্যগুলো দৈর্ঘ্যে বৃক্ষি পায়। এ জন্য খাটো উক্ষিদে এ হরমোন প্রয়োগ করলে উক্ষিদটি অন্যান্য সাধারণ উক্ষিদ থেকেও অধিক লস্বা হয়। বীজের সুপ্তাবস্থা কাটাতে এর কার্যকারিতা রয়েছে।

ইথিলিন : এ হরমোনটি একটি গ্যাসীয় পদার্থ। এটি ফল পাকাতে সাহায্য করে। এ হরমোন ফল, ফুল, বীজ, পাতা ও মুগেও দেখা যায়। ইথিলিন বীজ এবং মুকুলের সুশাবস্থা ভঙ্গ করে, চারা গাছের কাণ্ডের বৃক্ষি ঘটিয়ে চারা গাছকে লম্বা হতে সাহায্য করে, ফুল এবং ফল সৃষ্টির সূচনা করে। ইথিলিন পাতা, ফুল এবং ফলের বারে পড়া ত্বরান্বিত করে।

চলন : উক্ষিদও অন্যান্য জীবের মতো অনুভূতি ক্ষমতাসম্মত। এজন্য অভ্যন্তরীণ বা বিহিষ্টউদ্বীপক উক্ষিদেহে যে উদ্বীপনা সৃষ্টি করে তার ফলে উক্ষিদে চলন ও বৃক্ষি সংঘটিত হয়। এসব চলনকে ট্রফিক চলন বলা হয়।

আলোর প্রতি উক্ষিদের সাড়া দেওয়ার পরীক্ষণ

উপকরণ : একটি স্বচ্ছ কাচের বড় মুখযুক্ত বোতল, পুর্ণ দ্রবণ, ছিদ্রযুক্ত কর্ক, একটি সবল উক্ষিদের চারা

কার্যপদ্ধতি : একটি বোতলে পুর্ণ দ্রবণ নিয়ে ছিদ্রযুক্ত ছিপিটি লাগিয়ে

ছিপির ছিদ্রপথে চারাগাছটি এমনভাবে ঢুকিয়ে দিতে হবে যাতে মুলগুলো

পুর্ণ দ্রবণে ঢুবে থাকে। এবার গাছসহ বোতলটি জানালার কাছে

আলোকিত স্থানে রেখে দেই।

পর্যবেক্ষণ : ৪/৫ দিন পর দেখা যাবে যে উক্ষিদটির কাণ্ডের অংশ

জানালার বাইরের দিকে বেঁকে গেছে। মুলগুলো আলোক উৎসের বিপরীত

দিকে বেঁকে রয়েছে।

সিদ্ধান্ত : এ পরীক্ষণে প্রমাণিত হয় যে কাণ্ডে আলোকমুখী ও মূলে চি. ৫.১ : উক্ষিদের আলোকমুখিতার পরীক্ষণ
আলোকবিমুখী বৃক্ষি ও চলন ঘটে।



কাজ : শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে অভিকর্ষ উদ্দিদের বৃক্ষকে প্রভাবিত করে তা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাও।

হরমোনের ব্যবহার : অঙ্গিন ও অন্যান্য কৃত্রিম হরমোন শাখাকলামের মূল উৎপাদনে সাহায্য করে। ইডেল অ্যাসেটিক এসিড ক্ষতস্থান পুরণে সাহায্য করে। অঙ্গিন প্রয়োগে ফলের মোচন বিস্তৃত হয়। বিভিন্ন উদ্দীপক, যেমন আলো, পানি, অভিকর্ষ ইত্যাদি উদ্দিদের বৃক্ষকে প্রভাবিত করে।

পাঠ ৪ ও ৫ : স্নায়ু তন্ত্র

তোমরা ষষ্ঠি শ্রেণিতে শ্রেণিবিন্যাস থেকে এককোষী ও বহুকোষী জীবের বৈশিষ্ট্য জেনেছ। বহুকোষী জীবের দেহে চিস্য, অঙ্গ ও তন্ত্র ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন গঠন পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে অগণিত কোষের বিচিত্র কর্মকাণ্ড। এই কর্মকাণ্ডের সাথে যোগসূত্র রচনা করা এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য জীবদেহে মূল যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। যেমন— কারো দুঃখে তোমার কান্না পায়, কারো খুশিতে তুমি খুশি হও, পরীক্ষার ভালো ফল করলে তোমার আনন্দ হয়। এই কাঙ্গালো ঘটে বিভিন্ন উদ্দীপকের কার্যকারিভাবে ফলে। দেহের বিভিন্ন অংশের উদ্দীপনা বহন করা, দেহের বিভিন্ন অংশের কাজের সমন্বয় সাধন করা ও পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রাখা স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ। প্রাণিদেহের যে তন্ত্র দেহের বিভিন্ন অংশের সংযোগ রক্ষা করে, বিভিন্ন জৈবিক কার্যকৰীর সমন্বয় সাধন করে এবং উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে উপসূক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করার মাধ্যমে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশ হলো মস্তিষ্ক। উন্নত মস্তিষ্কের কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পরিগণিত হয়। মস্তিষ্ক অসংখ্য বিশেষ কোষ দ্বারা গঠিত। এরা নিউরন বা স্নায়ুকোষ নামে পরিচিত।

স্নায়ুকোষ বা নিউরন

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যকৰী একককে স্নায়ুকোষ বা নিউরন বলে। নিউরন মানবদেহের দীর্ঘতম কোষ। নিউরন দুইটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা—

১. কোষদেহ এবং ২. প্রস্তুতি অংশ।

১. কোষদেহ : কোষদেহ নিউরনের প্রধান অংশ। কোষদেহ বিভিন্ন আকৃতির হয়।

যেমন— গোলাকার, ডিম্বাকার বা নক্ষত্রাকার। কোষদেহ কোষ আবরণী, সাইটোপ্লাজম ও নিউরিয়াস দ্বারা গঠিত। এই কোষে সেন্ট্রুল থাকে না।

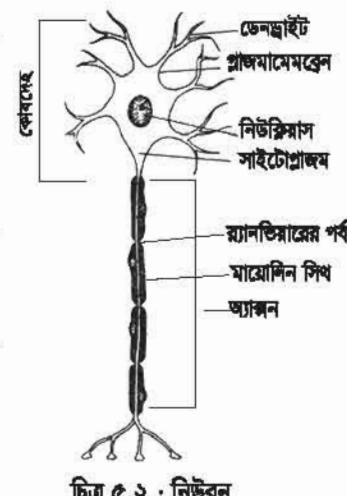
তাই এরা অন্যান্য কোষের মতো বিভাজিত হয় না।

২. প্রস্তুতি অংশ : কোষদেহ থেকে উৎপন্ন শাখা-প্রশাখাকে প্রস্তুতি অংশ বলে। প্রস্তুতি অংশ দুই প্রকার। যথা— ক) অ্যাক্সন এবং খ) ডেনড্রন।

ক) অ্যাক্সন : কোষদেহ থেকে উৎপন্ন অস্থা সূতার মতো অংশকে অ্যাক্সন বলে।

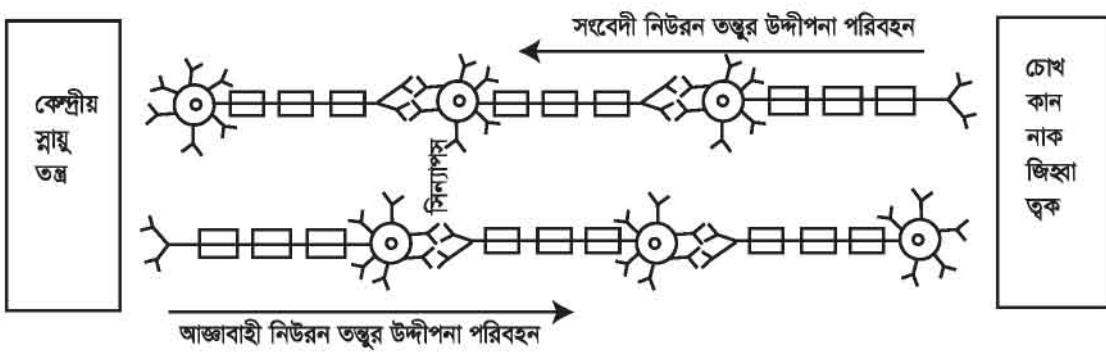
অ্যাক্সনের যে প্রান্তে কোষদেহ থাকে তার বিপরীত প্রান্ত থেকে শাখা বের হয়। অ্যাক্সন সাধারণত একটি নিউরনে একটি মাত্র অ্যাক্সন থাকে।

খ) ডেনড্রন : কোষদেহের চারদিক থেকে উৎপন্ন শাখাগুলোকে ডেনড্রন বলে। এগুলো বেশি অস্থা হয় না। ডেনড্রন থেকে সৃষ্টি শাখাগুলোকে ডেনড্রাইট বলে। এদের দ্বারা স্নায়ুতন্ত্র নিউরনের দেহের দিকে



চিত্র ৫.২ : নিউরন

পরিবাহিত হয়। একটি স্নায়ুকোষের অ্যাঙ্গন অন্য একটি স্নায়ুকোষের ডেনড্রাইটের সাথে মিলিত হওয়ার স্থানকে সিন্যাপস বলে। সিন্যাপসের মাধ্যমেই স্নায়ুতাড়না এক স্নায়ুকোষ থেকে অন্য স্নায়ুকোষে পরিবাহিত হয়। উদ্বীপনা বহন করা, প্রাণিদেহের ভিতরের ও বাইরের পরিবেশের সাথে সংযোগ রক্ষা করা, প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করা, মস্তিষ্কে অ্যুতিধারণ করা, চিন্তা করা ও বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দেওয়া ও পরিচালনা করা নিউরনের কাজ। নিউরনের উদ্বীপনা বহন প্রক্রিয়া নিচের চিত্রে দেখানো হলো।



চিত্র ৫.৩ : স্নায়ুতন্ত্রের উদ্বীপনা বহনের প্রবাহ চিত্র

স্নায়ুতন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— ১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ২. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র ৩. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র।

পাঠ ৬ ও ৭ : মস্তিষ্ক

১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ হলো মস্তিষ্ক ও মেরুরঞ্জু।

মস্তিষ্ক হলো সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের চালক। মানুষের মস্তিষ্ক করোটির মধ্যে সূরক্ষিত। মস্তিষ্ক মেনিনজেস নামক পর্দা দ্বারা আবৃত। মানুষের মস্তিষ্কের প্রধান অংশ তিনটি। যথা— (ক) গুরুমস্তিষ্ক (খ) মধ্যমস্তিষ্ক (গ) পচাঃ বা লঘুমস্তিষ্ক।

(ক) গুরুমস্তিষ্ক : মস্তিষ্কের প্রধান অংশ হলো গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম। এটা ডান ও বাম খাঁড়ে বিভক্ত। এদের ডান ও বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার বলে। মানব মস্তিষ্কে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার অধিকতর উন্নত ও সুগঠিত। এই দুইখন্ড ঘনিষ্ঠভাবে স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা সংযুক্ত। এর উপরিভাগ ঢেউ তোলা ও ধূসর বর্ণের। দেখতে ধূসর বর্ণের হওয়ায় একে ধূসর পদার্থ বা প্রে ম্যাটার বলে। গুরুমস্তিষ্কের অন্তঃস্তরে কেবলমাত্র স্নায়ুতন্ত্র থাকে। স্নায়ুতন্ত্রের রং সাদা। তাই মস্তিষ্কের ভিতরের স্তরের নাম শ্বেত পদার্থ বা হোয়াইট ম্যাটার। শ্বেত পদার্থের ভিতর দিয়ে স্নায়ুতন্ত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। ধূসর পদার্থের কয়েকটি স্তরে বিশেষ আকারে স্নায়ুকোষ দেখা যায়। এই স্নায়ুকোষগুলো গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে গুচ্ছ বৈধে স্নায়ুকেন্দ্র সৃষ্টি করে। এগুলো বিশেষ বিশেষ কর্মকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। দর্শন, শ্ববণ, ঘ্রাণ, চিন্তা- চেতনা, অৃতি, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও পেশি চালনার ক্রিয়াকেন্দ্র গুরুমস্তিষ্কে অবস্থিত।

সেরিব্রামের নিচের অংশ হলো— থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস। এগুলো ধূসর পদার্থের পুঁজি। ক্রোধ, লজ্জা, গরম, শীত, নিদ্রা, তাপ সংরক্ষণ ও চলন এই অংশের কাজ।

(৬) মধ্যমস্তিষ্ঠক : গুরুমস্তিষ্ঠক ও পনস-এর মাঝখানে মধ্যমস্তিষ্ঠক অবস্থিত। মধ্যমস্তিষ্ঠক দৃক্ষিণি, শ্রবণশক্তির সাথেও সম্পর্কস্ফূর্ত।

(৭) পঞ্চাং বা লম্বুমস্তিষ্ঠক : লম্বুমস্তিষ্ঠক গুরুমস্তিষ্ঠকের নিচে ও পচাতে অবস্থিত। এটা গুরুমস্তিষ্ঠকের চেয়ে আকারে ছোট। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা পঞ্চাং বা লম্বুমস্তিষ্ঠকের প্রধান কাজ। এছাড়া লম্বুমস্তিষ্ঠক কোথা কোথা ও চলাকেরা নিরন্তর করে। এর তিনটি অংশ-

সেরিবেলাম : পনসের বিশেষতদিকে অবস্থিত পঞ্চাংটি হলো সেরিবেলাম। এটা অনেকটা বৃলত অবস্থায় থাকে। সেরিবেলাম ভান ও বায় দৃঢ়ত্বে বিস্তৃত।

পনস : পনস লম্বুমস্তিষ্ঠকের সামনে ও নিচে অবস্থিত। একে মস্তিষ্ঠকের বোকাক বলা হয়। এটা গুরুমস্তিষ্ঠক, লম্বুমস্তিষ্ঠক ও মধ্যমস্তিষ্ঠককে সুযোগীর্বকের সাথে সংযোজিত করে।

মেঘলা বা সুযোগীর্বক : এটা মস্তিষ্ঠকের নিচের অংশ। সুযোগীর্বক পনসের নিম্নভাগ থেকে মেঘলাকে উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ এটা মস্তিষ্ঠককে মেঘলাকে সাথে সংযোজিত করে। এ অন্য সুযোগীর্বকে মস্তিষ্ঠকের বৌটা বলা হয়। মস্তিষ্ঠকের এ অংশ হত্যাকাণ্ড, খাদ্যাহৃৎ ও শুসন ইত্যাদি কাজ নিরন্তর করে।



চিত্র ৫.৪ : মস্তিষ্ঠকের পঁত

কাজ : চার্ট সেখে মস্তিষ্ঠকের চিত্র আঁক। এর কোন অংশ কী কাজ করে তা চিত্রের চিহ্নিত অংশের পাশে লেখ।

পাঠ ৮-১০ : মেঘলাক

মেঘলাকের মধ্যে মেঘলাক, সজাকিত থাকে। মেঘলাক ধূসর পদার্থ থাকে তিতারে এবং হেতু পদার্থ থাকে বাইজে অর্থাৎ মস্তিষ্ঠকের ফেন্টা। মেঘলাক হেতু পদার্থের তিতার দিয়ে আজাবাহী এবং অনুভূতিবাহী মাঝেভূত বাতাবাত করে।

প্রতিবর্ত চক্র

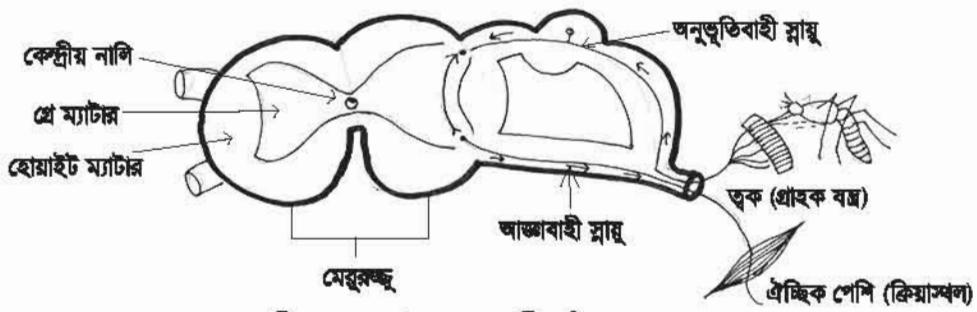
তোমার হাতে যশা বসলে দূষি কী করবে? অবশ্যই যশাটাকে যারতে ঢেক্টা করবে। তোমার হাতে যশা বসেছে দূষি কীভাবে টের পেলে? দূষি যশার কামড় অনুভব করেছ, তাই দূষি ধূমটি করেছ। দূষি যশার কামড় অনুভব করেছে মাঝে উদ্বীপনার অন্য।

মাঝে কিছী যা উজ্জীবনায় সাফ্তা দেওয়াও তাই। আরম্ভাতে আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আলো প্রতিফলিত হয়, প্রতিবর্ত কিয়াও করকটা ভেবনি।



চিত্র ৫.৫ : মানবদেহের মাঝেভূত

প্রতিবর্ত কিয়া ঘটে স্নায়ুর তাড়নার তাংকশিক কার্যকারিতার ফলে। স্নায়ুতাড়না কী? স্নায়ুর ভিতর দিয়ে যে সংবাদ বা অনুভূতি প্রবাহিত হয় তাকে স্নায়ু তাড়না বলে। আমরা যেমন হাতে মশা কামড় দিলে মশা তাড়িয়ে দেই অথবা হাতে বা পায়ে পিন ফুটলে আমরা নিমিষে তা সরিয়ে নেই। এটা কীভাবে ঘটে? হাতের উপর মশা বসলে স্নায়ুর গ্রাহক প্রান্তের উদ্দীপক হলো মশা, এর উপরিতি অনুভূত করার সঙ্গে সঙ্গে কোষ প্রান্তের সাড়া জাগে। আমরা মশাটিকে তাড়িয়ে দেই অথবা যেরে ফেলি। এ সকল কিয়া বেন অজ্ঞাতসারে আপনা আপনি হয়ে থাকে। এরূপ যে কিয়া অনুভূতির উভেজনা দ্বারা উৎপন্ন হয়, মিস্তিক দ্বারা চালিত হয় না তাকেই প্রতিবর্ত কিয়া বলে। প্রতিটি প্রতিবর্ত চক্রের পাঁচটি অংশ থাকে। যথা— ১) গ্রাহক অংশ ২) অনুভূতিবাহী স্নায়ু ৩) প্রতিবর্ত কেন্দ্র ৪) আজ্ঞাবাহী স্নায়ু এবং ৫) সাড়া প্রদানকারী অংশ। তাংকশিক আত্মরক্ষার জন্য কোনো অংশের তড়িৎক্রিয়ার নাম প্রতিবর্ত কিয়া। উদাহরণ— ১) আগুনে হাত শাগা বা পিনে হাত ফোটা মাঝে টেনে নেওয়া। ২) চোখে প্রথর আলো পড়ামাত্র চোখের পাতা ক্ষম্ব হয়ে যাওয়া।



চিত্র ৫.৬ : মানবদেহের প্রতিবর্ত চক্র

ব্যাখ্যা : হাতের চামড়ায় পিন ফোটামাত্র অনুভূতিবাহী স্নায়ুত্বস্তু পিন ফোটার যন্ত্রণা গ্রহণ করে। এই যন্ত্রণাদায়ক তাড়না অনুভূতিবাহী স্নায়ুত্বস্তুর মাধ্যমে মেরুরক্তে পৌছে। এই একই তাড়না অনুভূতিবাহী স্নায়ুকোষ থেকে আজ্ঞাবাহী স্নায়ুতে প্রবাহিত হয়। স্নায়ুতাড়না আজ্ঞাবাহী কোষে পৌছামাত্র পেশিতে প্রেরণ করে। ফলে পেশি সংকুচিত হয় এবং যন্ত্রণার উৎস থেকে হাত সরিয়ে দেয়।

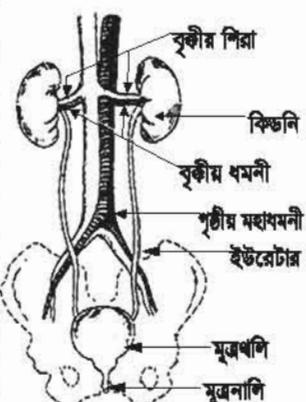
এখানে অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়াকে সহজ করে বর্ণনা করা হলো। আসলে পিন ফুটানোর সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু অনুভূতিবাহী স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এ উদ্দীপনা অনেকস্থলো পরস্পর সংযুক্ত স্নায়ুকোষের মাধ্যমে অনেকস্থলো আজ্ঞাবাহী কোষে প্রবাহিত হয়। এসব আজ্ঞাবাহী স্নায়ু পেশিতে উদ্দীপনা বহন করে হাত সরিয়ে আনে। অনুভূতি মিস্তিষ্কেও পৌছায়। ফলে কী ঘটছে শরীর তা জানতে পারে।

প্রতিবর্ত কিয়া একটি সমন্বিত কার্যক্রম। প্রতিবর্ত কিয়ায় যে পাঁচটি অংশ কাজ করে এদের যেকোনো একটির অভাবে কাজটি সঠিকভাবে হতে পারে না।

কাজ : তোমার হাতে পিন ফুটলে অথবা হারিকেনের গরম চিমলির উপর তোমার হাত পড়লে ভূমি কী করবে? কেন করবে? কীভাবে করবে? তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ১১ ও ১২ : ৱেচনতন্ত্র

আমরা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ি। অতি গরমে গা ঘামে। এগুলো ৱেচন পদার্থ। অর্থাৎ ৱেচন পদার্থ হলো সেইসব পদার্থ যেগুলো দেহের জন্য ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয়। ৱেচন ক্ষতে দেহের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে বোঝায়। বিপাকের ফলে পানি, কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইটরিয়া প্রভৃতি দূষিত পদার্থ দেহে প্রস্তুত হয়। এগুলো নিয়মিত ত্যাগ না করলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এইসব দূষিত পদার্থ দেহের মধ্যে জমে বিবর্তিয়া দেখা দেয় এবং এর ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। এ সকল বর্জ্য পদার্থ প্রধানত নিঃশ্বাস বায়, ঘাম এবং মুক্ত্রের সাথে দেহের বাইরে চলে যায়। ফুসফুস, চর্ম ও বৃক্ত এই তিনটি ৱেচন অঙ্গ। কার্বন ডাইঅক্সাইড ফুসফুসের মাধ্যমে এবং লবণ জাতীয় ক্ষতিকর পদার্থ চর্মের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। বৃক্তের মাধ্যমে দেহের নাইট্রোজেনযুক্ত তরল, দূষিত পদার্থ পরিত্যক্ত হয়। মুক্ত্রের মাধ্যমেই দেহের শতকরা আপি ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ পরিত্যক্ত হয়। তাই বৃক্তই প্রধানত ৱেচন অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। যে তন্ত্র ৱেচন কার্য্যে সাহায্য করে তাকে ৱেচনতন্ত্র বলে।



চিত্র ৫.৭ : ৱেচনতন্ত্র

কাজ : নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ: টেস্টটিউব, কাচ বা প্লাস্টিকের নল, চুনের পানি

পর্যবেক্ষণ : একটি টেস্টটিউবের ডিতর কিছুটা স্বচ্ছ চুনের পানি নাও। এবার টেস্টটিউবটির মধ্যে কাচ বা প্লাস্টিকের নল প্রবেশ করাও এবং নলটিতে ফুঁ দাও। কী হয় লক্ষ কর? কিছুক্ষণ ফুঁ দেওয়ার পর দেখবে চুনের পানি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হলো?

আমরা জানি, কার্বন ডাইঅক্সাইড চুনের পানিকে ঘোলা করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নিঃশ্বাসের বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে।

অর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। কিন্তু বেশি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বিষাক্ত বা দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। শ্বসন ক্রিয়ার সময় আমাদের দেহকোষ বর্জ্য হিসেবে এই গ্যাস তৈরি করে। কোষ থেকে রক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড বহন করে ফুসফুসে নিয়ে যায়। নিঃশ্বাসের বায়ুতে শতকরা ৪ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে। নিঃশ্বাসের বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে জলীয় বাস্তু থাকে।

কাজ : নিঃশ্বাস বায়ুতে জলীয় বাস্তুর উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : এক খন্ড কাচ বা আয়না

পর্যবেক্ষণ : শীতের সকালে একখন্ড কাচ বা আয়নার উপর মুখ দিয়ে (নাক দিয়ে নয়) নিঃশ্বাস ছাড়। কাচের উপর কী দেখতে পাইছ? নিঃশ্বাসের বায়ুর সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয়বাস্তু বের হয়। জলীয়বাস্তু ঠাণ্ডা কাচে জলীয় কণার সূক্ষ্ম করে ফলে আয়না বা কাচখন্ডটিকে ঘোলাটে ও কিছুটা অস্বচ্ছ দেখায়। কিছুক্ষণ পর আয়না থেকে জলীয় কণা উবে যায়। আয়নাটি আবার স্বচ্ছ দেখায়।

এ থেকে আমরা দেখতে পাইছি নিঃশ্বাস বায়ুতে জলীয়বাস্তু থাকে।

ষর্ম বা ঘাম

মানবদেহের বহিরাবরণ চর্ম বা ত্বক। ত্বকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এগুলো হলো লোমকৃপ। এই সকল লোমকৃপ দিয়ে ঘাম বের হয়। এই ঘামে সাধারণত পানির সাথে লবণ ও সামান্য কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে।

মৃত্র

বৃককে মৃত্র তৈরির কারখানা হিসেবে অভিহিত করা হয়। দেহের পেছনের দিকে মেরুদণ্ডের দুই পাশে দুইটি বৃক থাকে। বৃক ছাঁকনির মতো কাজ করে। যকৃৎ আমাদের দেহের অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিডকে তেজো ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ তৈরি করে। এগুলো দেহের জন্য ক্ষতিকর। বৃক রন্ত থেকে ক্ষতিকর পদার্থ ছেকে নেয়। এই ক্ষতিকর পদার্থসমূহ পানির সাথে মিশে হালকা হলুদ বর্ণের মৃত্র তৈরি করে এবং ইউরেটারের মাধ্যমে মৃত্র খলিতে জমা হয়। নির্দিষ্ট সময় পর মৃত্রের বেগ অনুভূত হয়। মলঢারের মতো মৃত্রথলির দ্বারেও সংকোচন ও প্রসারণ পেশি থাকে। একে মৃত্রপথ বলে। প্রয়োজনে পেশি সংকোচন ও প্রসারণের ফলে দেহ থেকে মৃত্র নির্গত হয়।

নতুন শব্দ : অঙ্গিন, হরমোন, জিরেরেলিন, ইথিলিন, সাইটোকাইনিন, নিউরন, অ্যাঙ্গন, ডেনড্রন, ডেনড্রাইট, সিন্যাপস, গুরুমস্তিষ্ক, ধূসর পদার্থ, খেত পদার্থ, পন্স, মেডুলা, প্রলম্বিত অংশ, আজ্ঞাবাহী স্নায়ু, অনুভূতিবাহী স্নায়ু, প্রতিবর্ত চক্র, প্রতিবর্ত ক্রিয়া

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম—

- নিউরনে সেন্ট্রিগুল থাকে না।
- নিউরনের গঠন দেহকোষের চেয়ে ভিন্ন।
- পরপর দুইটি নিউরনের প্রথমটার অ্যাঙ্গন ও পরেরটার ডেনড্রাইটের মধ্যে একটি স্নায়ুসন্ধি থাকে। একে সিন্যাপস বলে। সিন্যাপসের মধ্য দিয়েই একটি নিউরন থেকে স্নায়ু উদ্বিপনা পরবর্তী নিউরনে প্রবাহিত হয়।
- গুরু মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থের মধ্যে কয়েকটি স্তরে সাজানো বিশেষ স্নায়ুকোষ দেখা যায়। এই কোষগুলো গুরু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে স্থানে স্থানে গুচ্ছ বৈধে স্নায়ুকেন্দ্র সৃষ্টি করে।
- মেরুরঞ্জুর ভিতরে থাকে ধূসর পদার্থ আর বাইরে থাকে খেত পদার্থ।
- হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, ক্ষরণকারী গ্রন্থি ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হরমোনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
২. অঙ্গিন ও জিবেরেলিনের কাজ উল্লেখ কর।
৩. প্রতিবর্ত কিয়া ব্যাখ্যা কর।
৪. বৃক্ষের কাজ বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি উদ্দিদের ফুল ফোটাতে সাহায্য করে?

ক. জিবেরেলিন	খ. সাইটোকাইনিন
গ. ফ্লোরিজেন	ঘ. অঙ্গিন
২. নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য নিষ্কাশনে মানবদেহের কোন অঙ্গটি প্রধান ভূমিকা রাখে?

ক. বৃক্ষ	খ. ত্বক
গ. নাক	ঘ. পায়ু

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ও ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

প্রমার কক্ষে জানালার কাছে টবের মধ্যে লাগানো মানিপ্ল্যান্ট গাছটি দ্রুত বাড়ায় এর লতাগুলো জানালার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রমা হাত দিয়ে এগুলোকে কক্ষের ভিতর দিকে এনে দিলেও এরা আবার জানালার দিকেই ধাবিত হয়।

৩. প্রমার গাছটি কী কারণে জানালার দিকে ধাবিত হয়?

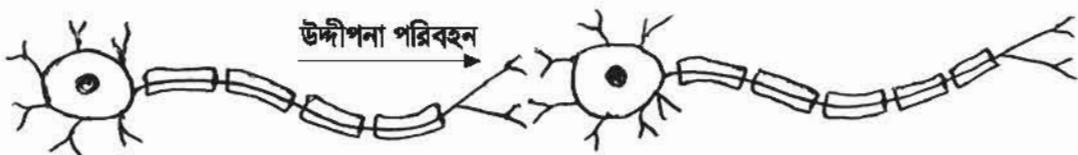
ক. বাতাস	খ. জলীয়বাস্তু
গ. আলো	ঘ. তাপ
৪. প্রমার মানিপ্ল্যান্ট গাছটির বৃদ্ধিতে সাহায্য করে-
 - i. জিবেরেলিন
 - ii. অঙ্গিন
 - iii. ইথিলিন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|----------------|----------------|
| ১. ক. i | খ. i ও iii |
| ২. গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রপ্তু

১.



- ক. হরমোন কী?
- খ. উদ্বিদে অঙ্গিনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
- গ. মানুষের প্রয়োগিক উপরের কোষটির অবস্থান ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মানবদেহে উদ্বিগ্ন পরিবহনে উপরের কোষের পুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২. অপু খুব মনোযোগ দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের একক আৰুচিল। এমন সময় পেছন থেকে তার বোন কান্তা পিঠে ঝোঁচা দিল। অপু পিছনে না তাকিয়েই তৎক্ষণাতে কান্তার হাত ধরে ফেলল। অপু তখন কান্তাকে বলল যে, তার হাত ধরতে পারার সাথে তার অঙ্গনের বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে।

- ক. মানবদেহের প্রধান রেচন অঙ্গ কী?
- খ. ট্রফিক চলন বলতে কী বোঝায়?
- গ. অপু যা আৰুচিল তার গঠন বর্ণনা কর।
- ঘ. কান্তার হাত ধরতে পারার সাথে অপুর দেহের স্নায়ুবিক প্রক্রিয়াটি কীভাবে জড়িত বিশ্লেষণ কর।

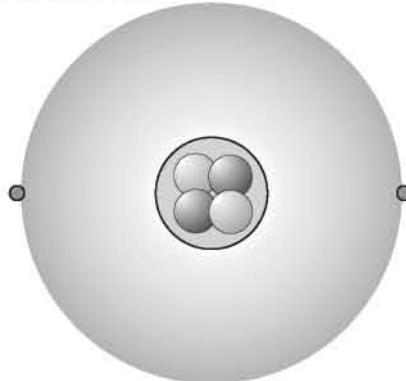
নিজেরা কর

১. তোমার চোখের পাতার উপর তীব্র আলো পড়লে তুমি চোখ বন্ধ করে ফেল কেন? কারণটি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা কর।
২. তোমরা একটি পাতাবাহার গাছের আগা কেটে দাও। এবার কয়েক দিন ধরে পর্যবেক্ষণ কর। কী ঘটে এবং কেন ঘটে তা ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরমাণুর গঠন

পরমাণু খুব ক্ষুদ্র কণা। তাই এর গঠন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সহজ নয়। তবে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরমাণুর গঠন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেছে। পরমাণুতে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার ভিন্নতার কারণে পরমাণুর ধর্মে পার্থক্য দেখা যায়।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আইসোটোপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আয়ন কীভাবে সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের পার্থক্য করতে পারব;
- অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন ব্যবহার করে রাসায়নিক সংকেত প্রয়ন করতে পারব;
- আইসোটোপের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব;
- আমাদের জীবনে আইসোটোপের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ ১-৩ : পরমাণুর ধারণার বিকাশ ও গঠন

তোমরা জেনেছ যে, পদার্থ ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। এ ক্ষুদ্র কণা দুই রকমের- অণু ও পরমাণু। পরমাণু ক্ষুদ্রতম কণা। একের অধিক পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। ক্ষুদ্রতম কণার বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ নানা রকম মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস প্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে সর্বপ্রথম পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা নিয়ে মতবাদ পোষণ করেন। তার মতে সকল পদার্থই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য (যা আর ভাঙ্গা যায় না) কণা দ্বারা গঠিত। তিনি এই ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেন পরমাণু বা এটম। এটম কথাটি তিনি নিয়েছিলেন গ্রীক শব্দ এটোমোস (Atomos) থেকে যার অর্থ হলো অবিভাজ্য। তার সমসাময়িক সময়ের আরও দুজন দার্শনিক প্লেটো (Plato) এবং অ্যারিস্টটল (Aristotle) তার মতবাদের সাথে দ্বিতীয় পোষণ করেন। অ্যারিস্টটলের মতে পদার্থসমূহ নিরবচ্ছিন্ন (Continuous), একে যতই ভাঙ্গা হোক না কেন, পদার্থের কণাগুলো ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে থাকবে।

১৮০৩ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন (John Dalton) পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে পদাৰ্থের ক্ষুদ্রতম কণা সম্পর্কে বলেন—

পৰমাণু হলো মৌলিক পদাৰ্থের ক্ষুদ্রতম কণা এবং একে আৱ ভাজা যায় না। ডাল্টনেৱ এ মতবাদ সকলে গ্ৰহণ কৰে। ফলে অ্যারিস্টটলেৱ মতবাদটি পৱিত্যক্ত হয়।

আসলে পৰমাণু অবিভাজ্য নয় বা ক্ষুদ্রতম কণিকাও নয়। পৰমাণু বিভাজ্য। এৱা ইলেকট্ৰন, প্ৰোটন ও নিউট্ৰন দ্বাৱা গঠিত।

ডাল্টনেৱ পৰমাণুবাদেৱ এই সীমাবদ্ধতা দূৰ কৱাৱ জন্য পৰবৰ্তীতে আৱও অনেকে পৰমাণু মডেলেৱ প্ৰস্তাৱ কৰেন। এদেৱ মধ্যে রাদারফোৰ্ড ও বোৱেৱ পৰমাণু মডেল গ্ৰহণযোগ্যতা পায়।

একসময় বিজ্ঞানী রাদারফোৰ্ড ও তাঁৰ সহকৰ্মীৱা একটি পৰীক্ষা কৰেন যা পৰমাণুৰ গঠন সম্পর্কে ভালো ধাৰণা দেয়। পৰীক্ষালব্ধ ফল থেকে রাদারফোৰ্ড বলেন যে, পৰমাণুতে ধনাত্মক আধান ও ভৱ একটি ক্ষুদ্ৰ জায়গায় আবদ্ধ। তিনি এৱা নাম দেন নিউক্লিয়াস। তিনি আৱও ব্যাখ্যা দেন যে, পৰমাণুৰ বেশিৱভাগ জায়গা ফাঁকা, আৱ খণ্টাত্মক আধানযুক্ত কণাৰ তেমন কোনো ভৱ নেই এবং তাৱা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্ৰ কৰে ঘূৱছে।

রাদারফোৰ্ডেৱ মডেল সৌৱজগতেৱ মতো। কিন্তু রাদারফোৰ্ড নিৰ্দিষ্ট কোনো কক্ষপথেৱ কথা বলেননি। বিজ্ঞানী বোৱ পৰবৰ্তীকালে ধাৰণা দেন যে, খণ্টাত্মক আধানযুক্ত কণা কিনু নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূৱে। উপৱিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, পৰমাণু অবিভাজ্য নয়। পৰমাণু ইলেকট্ৰন, প্ৰোটন ও নিউট্ৰনেৱ সমন্বয়ে গঠিত। পৰমাণুৰ কেন্দ্ৰে রয়েছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধানযুক্ত প্ৰোটন ও আধান নিৰপেক্ষ নিউট্ৰন রয়েছে। পৰমাণুৰ ভৱেৱ প্রায় পুৱোটাই নিউক্লিয়াসে থাকে। খণ্টাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্ৰন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্ৰ কৰে নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূৱে। ইলেকট্ৰন ও নিউক্লিয়াসেৱ মধ্যবৰ্তী জায়গা ফাঁকা। প্ৰকৃতপক্ষে পৰমাণুৰ বেশিৱভাগ জায়গা ফাঁকা।



চিত্ৰ ৬.১ : হিলিয়াম পৰমাণুতে ইলেকট্ৰন, প্ৰোটন ও নিউট্ৰন

পাঠ ৪-৬ : পৰমাণুৰ সংখ্যা, ভৱসংখ্যা ও আইসোটোপ

প্ৰতিটি মৌলেৱ আলাদা আলাদা পৰমাণু রয়েছে, যেমন হাইড্ৰোজেন গ্যাসেৱ পৰমাণু অক্সিজেন গ্যাসেৱ পৰমাণু থেকে আলাদা। একটি মৌলেৱ পৰমাণু থেকে আৱেকটি মৌলেৱ পৰমাণুৰ মধ্যে আকাৱ, ভৱ ও ধৰ্মে পাৰ্থক্য হয়ে থাকে। কেন এই পাৰ্থক্য? পৰমাণুতে প্ৰোটন বা ইলেকট্ৰনেৱ সংখ্যাৰ পাৰ্থক্যেৱ কাৱণে পৰমাণুসমূহেৱ মধ্যে পাৰ্থক্য হয়ে থাকে। পৰমাণুতে ইলেকট্ৰন ও প্ৰোটনেৱ সংখ্যা সমান থাকে। তবে কোনো মৌলেৱ পৰমাণুৰ বৈশিষ্ট্যকে বোঝানোৱ জন্য প্ৰোটনেৱ সংখ্যা ব্যবহাৱ কৱা হয়।

কোনো মৌলের একটি পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয়। হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুতে একটি প্রোটন আছে। তাই হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ১। অঙ্গিজেনের একটি পরমাণুতে ৮টি প্রোটন আছে। তাই অঙ্গিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮। পারমাণবিক সংখ্যা থেকে কী কী তথ্য পাওয়া যায় বলতে পার?

কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা ৬, এ থেকে কী তথ্য পাওয়া যায়? পারমাণবিক সংখ্যা যেহেতু কোনো মৌলের প্রোটনের সংখ্যা, তাই বোঝা যায় কার্বনের একটি পরমাণুতে ৬টি প্রোটন আছে। একটি পরমাণুতে যেহেতু প্রোটন আর ইলেক্ট্রনের সংখ্যা সমান, তাই বোঝা যায় কার্বনের একটি পরমাণুতে ৬টি ইলেক্ট্রন আছে।

কোনো মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা থেকে বোঝা যায় কি ঐ মৌলের পরমাণুতে কয়টি নিউট্রন আছে? না, নিউট্রন সংখ্যা জানা যায় না। নিউট্রন সংখ্যা জানতে হলে মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ও ভরসংখ্যা জানতে হবে। একটি পরমাণুতে ইলেক্ট্রনের ভর নগণ্য। পরমাণুর প্রায় সবচুক্ষ ভর তার নিউক্লিয়াসে থাকে। অর্থাৎ কোনো পরমাণুর ভর তার প্রোটন ও নিউট্রনের ভর। আবার নিউট্রন ও প্রোটনের ভর প্রায় সমান। কোনো মৌলের পরমাণুতে প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টিকে ভরসংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ

কোনো মৌলের ভরসংখ্যা = ঐ মৌলের পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা + নিউট্রনের সংখ্যা

যেমন অঙ্গিজেন পরমাণুতে ৮টি প্রোটন আর ৮টি নিউট্রন থাকে। তাই অঙ্গিজেনের ভরসংখ্যা ১৬। আবার সোডিয়ামের একটি পরমাণুতে ১১টি প্রোটন আর ১২টি নিউট্রন আছে। তাই সোডিয়ামের ভরসংখ্যা $11+12=23$ । পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারমাণবিক সংখ্যা ও ভরসংখ্যা জানা থাকলে নিউট্রন সংখ্যা জানা যায়। নিচের উদাহরণ থেকে তোমরা এটি ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

উদাহরণ : ক নামক একটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ১৭ ও ভরসংখ্যা ৩৫। ঐ মৌলের একটি পরমাণুতে কয়টি করে ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন আছে?

সমাধান : ক মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা ১৭। কোনো মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা আসলে ঐ মৌলের একটি পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা। তাই এক্ষেত্রে ক মৌলটির পরমাণুতে প্রোটন আছে ১৭টি।

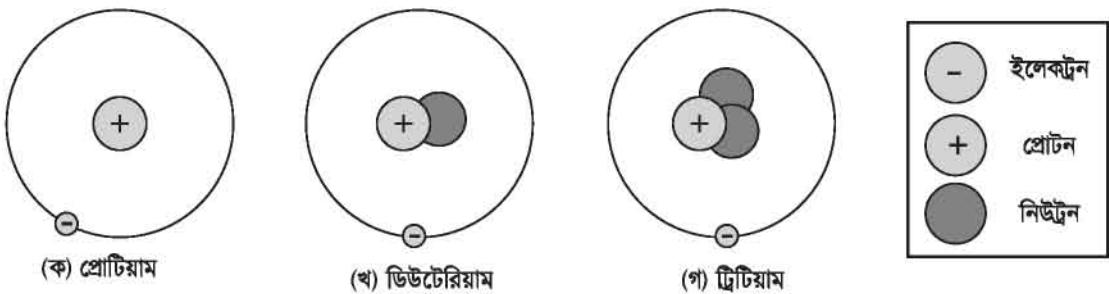
আবার কোনো পরমাণুতে প্রোটন আর ইলেক্ট্রনের সংখ্যা সমান। তাই ক মৌলের একটি পরমাণুতে ইলেক্ট্রন রয়েছে ১৭টি।

কোনো পরমাণুর প্রোটনের সংখ্যা + নিউট্রনের সংখ্যা = ঐ মৌলের ভরসংখ্যা

অর্থাৎ ক মৌলের নিউট্রনের সংখ্যা = ক মৌলের ভরসংখ্যা – ক মৌলের প্রোটন সংখ্যা

অতএব, ক মৌলের নিউট্রনের সংখ্যা = $35 - 17 = 18$

আইসোটোপ : তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ যে, একটি মৌলের প্রতিটি পরমাণুতে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন ও ইলেক্ট্রন থাকে। কিন্তু একটি মৌলের সকল পরমাণুর ভর এক নাও হতে পারে। কারণ একটি মৌলের পরমাণুতে বিভিন্ন সংখ্যায় নিউট্রন থাকতে পারে। যেমন হাইড্রোজেনের সকল পরমাণুতে একটি করে প্রোটন ও ইলেক্ট্রন থাকে। নিচের চিত্রগুলো দেখ।



চিত্র ৬.২ : হাইড্রোজেনের আইসোটোপ

হাইড্রোজেনের বেশিরভাগ পরমাণুতে কোনো নিউট্রন নেই (ক চিত্রের পরমাণু)। তাই এদের ভরসংখ্যা ১। কিন্তু খ চিত্রের পরমাণুটির মতো হাইড্রোজেনের কিছু পরমাণুতে একটি নিউট্রন থাকে। এদের ভরসংখ্যা ২। আবার গ চিত্রের পরমাণুটির মতো হাইড্রোজেনের কিছু পরমাণুতে দুটি নিউট্রন থাকে। এদের ভরসংখ্যা ৩। চিত্রের তিনটি পরমাণু হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ। এরকমভাবে, কোনো মৌলের ভিন্ন ধরনের পরমাণু যাদের প্রোটন বা পারমাণবিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভরসংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে ঐ মৌলের আইসোটোপ বলে।

কার্বনের বেশিরভাগ পরমাণুতে ৬টি প্রোটন ও ৬টি নিউট্রন রয়েছে। কিন্তু কার্বনের কিছু পরমাণুতে ৭টি বা ৮টি নিউট্রনও থাকে। তাই কার্বনের তিনটি আইসোটোপ রয়েছে।

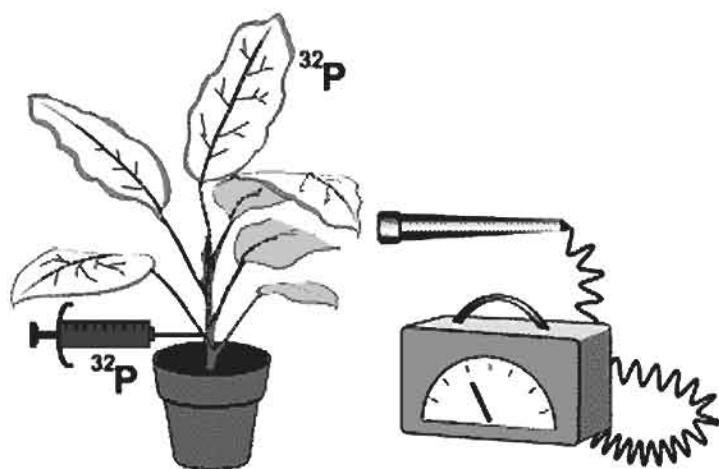
পাঠ ৭ ও ৮ : আইসোটোপের ধর্ম ও ব্যবহার

একই মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপের প্রোটন ও ইলেক্ট্রন সংখ্যা সমান বলে আইসোটোপগুলোর মধ্যে ধর্মে তেমন পার্থক্য নেই। তবে যেহেতু তাদের ভর আলাদা তাই তাদের সহজেই শনাক্ত করা যায়।

সাধারণত আইসোটোপ অস্থায়ী। অস্থায়ী আইসোটোপ বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও কণা বিকিরণ করে। তাই এদেরকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের এ ধর্ম কাজে লাগানো হয়। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

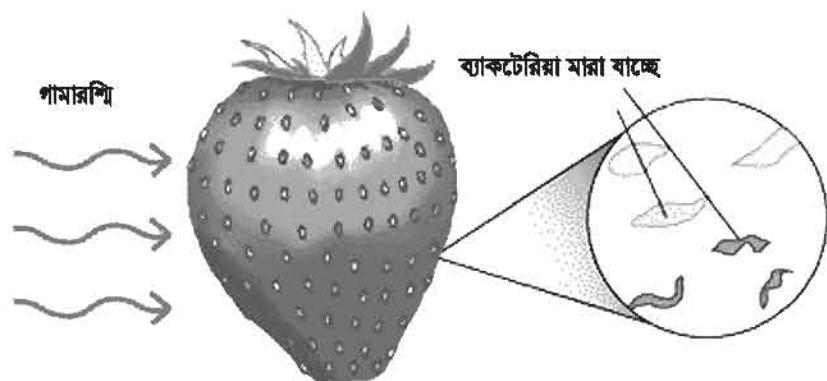
চিকিৎসা ক্ষেত্রে : বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে ও নিরাময়ে আইসোটোপের ব্যবহার করা হয়। কোনো ক্ষুদ্র রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তের মাধ্যমে আইসোটোপ পাঠিয়ে তা শনাক্ত করা যায়। একইভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর কোষ ক্যান্সার আক্রান্ত, তা আইসোটোপ দিয়ে নির্ণয় করা যায়। আবার ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করা যায় আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবহার করে। এছাড়াও তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হয়।

কৃষিক্ষেত্রে : কৃষিক্ষেত্রে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় রশি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কখন কোন সার কী পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে তা জানতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৬.৩ : কৃষি ক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার

খাদ্যব্য সম্রক্ষণে : ব্যাকটেরিয়াসহ অনেক জীবাণু তেজস্ক্রিয় রশি মারা যায়। তাই তেজস্ক্রিয় রশি ব্যবহার করে খাদ্যব্য বা ফলমূলকে জীবাণুমুক্ত করে সম্রক্ষণ করা হয়।

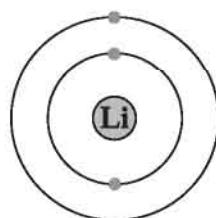


চিত্র ৬.৪: তেজস্ক্রিয় রশি ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করা

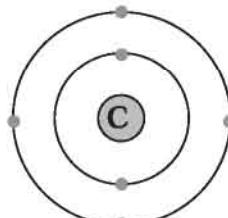
স্থ-ভাস্তিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে : তোমরা অনেক সময় খবরে শুনে থাক যে, কোনো দেশে কর্যেক কোটি বছরের পুরনো ফসিল পাওয়া গেছে। কীভাবে বিজ্ঞানীরা জানেন যে, ফসিলটি কত বছরের? এটি জানা যায় আইসোটোপের ক্ষয় থেকে। কোনো ফসিলে স্থায়ী ও অস্থায়ী আইসোটোপের অনুপাত থেকে বোঝা যায় ফসিলটি কত বছরের পুরনো।

পাঠ ৯-১১ : পরমাণুতে ইলেকট্রন কীভাবে বিন্যস্ত থাকে

তোমরা জেনেছ যে, পরমাণুতে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘূরে এবং তাদের সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ রয়েছে। এখন পশ্চ হলো, একটি কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে? চিত্র ৬.২ এর হাইড্রোজেনের ক চিত্রাটি দেখ। হাইড্রোজেন পরমাণুতে ১টি ইলেকট্রন থাকে। যা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘূরে। হিলিয়াম পরমাণুতে (চিত্র ৬.১) ২টি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে একটি কক্ষপথে ঘূরে। কক্ষপথগুলোতে $2n^2$ (যেখানে $n = 1, 2, 3, \dots$) কক্ষপথের ক্রমিক নম্বর) সূত্রানুযায়ী ইলেকট্রন বিন্যাস থাকে। সে অনুযায়ী, ১টি লিথিয়াম পরমাণুতে ৩টি ইলেকট্রন আছে। এদের মধ্যে ২টি ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথে থাকে আর তৃতীয়টি দ্বিতীয় কক্ষপথে থাকে। একইভাবে কার্বন পরমাণুতে ৬টি ইলেকট্রন থাকায় এদের ২টি ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথে এবং বাকি ৪টি ইলেকট্রন দ্বিতীয় কক্ষপথে থাকে। এভাবে প্রথম কক্ষপথে সর্বোচ্চ ২টি, দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ ৮টি এবং তৃতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ ১৮টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। কক্ষপথগুলোকে শক্তিস্তরও বলা হয়।

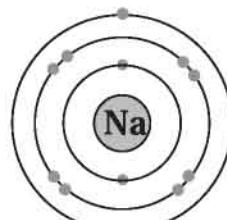


চিত্র ৬.৫ : লিথিয়াম পরমাণু



চিত্র ৬.৬ : কার্বন পরমাণু

এবার সোডিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখা যাক। সোডিয়ামের ১টি পরমাণুতে ১১টি ইলেকট্রন থাকে। তাহলে এর ইলেকট্রনগুলো কয়টি কক্ষপথে থাকবে? নিচয়ই ২, ৮, ১ এভাবে ৩টি কক্ষপথে থাকবে। অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথে ২টি, দ্বিতীয় কক্ষপথে ৮টি এবং তৃতীয় কক্ষপথে ১টি থাকবে।



চিত্র ৬.৭ : সোডিয়াম পরমাণু

চিত্রের সাহায্যে ইলেকট্রন বিন্যাস বোঝা বেশ সহজ। কিন্তু সহজে এবং সংক্ষেপে সোডিয়াম পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস বোঝাতে হলে ২, ৮, ১ এভাবে লেখা হয়। প্রদত্ত উদাহরণ থেকে নিচের ছকে বাকি মৌলগুলোর প্রতীক ও ইলেকট্রন বিন্যাস লেখ।

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা	প্রতীক	ইলেকট্রন বিন্যাস
হাইড্রোজেন	১		
হিলিয়াম	২		
লিথিয়াম	৩	Li	২, ১
বেরিলিয়াম	৪		
বোরন	৫		
কার্বন	৬		
নাইট্রোজেন	৭	N	২, ৫
অক্সিজেন	৮		
ফ্লোরিন	৯		
নিয়ন	১০		
সোডিয়াম	১১	Na	২, ৮, ১
ম্যাগনেসিয়াম	১২		
অ্যালুমিনিয়াম	১৩		
সিলিকন	১৪		
ফসফরাস	১৫		
সালফার	১৬		
ক্লোরিন	১৭	Cl	২, ৮, ৭
আর্গন	১৮		

পাঠ ১২ ও ১৩ : ইলেকট্রন বিন্যাস ও মৌলের ধর্ম

মৌলিক পদার্থের ধর্ম মূলত তাদের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর নির্ভর করে। এ ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিন্নতার কারণে সাধারণত মৌলগুলো কখনো নিষ্ক্রিয়, কখনো সক্রিয় বা আধান যুক্ত হয়।

১টি পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারে, ঠিক সেই কয়টি যদি থাকে তাহলে কক্ষপথটি পূর্ণ থাকে। এরকম পরমাণুগুলো বেশ নিষ্ক্রিয় হয়। যেমন হিলিয়াম পরমাণুতে ২টি ইলেকট্রন থাকে। প্রথম কক্ষপথে যেহেতু সর্বোচ্চ ২টি ইলেকট্রন থাকতে পারে, সেহেতু হিলিয়াম পরমাণু বেশ স্থিতিশীল বা নিষ্ক্রিয়। প্রতিটি পরমাণুই এরকম স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে চায়।

১টি পরমাণুর শেষ কক্ষপথে বা শক্তিস্তরে যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বা কম ইলেকট্রন থাকে তাহলে কী হবে? এই পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে ইলেকট্রন প্রহরণ করে বা অন্য পরমাণুকে ইলেকট্রন দিয়ে বা অন্য পরমাণুর সাথে ভাগাভাগি করে স্থিতিশীল বা পূর্ণ অবস্থায় আসতে চায়। যেমন সোডিয়াম পরমাণুর প্রথম শক্তিস্তরে ২টি, দ্বিতীয় শক্তিস্তরে ৮টি এবং তৃতীয় শক্তিস্তরে ১টি ইলেকট্রন থাকে। এটি কি স্থিতিশীল

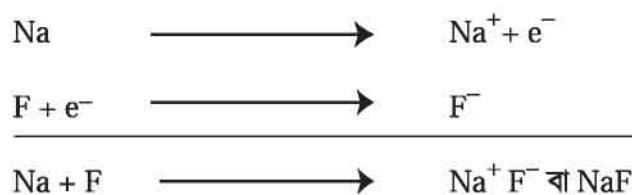
অবস্থা? নিচয়ই না। তৃতীয় শক্তিস্তরে মাত্র ১টি ইলেকট্রন থাকায় এটি স্থিতিশীল নয়। কীভাবে এটি স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে? সোডিয়াম পরমাণু যদি ১টি ইলেকট্রন অন্য কোনো পরমাণুকে দিয়ে দিতে পারে তাহলে সোডিয়াম পরমাণুতে প্রথম শক্তিস্তরে ২টি এবং দ্বিতীয় শক্তিস্তরে ৮টি ইলেকট্রন থাকে। এটি একটি স্থিতিশীল অবস্থা। তবে ১টি ইলেকট্রন বর্জন করে বা হারিয়ে নিজে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তোমরা জান পরমাণু আধান নিরপেক্ষ। কিন্তু সোডিয়াম পরমাণু ১টি ইলেকট্রন হারিয়ে কি আধান নিরপেক্ষ থাকে? না থাকে না।

১টি ইলেকট্রন হারানোর পর সোডিয়াম পরমাণু আর আধান নিরপেক্ষ নেই, আধানযুক্ত হয়েছে। এরকম আধানযুক্ত পরমাণুকে বলে আয়ন। যে আয়নে ধনাত্মক আধান আছে তাকে ক্যাটায়ন বলে। তাহলে সোডিয়াম পরমাণু ১টি ইলেকট্রন হারানোর পর ক্যাটায়নে পরিণত হয়েছে।

এবার আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক। ফ্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস ২, ৭। এটি কি স্থিতিশীল অবস্থা? নিচয়ই না। কারণ দ্বিতীয় শক্তিস্তরে ৮টি ইলেকট্রন নেই। তাহলে স্থিতিশীল অবস্থায় যেতে চাইলে ফ্লোরিন পরমাণুকে কী করতে হবে? এটি কি সোডিয়াম পরমাণুর মতো ইলেকট্রন অন্যকে দিয়ে দেবে? না, ৭টি ইলেকট্রন দেওয়া বেশ কঠিন। বরং ফ্লোরিন পরমাণু যদি ১টি ইলেকট্রন কারো কাছ থেকে নিতে পারে তাহলে এটি স্থিতিশীল হতে পারে কারণ তখন এটির দ্বিতীয় শক্তিস্তরে ৮টি ইলেকট্রন থাকবে। দেখা যাক, ১টি ইলেকট্রন যদি কারো কাছ থেকে পায় (ধরা যাক সোডিয়াম পরমাণু থেকে) তাহলে এটি আধান নিরপেক্ষ থাকে না, আধানযুক্ত হয়ে যায়।

ফ্লোরিন পরমাণু ১টি ইলেকট্রন গ্রহণ করার পর ঋণাত্মক আধান যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয়েছে। এরকম ঋণাত্মক আধানযুক্ত পরমাণুকে অ্যানায়ন বলে।

ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে পরমাণু আয়নে পরিণত হয়। ২টি পরমাণুর মধ্যে যেটি ইলেকট্রন বর্জন করে সেটি ক্যাটায়নে বা ধনাত্মক আয়নে এবং যেটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেটি ঋণাত্মক আয়নে বা অ্যানায়নে পরিণত হয়। ফলে তাদের মধ্যে একটি আকর্ষণ বল কাজ করে এবং তারা একে অন্যের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এভাবে ২টি ভিন্ন মৌলের পরমাণু থেকে যোগ তৈরি হয়। এ সম্পর্কে তোমরা পরবর্তীকালে আরও জানবে।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম—

- পরমাণু অবিভাজ্য নয়। পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত।
- পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট প্রোটন ও আধান নিরপেক্ষ নিউট্রন রয়েছে। পরমাণুর ভরের প্রায় পুরোটাই নিউক্লিয়াসে থাকে।

- খণ্ডাক আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূরে। ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী জায়গা ফাঁকা। প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গা ফাঁকা।
- প্রথম কক্ষপথে সর্বোচ্চ ২টি, দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ ৮টি এবং তৃতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ ১৮টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। কক্ষপথগুলোকে শক্তিস্তর বলা হয়।
- সর্বশেষ কক্ষপথে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারে, ঠিক সেই কয়টি ইলেকট্রন যদি ঐ শক্তিস্তরে থাকে তাহলে সেই কক্ষপথ পূর্ণ থাকে। এরকম পরমাণুগুলো বেশ নিষ্ক্রিয় হয়।
- ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে পরমাণু স্থিতিশীলতা অর্জন করে এবং আয়নে পরিণত হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. _____ এর মতবাদে পরমাণু অবিভাজ্য।
২. পরমাণুর ভরের প্রায় পুরোটাই _____ থাকে।
৩. পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গা _____।
৪. পরমাণুতে _____ সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলে।
৫. একটি মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপের প্রোটনের সংখ্যা _____।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একটি পরমাণুতে কোথায় কোথায় ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন থাকে তা চিত্র এঁকে দেখাও ও বর্ণনা কর।
২. নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৭। একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস এঁকে দেখাও।
৩. চিকিৎসা ও কৃষিক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার আলোচনা কর।
৪. পরমাণু কেন আয়নে পরিণত হয় তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৫. ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন কীভাবে তৈরি হয় তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. একটি পরমাণুর দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

ক. ২	খ. ৮
গ. ১৮	ঘ. ৩২
২. রাদারফোর্ডের পরীক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে-
 - i. পরমাণু অবিভাজ্য
 - ii. পরমাণুকে ভাঙ্গা যায়
 - iii. পরমাণুর বেশিরভাগ অংশই ফাঁকা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. ii | খ. iii |
| গ. i ও iii | ঘ. ii ও iii |

নিচের বাক্যটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও
কোনো মৌলের একটি পরমাণুতে ১০টি প্রোটন ও ৮টি নিউট্রন রয়েছে।

৩. পরমাণুটির ভরসংখ্যা কত?

ক. ১০

খ. ১৬

গ. ১৮

ঘ. ২৬

৪. উদ্বীপকের মৌলটি কী?

ক. অঙ্গিজেন

খ. সালফার

গ. সোডিয়াম

ঘ. নিয়ন

সূজনশীল প্রশ্ন

১. X পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ১১। অন্যদিকে Y পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ১৭ এবং নিউট্রন সংখ্যা ১৮।

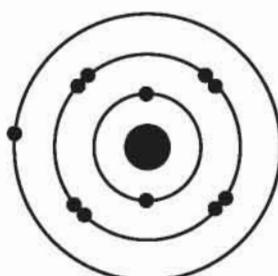
ক. কার্বনের আইসোটোপ কয়টি?

খ. ক্যাটায়ন বলতে কী বোঝায়?

গ. Y পরমাণুর ভরসংখ্যা কত?

ঘ. X ও Y পরমাণুর ইলেক্ট্রনবিন্যাস প্রদর্শনপূর্বক এদের বৰ্ণন তৈরি করার সক্ষমতা ব্যাখ্যা কর।

২.



চিত্র- ১



চিত্র- ২

ক. এটম শব্দের অর্থ কী?

খ. অঙ্গিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮ বলতে কী বোঝায়?

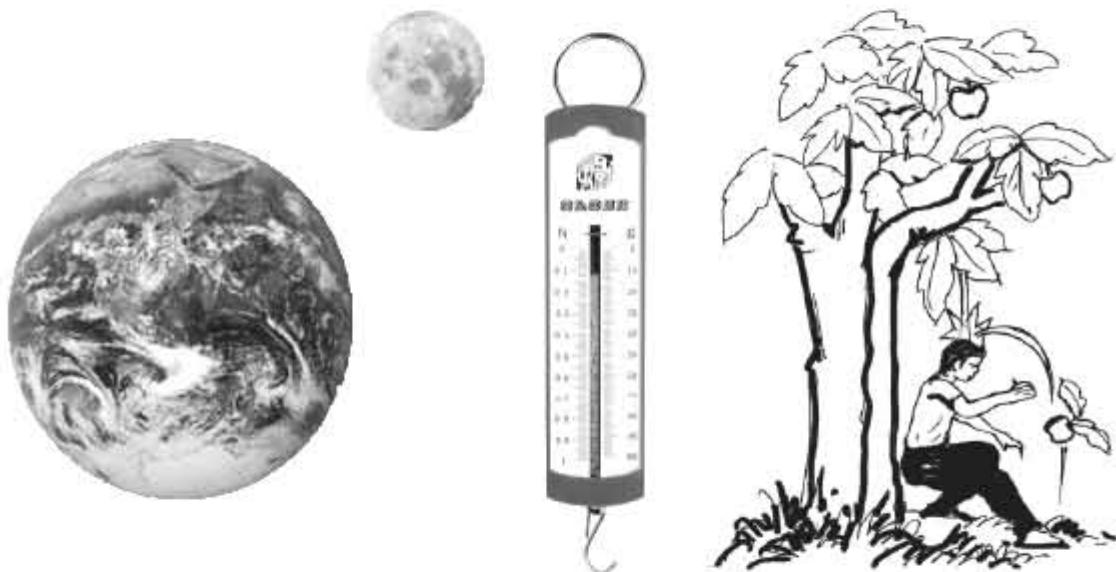
গ. উদ্বীপকের ১ নং চিত্রের পরমাণুটি সক্রিয় না নিষ্ক্রিয় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ১ ও ২ নং চিত্রের পরমাণুর পারমাণবিক গঠনের তুলনামূলক আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

পৃথিবী ও মহাকর্ষ

এ অধ্যায়ের প্রতিটি কল্প একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ কল কি সকল ক্ষেত্রে সমান? কিসের উপর এই বলের মান নির্ভর করে? পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে গভুরা বস্তুগুলি হয় তার মান কত, এই মান কেন পরিবর্তিত হয়? এই অধ্যায়ে আমরা মহাকর্ষ, অতিকর্ষ, অতিকর্ষজ কূর্য, তা ও তার নিয়ে আলোচনা করব।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মহাকর্ষ ও অতিকর্ষের পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অতিকর্ষজ কূর্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তা ও তার পর্যবেক্ষণ করতে পারব;
- অতিকর্ষজ কূর্যের প্রভাবে কম্বুর ওজনের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারব;
- আমাদের জীবনে অতিকর্ষজ কূর্যের অবদান উপলব্ধি করব।

পাঠ ১ : মহাকর্ষ

আমরা লাফ দিয়ে উপরের দিকে উঠতে চাইলে বেশি দূর উঠতে পারি না। আবার ভূগূণ্ঠে ফিরে আসি। গাছের ফল মাটিতে পড়ে। ক্রিকেট বলকে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে মাটিতে পড়ে। এর কারণ কী? কারণ পৃথিবী আমাদেরকে তার নিজের দিকে টানে বা আকর্ষণ করে। শুধু পৃথিবী কেন, সবকিছুই আমাদের আকর্ষণ করে। আসলে এ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকণ একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলকে মহাকর্ষ বলে।

তোমরা নিশ্চয়ই নিউটন ও আপেল মাটিতে পড়ার কাহিনী শুনে থাকবে। কথিত আছে, নিউটন একদিন বাগানে বসে চিন্তা করছিলেন। এমন সময় তিনি গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে পড়তে দেখেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, আপেলটি মাটিতে পড়ল কেন? নিশ্চয়ই কেউ একে মাটির দিকে টানছে। চিন্তা-ভাবনা শেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবী সকল বস্তুকে তার নিজের দিকে টানে। পরে তিনি আরও সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শুধু পৃথিবী নয়, এ মহাবিশ্বের সকল বস্তুকণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ বিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ও মহাকর্ষ বল

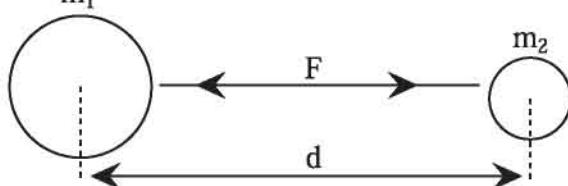
দুটি বস্তুকণার মধ্যকার আকর্ষণ বলের মান শুধু বস্তুদৱের তর এবং এদের মধ্যকার দূরত্বের উপর নির্ভর করে। এদের আকৃতি, প্রকৃতি কিংবা মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। বস্তুদৱের তর বেশি হলে, আকর্ষণ বলও বেশি হয় আর তাদের মধ্যে দূরত্ব বেশি হলে বল কম হয়। এ আকর্ষণ সম্পর্কে নিউটনের একটি সূত্র আছে যা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নামে পরিচিত।

সূত্র : মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণ একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এ আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণাদৱের তরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এ বল বস্তুকণাদৱের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

ধরা যাক, m_1 এবং m_2 তরের দুটি বস্তু পরস্পর থেকে d দূরত্বে অবস্থিত (চিত্র ৭.১)। এদের মধ্যকার আকর্ষণ বল F হলে, মহাকর্ষ সূত্রানুসারে,

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

এখানে G একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে বিশ্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বলে। এর অর্থ হচ্ছে এক কিলোগ্রাম তরের দুটি বস্তু এক মিটার দূরত্বে স্থাপন করলে এরা পরস্পরকে যে বলে আকর্ষণ করে তা G এর সমান।



চিত্র ৭.১ : মহাকর্ষ বল

মহাকর্ষ সূত্রানুসারে আমরা দেখতে পাই, নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত দুটি বস্তুর তরের গুণফল দিগুণ হলে বল দিগুণ হবে, তরের গুণফল তিনগুণ হলে বল তিনগুণ হবে। আর নির্দিষ্ট তরের দুটি বস্তুর দূরত্ব দিগুণ করলে

বল এক-চতুর্থাংশ হবে, দূরত্ব তিনগুণ করলে বল নয় ভাগের এক ভাগ হবে। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। এবার বলো, অন্য সকল গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরে কেন?

পাঠ ২ ও ৩ : অভিকর্ষ ও অভিকর্ষজ ত্বরণ

অভিকর্ষ : আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, এ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ মহাবিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাই মহাকর্ষ। দুটি বস্তুর একটি যদি পৃথিবী হয় এবং পৃথিবী যদি বস্তুটিকে আকর্ষণ করে তবে তাকে মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ বলে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণই অভিকর্ষ। গাছের ফল মাটিতে পড়ে। ক্রিকেট বলকে উপরের দিকে ছুড়ে দিলেও বলটি মাটিতে এসে পড়ে। এখানে পৃথিবী যেমন ফল বা ক্রিকেট বলকে আকর্ষণ করে তেমনি এরাও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী অনেক বড় এবং এর আকর্ষণ বল অনেক বেশি হওয়ায় ফল ও ক্রিকেট বল মাটিতে পড়ে। পৃথিবী এবং অন্য যেকোনো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে অভিকর্ষ বলে। সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে যে আকর্ষণ তা মহাকর্ষ, কিন্তু পৃথিবী এবং তোমার বিজ্ঞান বই—এর মধ্যে যে আকর্ষণ তা অভিকর্ষ।

অভিকর্ষজ ত্বরণ : আমরা জানি বল প্রয়োগ করলে কোনো বস্তুর বেগের পরিবর্তন হয়। প্রতি সেকেন্ডে যে বেগ বৃদ্ধি পায় তাকে ত্বরণ বলে। অভিকর্ষ বলের প্রভাবেও বস্তুর ত্বরণ হয়। এ ত্বরণকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ বলা হয়। যেহেতু বেগ বৃদ্ধির হারকে ত্বরণ বলে, সুতরাং অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূপঞ্চে মুক্তভাবে পড়ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে।

অভিকর্ষজ ত্বরণকে g দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেহেতু অভিকর্ষজ ত্বরণ এক প্রকার ত্বরণ, সুতরাং এর একক হবে ত্বরণের একক অর্থাৎ মিটার/সেকেন্ড^২।

ধরা যাক, M = পৃথিবীর ভর, m = ভূপঞ্চে বা এর নিকটে অবস্থিত কোনো বস্তুর ভর, d = বস্তু ও পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব। তাহলে মহাকর্ষ সূত্রানুসারে অভিকর্ষ বল, $F = G \frac{Mm}{d^2}$

আবার বলের পরিমাপ থেকে আমরা পাই, অভিকর্ষ বল = ভর \times অভিকর্ষজ ত্বরণ

$$\text{অর্থাৎ } F = mg$$

উপরিউক্ত দুই সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়,

$$mg = \frac{GMm}{d^2}$$

$$\text{বা, } g = \frac{GM}{d^2}$$

এ সমীকরণের ডান পাশে বস্তুর ভর m অনুপস্থিত। সুতরাং অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না। যেহেতু G এবং পৃথিবীর ভর M ধূবক, তাই g -এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্ব d -এর উপর নির্ভর করে। সুতরাং g -এর মান বস্তু নিরপেক্ষ হলেও স্থান নিরপেক্ষ নয়। এর অর্থ হলো g -এর মান বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হয়।

অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন : পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R হলে

$$\text{ভূপৃষ্ঠ } g = \frac{GM}{R^2}$$

যেহেতু পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়, মেরু অঞ্চলে একটুখানি চাপা, তাই পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R ধূবক নয়। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র g -এর মান সমান নয়। মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R সবচেয়ে কম বলে সেখানে g -এর মান সবচেয়ে বেশি। মেরু অঞ্চলে g -এর মান ৯.৮৩ মিটার/সেকেন্ড 2 । মেরু থেকে বিশুব অঞ্চলের দিকে R এর মান বাঢ়তে থাকায় g -এর মান কমতে থাকে। বিশুব অঞ্চলে R এর মান সবচেয়ে বেশি বলে g -এর মান সবচেয়ে কম। ৯.৭৮ মিটার/সেকেন্ড 2 । হিসাবের সুবিধার জন্য ভূপৃষ্ঠে g -এর আদর্শ মান ধরা হয় ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড 2 । এর অর্থ হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ত কোনো বস্তুর বেগ প্রতি সেকেন্ড ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড বৃদ্ধি পায়।

কোনো বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূমিতে পৌঁছায়। একই উচ্চতা থেকে একই সময় এক টুকরা পাথর ও এক টুকরা কাগজ ছেড়ে দিলে এগুলো একই সময়ে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাবে কি? যেহেতু বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না, তাই পাথর ও কাগজের উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ একই। সুতরাং তাদের একই সময়ে মাটিতে পৌঁছানো উচিত। কিন্তু বাস্তবে পাথরটি কাগজের আগেই মাটিতে পৌঁছায়। বাতাসের বাধার বিভিন্নতার কারণে এরূপ হয়। বাতাসের বাধা না থাকলে এগুলো অবশ্যই একই সময়ে মাটিতে পৌঁছাত।

পাঠ ৪ : ভর ও ওজন

যখন আমরা বলি কবিরের ওজন ৯০ কিলোগ্রাম (কেজি) তখন আমরা আসলে বুঝাই যে, কবিরের দেহের ভর ৯০ কিলোগ্রাম (কেজি)। আমরা যখন ৫০ কেজি চাউলের বস্তা কিনি তখন আমরা আসলে ঐ বস্তার চাউলের ভর ৫০ কেজি বুঝি, কিন্তু বস্তার চাউলের ওজন বুঝাই না।

পদার্থবিজ্ঞানে ভর ও ওজন সম্পূর্ণ পৃথক দুটি রাশি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা ওজন কথাটাকে অপব্যবহার করিয়া একে ভুল অর্থে বোঝায়। আসলে আমরা কোনো বস্তুর ভরকে ঐ বস্তুর ওজন বলে থাকি। তবে ভর ও ওজনের পার্থক্য কী?

ভর : প্রত্যেক বস্তু পদার্থ দ্বারা গঠিত। ভর হলো কোনো বস্তুতে পদার্থের পরিমাণ। বস্তুর ধর্ম এর অবস্থান, আকৃতি ও গতি পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তিত হয় না। যে পরমাণু ও অণু দিয়ে বস্তুটি গঠিত তার সংখ্যা ও সংযুক্তির উপর বস্তুটির ভর নির্ভর করে। তরের আন্তর্জাতিক একক হলো কিলোগ্রাম বা কেজি (kg)। বেশি ভরকে (যেমন এক ট্রাক চাউল) মেট্রিক টনে মাপা হয়। এক টন ১০০০ কিলোগ্রামের সমান। অল্প ভরকে মাপা হয় গ্রাম। যেমন কোনো পেনসিলের ভর ৫ গ্রাম (g)। ১ কেজি সমান ১০০০ গ্রাম।

ওজন : আমরা জানি যে, কোনো বস্তুকে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে ভূমিতে ফিরে আসে। এটা ঘটে বস্তুর $\frac{1}{9}$ ওজনের জন্য যা একে পৃথিবীর দিকে টানে। পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের কারণে এটা ফিরে আসে।

কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বল দ্বারা তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাকে বস্তুর ওজন বলে। কোনো বস্তুর ভর m এবং পৃথিবীর কোনো স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ g হলে ঐ স্থানে বস্তুর ওজন W হবে, $W = mg$

ওজনের একক হলো বলের একক অর্ধাং নিউটন। পৃথিবী পৃষ্ঠে ১০ কেজি ভরের বস্তুর ওজন হবে,
 $W = 10 \times ৯.৮$ নিউটন = ৯৮ নিউটন

সাধারণত স্থিতি নিষ্ঠির সাহায্যে কোনো বস্তুর ওজন পরিমাপ করা হয়।

পাঠ ৫ : ভর ও ওজনের সম্পর্ক

আমরা জানি বস্তুর মধ্যে পদার্থের পরিমাণই হচ্ছে এর ভর। ভর হচ্ছে একটি ধূব রাশি যা ভূপৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠের উপরে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় না। ৭৫ কেজি ভরের একজন মহাশূন্যচারীর ভর চাঁদে কিংবা পৃথিবীর বা চাঁদের কক্ষপথেও ৭৫ কেজিই থাকবে। মহাশূন্যচারী যতটুকু পদার্থ দিয়ে তৈরি, তা তার স্থান পরিবর্তনের ফলেও কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না বলে তার ভর সর্বত্র অপরিবর্তিত থাকে।

যেহেতু বস্তুর ভর একটি ধূব রাশি, সূতরাং বস্তুর ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর উপর নির্ভর করে। যেসব কারণে অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন ঘটে সেসব কারণে বস্তুর ওজনও পরিবর্তিত হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় বস্তুর ওজন তত কমতে থাকে। বস্তুর ওজন বস্তুর মৌলিক ধর্ম নয়। কোনো বস্তুর ওজন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ শূন্য, তাই সেখানে বস্তুর ওজনও শূন্য। মহাশূন্যে কোনো বস্তুর ওজন শূন্য হলে তখন বস্তুর উপর কোনো মহাকর্ষ বল কাজ করে না। চাঁদের অভিকর্ষজনিত ত্বরণের মান প্রায় পৃথিবীর $\frac{1}{6}$ ভাগ। সূতরাং চাঁদে ১ কেজি ভরের বস্তুর ওজন হবে প্রায় ১.৬৩ নিউটন (N)।

কোনো বস্তুর ওজন পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তার দূরত্বের উপর নির্ভর করে। যদি দূরত্ব বাড়ানো হয় তাহলে তার উপর পৃথিবীর আকর্ষণ কমে যায়, ফলে বস্তুর ওজন হ্রাস পায়। ভূপৃষ্ঠে ১ কেজি ভরের কোনো বস্তুর ওজন ৯.৮ নিউটন হলেও পৃথিবী থেকে দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে বস্তুর ওজন কমতে থাকে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠেও কোনো বস্তুর ওজনের অতি সামান্য তারতম্য ঘটে। এর একটি কারণ হচ্ছে পৃথিবী সুষম গোলক নয় এবং ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র অভিকর্ষজ ত্বরণের মানও এক নয়। অবশ্য এ পার্থক্য এত ক্ষুদ্র যে কেবল সুবেদী ওজন মাপক যন্ত্রের সাহায্যেই তা পরিমাপ করা যাবে। অধিকাংশ হিসাব নিকাশের সময় আমরা এ পার্থক্য উপেক্ষা করি। ১ কেজি ভরের কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি হবে পৃথিবীর দুই মেরুতে অর্ধাং উভয় মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে। যেখানে এর ওজন হবে ৯.৮৩ নিউটন। বিশুবীয় অঞ্চলে এর ওজন সবচেয়ে কম হবে ৯.৭৮ নিউটন। খান্তীয় অঞ্চলের ওজন হবে ৯.৭৯ নিউটন।

যেহেতু বস্তুর ভর বেশি হলে তার ওজনও বেশি হয়, ওজন ভরের সমানুপাতিক। সুতরাং যে সকল ঘন্টা দিয়ে ওজন মাপা যায় সেগুলো দিয়ে ভরও মাপা যায়। সিপ্রিং নিষ্ঠি অনেক সময় কিলোগ্রাম এককে দাগাঞ্চিত থাকে। যেহেতু নিষ্ঠি এবং ওজন মাপক যন্ত্রগুলো এমনভাবে দাগাঞ্চিত থাকে যে, অনেক সময় আমরা ভর ও ওজন উভয়ের জন্যই কিলোগ্রাম একক ব্যবহার করে থাকি। এটি অবশ্যই ভুল। ওজন এক প্রকার বল এবং বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের সময় তা অবশ্যই নিউটন এককে পরিমাপ করতে হবে। যখন আমরা ১কেজি লিখিত একটি চাউলের প্যাকেট বা একটি দুধের টিন কিনি-তখন বুবি ঐ প্যাকেটের চাউলের বা টিনের দুধের ভর ১ কেজি কিন্তু ওজন ১ কেজি নয়, পৃথিবীতে এগুলোর ওজন হবে ৯.৮ নিউটন। চাউলের প্যাকেটের ওজন গ্রহ থেকে গ্রহাঞ্চরে বা চাঁদে ভিন্ন হবে যদিও ভরের কোনো পরিবর্তন হবে না।

পাঠ ৬ : পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ ও বস্তুর ওজন

বস্তুর ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে সকল কারণে অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন ঘটে সে সকল কারণে বস্তুর ওজনও পরিবর্তিত হয়। বস্তুর ওজন বস্তুর মৌলিক ধর্ম নয়। স্থানভেদে বস্তুর ওজনের পরিবর্তন হয়। যে সকল কারণে ওজনের পরিবর্তন হয় নিচে তা বর্ণনা করা হলো।

(ক) ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে : পৃথিবীর আকৃতি ও আহিক গতির জন্য বিভিন্ন স্থানে বস্তুর ওজন বিভিন্ন হয়।

(১) পৃথিবীর আকৃতির জন্য : পৃথিবী সুষম গোলক না হওয়ায় পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের সকল স্থান সমদূরে নয়। যেহেতু g এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বের উপর নির্ভর করে, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে g এর মানের পরিবর্তন হয়। বিশুবীয় অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বেশি হওয়ায় g এর মান সবচেয়ে কম (৯.৮ মিটার/সেকেন্ড 2)। সুতরাং বিশুবীয় অঞ্চলে কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম হয়। বিশুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে যত যাওয়া যায়, ব্যাসার্ধ তত কমতে থাকে এবং g এর মান বাঢ়তে থাকে (৯.৮৩ মিটার/সেকেন্ড 2)। এর ফলে বস্তুর ওজনও বাঢ়তে থাকে। মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম হওয়ায় g এর মান মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। ফলে ওজনও সবচেয়ে বেশি হয়।

(২) পৃথিবীর আহিক গতির জন্য : পৃথিবীর আহিক গতির জন্য অভিকর্ষজ ত্বরণ বিশুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বস্তুর ওজনও বৃদ্ধি পায়।

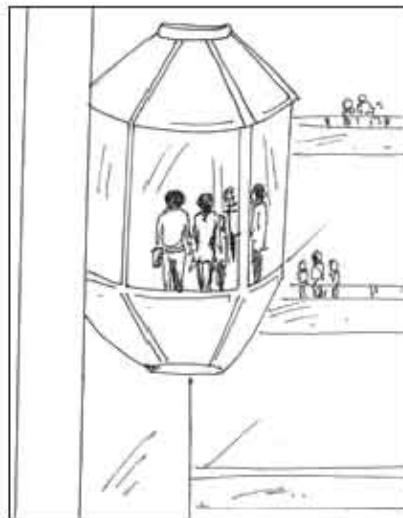
(৩) ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর কোনো স্থানে : ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মানও তত কমতে থাকে। এর ফলে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় বস্তুর ওজনও তত কমতে থাকে। এই কারণে পাহাড় বা পর্বতশীর্ষে বস্তুর ওজন কম হয়।

(৪) পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনো স্থানে : ভূপৃষ্ঠ থেকে যত নিচে যাওয়া যায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ততই কমতে থাকে। এর ফলে পৃথিবীর যত অভ্যন্তরে যাওয়া যায় বস্তুর ওজন তত কমতে থাকে। এ কারণে খনিতে কোনো বস্তুর ওজন কম হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান শূন্য। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্রে যদি কোনো বস্তুকে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বস্তুর উপর পৃথিবীর কোনো আকর্ষণ থাকবে না, অর্থাৎ বস্তুর ওজন শূন্য হবে।

পাঠ ৭ ও ৮ : লিফটে ও মহাশূন্যে ওজনের তারতম্য : ওজনহীনতা

ভূগ়স্থের কোনো একটি স্থানে g এর মান নির্দিষ্ট, ফলে সেখানে কোনো ব্যক্তির ওজনও নির্দিষ্ট। তা সত্ত্বেও সেখানে কোনো ব্যক্তির ওজনের ভিন্নতা অনুভব করতে পারেন এবং নিজেকে ওজনহীনও মনে করতে পারেন। আসলে ওজন আর ওজন অনুভব করা এক কথা নয়। পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তির উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল থাকবেই। ফলে তার ওজন থাকবেই কিন্তু তিনি সেই ওজন অনুভব করবেন কেবলমাত্র তখনই যখন তার ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী কোনো প্রতিক্রিয়া বল তার উপর প্রযুক্ত হবে।

আমরা যখন লিফটে চড়ে উঁচু দালানে উঠানামা করি তখন আমরা ওজনের তারতম্য অনুভব করি। আমরা যখন কোনো স্থির লিফটে দাঁড়াই তখন আমরা লিফটের মেঝের উপর আমাদের ওজনের সমান বল প্রয়োগ করি, লিফটও আমাদের উপর ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে— আমরা আমাদের ওজনের অস্তিত্ব টের পাই। কিন্তু লিফট যদি উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন স্থির অবস্থান থেকে উপরের দিকে যাত্রা করায় লিফটটির উপরের দিকে একটি ত্বরণ সৃষ্টি হয় ফলে লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ হয় g এর চেয়ে বেশি। এ বর্ধিত ত্বরণের জন্য আমরা লিফটের উপর আমাদের ওজনের চেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করি। তখন লিফটও আমাদের উপর বিপরীতমুখী যে প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে তা আমাদের ওজনের চেয়ে বেশি হয় এবং নিজেদেরকে তারী অনুভব করি। কিন্তু এরপর লিফট যখন সমবেগে উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন তার কোনো ত্বরণ থাকে না, ফলে আমরা আর ওজনের চেয়ে অতিরিক্ত বল অনুভব করি না, কেবল ওজনই অনুভব করি। অপরপক্ষে লিফট যখন নিচে নামতে শুরু করে তখন স্থির অবস্থান থেকে একটি ত্বরণ সৃষ্টি হয় এবং লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ g এর চেয়ে কম হয়। এ কম ত্বরণ নিয়ে আমরা লিফটের উপর আমাদের ওজনের চেয়ে কম বল প্রয়োগ করি। ফলে, আমরা হালকা বোধ করি অর্থাৎ আমাদের ওজন কম মনে হয়। লিফট যদি মুক্তভাবে নিচে পড়ে অর্থাৎ, লিফটেরও যদি g ত্বরণ হয়, তবে লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ হবে ($g - g$) অর্থাৎ শূন্য। ফলে আমরা লিফটের উপর কোনো বল প্রয়োগ করব না। তখন লিফটও আমাদের ওজনের বিপরীতে আমাদের উপর কোনো প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করবে না এবং আমরা নিজেদেরকে ওজনহীন মনে করব। কোনো লিফটের কেবল বা দড়ি ছিড়ে গিয়ে লিফটটি যদি অভিকর্ষের প্রভাবে নিচে পড়ে তখন এ অবস্থার উদ্ভব হবে। এ অবস্থায় যদি লিফটের ছাদ থেকে ঝুলত্ব বা লিফটে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তির হাতে ধরা স্থিং নিষ্ঠ থেকে একটি বস্তু ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে স্থিং নিষ্ঠির কাঁটা শূন্য দাগে অবস্থান করছে। অর্থাৎ, বস্তুটির ওজন শূন্য।



ଚିତ୍ର ୭.୨ : ଲିଫ୍ଟ

ମହାଶୂନ୍ୟଧାନେର ପୃଥିବୀ ବା ଚାନ୍ଦକେ ପ୍ରଦିଳିଷ କରାଯାଉ ଓ ଲିଫ୍ଟଟୋର ମୁନ୍ତତାବେ ନିଚେ ପଡ଼ାଇ ଯଥେ କୋଣୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଇ । ମହାଶୂନ୍ୟଚାରୀରୀ ମହାଶୂନ୍ୟଧାନେ କରେ ପୃଥିବୀକେ ଏକଟି ନିର୍ମିତ ଉଚ୍ଚତାର ବୃତ୍ତାକାର କରିବାରେ ପ୍ରଦିଳିଷ କରେ ଥାବେଳ । ଏ ବୃତ୍ତାକାର ଗଡ଼ିର ଅନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟଧାନେର ଦେଇଲେର ସାଥେକେ ମହାଶୂନ୍ୟଚାରୀର ଦୂରପ ଶୂନ୍ୟ ହେ ଏବଂ ମହାଶୂନ୍ୟଚାରୀ ମହାଶୂନ୍ୟଧାନେର ଦେଇଲ ବା ଯେବେଳେ କୋଣୋ ବଳ ଥିଲୋଗ କରେନ ନା । କଲେ ତିନି ତାର ଉଜନେର ବିଶ୍ଵାକ କୋଣୋ ଅଭିନିଜ୍ଞା କଲାତ ଅନୁଭବ କରେନ ନା । ତାଇ ତିନି ସ୍ଵର୍ଗହିନୀଙ୍କ ଅନୁଭବ କରେନ । ଏ ଅବଶ୍ୟାମ ମହାଶୂନ୍ୟଧାନ ଥେବେ କୋଣୋ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ଲିଫ୍ଟ ପଢ଼େ ନା, ପ୍ଲାସର ପାନି ଉପ୍ତୁ କରିଲେଣ ପଢ଼େ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଶୂନ୍ୟଚାରୀର ଭର ଆହେ, ଏ ସ୍ଥାନେ ଅଭିକର୍ମଜ ଦୂରପ ତୁ ଆହେ, କଲେ ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ତଥା ସ୍ଵର୍ଗନ ଆହେ । କେବଳ ମହାଶୂନ୍ୟଧାନ ତୁ ଦୂରପେ ଗଡ଼ିଶୀଳ ହସରାର କାରଣେ ଏ ଆଗାତତ ସ୍ଵର୍ଗହିନୀଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଆହେ । ସମି ଏ ସ୍ଥାନେ ମହାଶୂନ୍ୟଧାନ ବୃତ୍ତାକାର ପଥେ ପୃଥିବୀକେ ପ୍ରଦିଳିଷ ନା କରେ, କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଲିଫ୍ଟେ ମୁନ୍ତତାବେ ନା ପଡ଼େ କିମ୍ବା ମୌର୍ଯ୍ୟରେ ଥାକେ, ତାହାଲେ କିମ୍ବା ମହାଶୂନ୍ୟଚାରୀ ଅବଶ୍ୟାଇ ତୀର ଉଜନ ଟେର ପାବେଳ ।

ମହାଶୂନ୍ୟ : ମହାକର୍ମ, ମହାକର୍ମୀର ଧ୍ୱବତ, ଅଭିକର୍ମ, ଅଭିକର୍ମଜ ଦୂରପ, ଭର, ଉଜନ, ସ୍ଵର୍ଗହିନୀଙ୍କ, ଲିଫ୍ଟ

ଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପାଠ ଶେବେ ବା ଶିଖିଲାମ—

- ଏ ମହାବିଦ୍ରେ ସେକୋଣୋ ଦୁଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଯଥେ ଯେ ଆକର୍ଷଣ ତାକେ ମହାକର୍ମ ବଲେ ।
- ମହାବିଦ୍ରେ ପ୍ରତିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଏକେ ଅଶ୍ଵରକେ ଲିଜେର ଲିଫ୍ଟେ ଆକର୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ଏ ଆକର୍ଷଣ ସଲେର ମାନ ବଳ୍କୁକର୍ମାବହେର ଭାବେ ପୃଥିବୀର ସମାନ୍ତାପାତିକ ଏବଂ ଏଦେର ଦୂରଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟାଜତାନ୍ତାପାତିକ । ଏ ବଳ ବଳ୍କୁକର୍ମାବହେର ସହ୍ୟୋଜକ ଜଗଲରେଥା ବରାନ୍ଦା କିମ୍ବା କରେ ।
- ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେକୋଣୋ ବଳ୍କୁର ଯଥେ ଯେ ଆକର୍ଷଣ ତାକେ ଅଭିକର୍ମଜ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ମିନ ବଲେ ।

- মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে ভূগঠনে মুক্তভাবে পড়ত কোনো বস্তুর কেবি বৃদ্ধির হারকে মাধ্যাকর্ষণজনিত ভূরণ বলে।
- অভিকর্ষজ ভূরণ বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ভূরণ g-এর আদর্শ মান ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^২।
- বস্তুর মধ্যে পদার্থের পরিমাণই হচ্ছে এর ভর।
- কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বল দ্বারা তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাকে বস্তুর ওজন বলে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিনগুণ বাড়ালে এদের আকর্ষণ বলের কী পরিবর্তন হবে এবং কেন পরিবর্তন হবে?
২. অভিকর্ষজ ভূরণ বলতে কী বোবায় ?
৩. ভর ও ওজনের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখ।
৪. দাঢ়িপাল্লায় মাপলে কোনো বস্তুর ভর পৃথিবী ও চাঁদে সমান হবে কেন? ব্যাখ্যা কর।
৫. পৃথিবীর মেরু অঞ্চল ও বিশুব অঞ্চলে একই বস্তুর ওজনে পার্থক্য দেখা যায় কেন ?

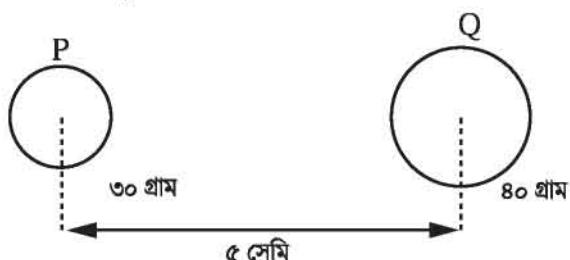
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ওজনের একক কী?

ক. গ্রাম	খ. কিলোগ্রাম
গ. কুইন্টল	ঘ. নিউটন
২. বস্তুর ভরের ক্ষেত্রে কোন বিবৃতিটি সঠিক?

ক. অবস্থানের পরিবর্তনে বস্তুর ভর পরিবর্তিত হয়	খ. বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলই ভর
গ. বস্তুর মধ্যে পদার্থের মোট পরিমাণই ভর	ঘ. ভরের একক নিউটন

নিচের চিত্র হতে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও



ফর্মা-১০, বিজ্ঞান-অষ্টম শ্রেণি

৩. P ও Q এর মধ্যকার আকর্ষণ বল নির্ভর করে-

- i. বস্তু দুটির ভরের উপর
- ii. মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর
- iii. মাধ্যমের প্রকৃতির উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |
| ৪. বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফল ৩৬০০ থ্রাম ^২ হলে বলের কী পরিবর্তন হবে? | |
| ক. অর্ধেক হবে | খ. দ্বিগুণ হবে |
| গ. তিনগুণ হবে | ঘ. চারগুণ হবে |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. নুহা তাদের বাসায় পীচতলার ছাদে উঠে ৫০ থ্রাম ভরের একটি পাথর এবং এক টুকরা কাগজ একই সাথে নিচে ফেলে দিল। মাটিতে দাঁড়ানো নুহার ছোট ভাই লক্ষ করল, পাথরটি কাগজের আগেই মাটিতে পৌছায়।

- ক. অভিকর্ষ কী?
- খ. অভিকর্ষজ ভরণ বলতে কী বোঝায়?
- গ. পাথরটির ওজন নির্ণয় কর।
- ঘ. পাথরটি আগেই মাটিতে পড়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

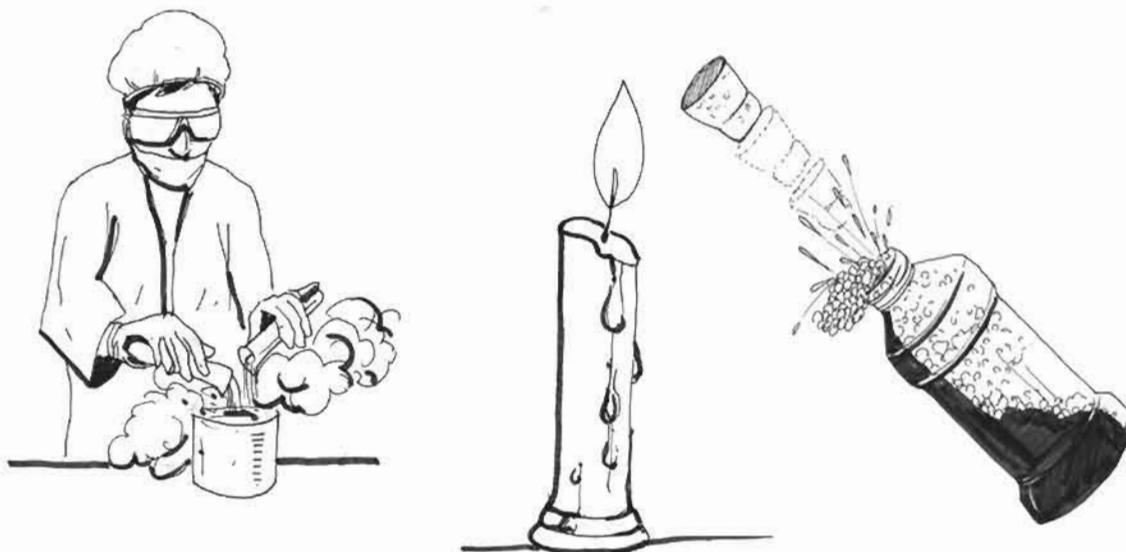
২. একটি বস্তুর ভর ১২০ কেজি। একটি রকেটে করে একে চাঁদে নিয়ে যাওয়া হলো। এতে দেখা গেল বস্তুটির ভরের কোনো পরিবর্তন না ঘটলেও ওজনের পরিবর্তন ঘটল।

- ক. ভর কাকে বলে?
- খ. ভর ও ওজনের মধ্যে পার্থক্য কী?
- গ. চাঁদে বস্তুটির ওজন কত হবে নির্ণয় কর।
- ঘ. চাঁদে বস্তুটির ওজনের কেন পরিবর্তন ঘটল ব্যাখ্যা কর।

অষ্টম অধ্যায়

রাসায়নিক বিক্রিয়া

আমাদের চারপাশে নানা রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যাচ্ছে। এই সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া কখনো শক্তি উৎপন্ন করে, কখনো ব্যবহার উপযোগী নতুন পদার্থ তৈরি করে আবার কখনো বা ঝোগ নিরাময়েও সাহায্য করে।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের শক্তির বৃপ্তির ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শুল্ক কোষের শক্তির বৃপ্তির ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তড়িৎ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরীক্ষণ কাজে রাসায়নিক পদার্থ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারব;
- আমাদের জীবনে রাসায়নিক বিক্রিয়ার অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ ১ ও ২ : প্রতীক, সংকেত ও যোজনী

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা প্রতীক ও সংকেত সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছ। রসায়নবিদগণ গঠন অনুসারে পৃথিবীর সকল পদার্থকে মৌলিক ও যৌগিক এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এ পর্যন্ত মোট ১১৮ টি মৌলিক পদার্থের কথা জানা গেছে। সাধারণত মৌলের পুরো নাম না লিখে ইংরেজি বা ল্যাটিন নামের একটি বা দুইটি অক্ষর দিয়ে সংক্ষেপে মৌলটিকে প্রকাশ করা হয়। মৌলের পুরো নামের এ সংক্ষিপ্তরূপকে প্রতীক বলা হয়। যেমন— H (হাইড্রোজেন), O (অক্সিজেন), Ca (ক্যালসিয়াম) ইত্যাদি।

আবার কোনো মৌল বা যৌগের অণুর সংক্ষিপ্তরূপকে সংকেত বলা হয়। যেমন— হাইড্রোজেন অণুর সংকেত H_2 , অক্সিজেন অণুর সংকেত O_2 , হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অণুর সংকেত HCl ইত্যাদি।

যৌগের সংকেত লেখার সময় আমাদেরকে মৌলের যোজনী সংখ্যা সম্পর্কে ভাবতে হবে। মৌলের যোজনীর সংখ্যা অনুযায়ী মৌলগুলো একে অন্যের সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। মৌলিক পদার্থের যোজনীকে আমরা এক একটি হাতের সাথে তুলনা করতে পারি। যে মৌলের একটি হাত তার যোজনী হবে ১। হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন উভয়ই একহাত বিশিষ্ট মৌল। অর্থাৎ উভয়ের যোজনী ১। তাই হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সংকেত হবে HCl । অক্সিজেনের যোজনী ২ অর্থাৎ অক্সিজেনের ১টি পরমাণুর ২টি হাত আছে। এ ২টি হাত দিয়ে অক্সিজেন একযোজী বা ১ হাত বিশিষ্ট ২টি হাইড্রোজেনের পরমাণুকে ধরতে পারে। এ কারণে পানির সংকেত H_2O ।

নাইট্রোজেন ও কার্বনের যোজনী যথাক্রমে ৩ এবং ৪। ফলে অ্যামোনিয়ার সংকেত NH_3 এবং মিথেনের সংকেত CH_4 । হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, পানি, অ্যামোনিয়া ও মিথেনের অণুকে নিম্নরূপভাবে দেখানো যেতে পারে—



উল্লেখ্য কোনো কোনো মৌলের একাধিক যোজনীও থাকতে পারে। যেমন— সালফার এর যোজনী ২ ও ৪, আয়রন এর যোজনী ২ ও ৩ ইত্যাদি।

অতএব কোনো মৌলের যোজনী হলো ঐ মৌলের একটি পরমাণু কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় তার সংখ্যা। কোনো যৌগ গঠনের সময় সাধারণভাবে লক্ষ রাখতে হবে যেন মৌলের সবগুলো হাত বা যোজনী কাজে লাগে।

কয়েকটি মৌল ও যৌগমূলকের যোজনী

	যোজনী - ১	যোজনী - ২	যোজনী - ৩	যোজনী - ৪
অধাতু (মৌল)	হাইড্রোজেন (H) ফ্লোরিন (F) ক্লোরিন (Cl) ব্রোমিন (Br) আয়োডিন (I)	অক্সিজেন (O) সালফার (S) কার্বন (C)	নাইট্রোজেন (N) ফসফরাস (P)	কার্বন (C) সালফার (S)
ধাতু (মৌল)	সোডিয়াম (Na) পটাশিয়াম (K) কপার (Cu) (আস) সিলভার (Ag) গোল্ড (Au) (আস)	ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ক্যালসিয়াম (Ca) আয়রন (Fe) (আস) কপার (Cu) (ইক) জিঙ্ক (Zn) চিন (Sn) (আস) লেড (Pb) (আস)	অ্যালুমিনিয়াম (Al) আয়রন (Fe) (ইক) গোল্ড (Au) (ইক)	চিন (Sn) (ইক) লেড (Pb) (ইক)
যৌগমূলক	অ্যামোনিয়াম (NH_4^+) হাইড্রোক্সিল (OH^-) নাইট্রাইট (NO_2^-) নাইট্রেট (NO_3^-) হাইড্রোজেন কার্বনেট (HCO_3^-)	কার্বনেট (CO_3^{2-}) সালফাইট (SO_3^{2-}) সালফেট (SO_4^{2-})	ফসফেট (PO_4^{3-})	

ছকে উল্লেখিত SO_4^{2-} , CO_3^{2-} , NO_3^- , NH_4^+ ইত্যাদি পরমাণুগুচ্ছ স্বাধীনভাবে থাকে না। মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মতো যৌগ গঠনে অংশ নেয়। এ জাতীয় পরমাণুগুচ্ছকে যৌগমূলক বা রায়ডিকেল বলে।
যৌগের আণবিক সংকেত লেখার ক্ষেত্রে যে সকল নিয়ম অনুসরণ করা হয় তা নিম্নরূপ :

- (১) যৌগে উভয় মৌল বা যৌগমূলকের যোজনী একই হলে এক্ষেত্রে সংকেতে যোজনী লেখার প্রয়োজন হয় না। শুধু মৌল কিংবা মূলকগুলো পাশাপাশি লিখলেই চলে। যেমন : CaO (ক্যালসিয়াম অক্সাইড), NH_4Cl (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড), NH_4NO_3 (অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট) ইত্যাদি।
- (২) উভয় মৌলের কিংবা উভয় মূলকের যোজনী কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার গুণিতক হলে ঐ সংখ্যা দিয়ে যোজনীকে ভাগ করে বিনিময় করে লিখতে হয়। যেমন- কার্বন ডাইঅক্সাইড এর ক্ষেত্রে $\text{C}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{CO}_2$, এখানে কার্বন ও অক্সিজেনের যোজনী যথাক্রমে ১ এবং ২।
- (৩) উভয় মৌলের কিংবা উভয় মূলকের যোজনী ভিন্ন এবং গুণিতক না হলে, অর্থাৎ A মৌলের যোজনী x এবং B মৌলের যোজনী y হলে A ও B মৌল দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেতটি হবে AyBx । A মৌলের যোজনী সংখ্যা B মৌলের ডানপাশে সামান্য নিচে ছোট করে এবং B মৌলের যোজনী সংখ্যা A মৌলের ডানপাশে নিচের দিকে ছোট করে লিখতে হয়। যেমন- অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3)

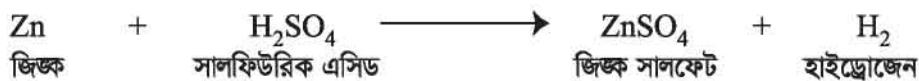
পাঠ ৩ ও ৪ : রাসায়নিক সমীকরণ

যেকোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিবরণ দিতে হলে আমাদের রাসায়নিক সমীকরণ সম্বলে ধারণা থাকা অপরিহার্য। একটি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়। এক অংশে বিক্রিয়ক পদার্থ এবং অন্য অংশে বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নতুন পদার্থ থাকে। যেমন-



বিক্রিয়ক পদার্থ হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংষ্টটনের পূর্বাবস্থা এবং বিক্রিয়জাত পদার্থ হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংষ্টটনের শেষ বা পরবর্তী অবস্থা। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো পরমাণু ধ্বংস বা নতুন করে সৃষ্টি হয় না, পরমাণুর শুধু পুনর্বিন্যাস ঘটে। অতএব বিক্রিয়ার পূর্বে বিভিন্ন বিক্রিয়ক পদার্থে যতগুলো পরমাণু থাকে বিক্রিয়ার পরে বিভিন্ন বিক্রিয়জাত পদার্থেও ততগুলো পরমাণু থাকে। ফলে বিক্রিয়ক দ্রব্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পরমাণু সংখ্যার সমতা বিরাজ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়কদ্রব্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যকে প্রতীক, সংকেত ও কতগুলো চিহ্নের (+, → বা =) সাহায্যে সংক্ষেপে প্রকাশ করা কে রাসায়নিক সমীকরণ বলে। যেমন:



রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়মগুলো নিম্নরূপ-

- (১) রাসায়নিক সমীকরণে বিক্রিয়ক পদার্থ বা পদার্থগুলোর স্ব স্ব প্রতীক বা সংকেত সমীকরণটির তীর চিহ্নের (→) বামদিকে লিখতে হয়। বিক্রিয়জাত পদার্থ বা পদার্থগুলোর স্ব স্ব প্রতীক বা সংকেত সমীকরণটির তীর চিহ্নের (→) ডান দিকে লিখতে হয়।
- (২) বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়জাত পদার্থ একাধিক হলে তাদের সংকেতের মধ্যে যোগ চিহ্ন (+) দেওয়া হয়।
- (৩) কোনো পদার্থের অণুর সংখ্যা একাধিক হলে অণুর সংকেতের আগে সেই সংখ্যা লেখা হয়।
- (৪) বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়জাত পদার্থগুলোর মধ্যে তীর চিহ্নের পরিবর্তে সমান চিহ্ন ও (=) বসানো যায়। তবে এক্ষেত্রে উভয়পক্ষের পরমাণুর সমতাকরণ প্রয়োজন।
- (৫) বিক্রিয়ার আগে বিভিন্ন পদার্থের অণুর মধ্যে যত সংখ্যক বিভিন্ন মৌলের পরমাণু থাকে, বিক্রিয়ার পরে গঠিত নতুন অণুগুলোর মধ্যে ঠিক তত সংখ্যক বিভিন্ন মৌলের পরমাণু থাকতে হবে। তাই সমীকরণের উভয় পক্ষে মৌলের পরমাণু সংখ্যার সমতা আনার জন্য প্রতীক ও সংকেতগুলোকে প্রয়োজনীয় সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয়।

রাসায়নিক সমীকরণের সমতাকরণ

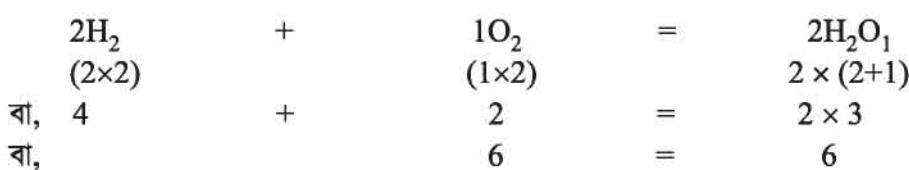
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় পানি উৎপন্ন হয়। সুতরাং সমতা চিহ্নের বামদিকে বসবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অণুর সংকেত এবং ডানদিকে বসবে বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন পদার্থ পানির অণুর সংকেত। সুতরাং বিক্রিয়াটিকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়-



কিন্তু বিক্রিয়ার আগে যত সংখ্যক H পরমাণু এবং O পরমাণু থাকে বিক্রিয়ার পরেও বিক্রিয়াজাত পদার্থে তত সংখ্যক H এবং O পরমাণু থাকা উচিত। তাই বিক্রিয়ার সমতা স্থাপনের জন্য H_2 অণু, O_2 অণু ও H_2O অণুর সংখ্যা এবং সমীকরণ হবে নিম্নরূপ-



এই সমীকরণ থেকে বিক্রিয়ার পূর্বে এবং বিক্রিয়ার পরে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মোট পরমাণুর সংখ্যা গণনা করা যায়। বোধার সুবিধার্থে উপরের সমীকরণটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হলো-



সুতরাং উপরের সমীকরণে বিক্রিয়ার আগের পরমাণুর সংখ্যা এবং বিক্রিয়ার পরের পরমাণুর সংখ্যা সমান।

পাঠ ৫ : রাসায়নিক বিক্রিয়া ; সংযোজন (Addition)

কাজ : সংযোজন বিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : টেস্টটিউব, মর্টার, স্পিরিট ল্যাম্প বা বার্নার, লোহার গুড়া, সালফার, নিষ্ঠি

পদ্ধতি : টেস্টটিউবটি ভালো করে ধূয়ে শুকিয়ে নাও। ৭ গ্রাম লোহার গুড়া ও ৪ গ্রাম সালফার (সমানুপাতিক হারে ভিন্ন পরিমাণও নেওয়া যায়) নিষ্ঠি দিয়ে মেঘে মর্টারে নাও ও খুব ভালোভাবে পিষে নাও এবং তারপর শুকনা টেস্টটিউবে ঢেলে দাও। এবার স্পিরিট ল্যাম্প বা বার্নার দিয়ে টেস্টটিউবের তলায় তাপ দিতে থাক। তাপ দেওয়ার সময় খেয়াল রাখ যেন আগুনের শিখা ছোট হয়। তাপ দিতে দিতে টেস্টটিউবের মিশ্রণটি যখন রক্তিমান মতো হবে তখন তাপ দেওয়া বন্ধ কর। টেস্টটিউবটি মর্টারের উপরে ধরে রাখ যেন এটি ভেঙ্গে গেলেও টেস্টটিউবের ভিতরের বস্তু নষ্ট না হয়ে যায়। অতঃপর টেস্টটিউবটি ঠাণ্ডা কর ও ভেঙ্গে ভিতরের বস্তুটিকে আলাদা কর।

টেস্টটিউব থেকে যে বস্তুটি পেলে তা দেখতে গাঢ় ধূসর বর্ণের। তোমরা এতে হালকা হলুদ রঞ্জের সালফার বা লোহার (আয়রন) গুড়া কোনোটিই দেখতে পাচ্ছ না, কারণ এখানে আয়রন ও সালফার একে অপরের সাথে মিলে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থ ফেরাস সালফাইড তৈরি করেছে।



এ ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন যেখানে একের অধিক পদার্থ একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন একটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে। একইভাবে জিংক ও সালফারের বিক্রিয়ায় জিংক সালফাইড তৈরির বিক্রিয়াও সংযোজন বিক্রিয়া।



এখানে উল্লিখিত দুটি বিক্রিয়াকেই মৌল থেকে যৌগ তৈরির সংযোজন বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। তবে দুটি যৌগ যুক্ত হয়েও কিছু সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন আরেকটি যৌগ তৈরি হতে পারে। যেমন—অ্যামোনিয়ার সাথে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সংযোজনে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।



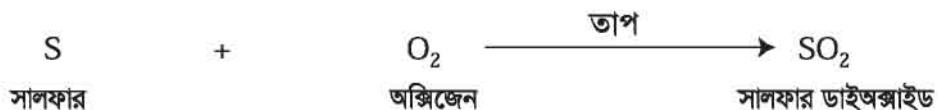
পাঠ ৬ ও ৭ : দহন বিক্রিয়া (Combustion reaction)

কাজ : সালফার ও অক্সিজেনের দহন বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি লম্বা হাতলযুক্ত দহন চামচ, কিছু সালফার, স্পিরিট ল্যাম্প বা বার্নার

পদ্ধতি : তোমরা দহন চামচে কিছু সালফার নাও। স্পিরিট ল্যাম্প বা বার্নার দিয়ে চামচটিতে তাপ দিতে থাক। কী দেখতে পাচ্ছ?

প্রথমে সালফার গলে গেল তারপর নীল আগনের শিখা দেখতে পাচ্ছ এবং ঝাঁঝালো গুরু পেয়েছ। কারণ তাপ দেওয়ার ফলে সালফার বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে সালফার ডাইঅঙ্গাইড গ্যাস তৈরি করেছে যার জন্য তোমরা ঝাঁঝালো গুরু পেয়েছ।

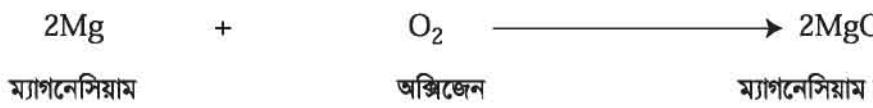


কাজ : ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেনের দহন বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ম্যাগনেসিয়াম রিবন, চিমটা আঁটা, লাইটার, স্পিরিট ল্যাম্প/ বুনসেন বার্নার

পদ্ধতি : ম্যাগনেসিয়াম রিবনের একটি ছোট টুকরার (৮ সেন্টিমিটার) একমাত্রা চিমটা দিয়ে ধরো। ঢোকে নিরাপত্তা চশমা পরে নাও। রিবনের অন্য মাথাটি বুনসেন বার্নারের শিখার উপর ধরো। লাইটার দিয়েও এটি করা যায়। খুব ভালোভাবে লক্ষ কর কী ঘটছে?

রিবনে আগুন ধরে গেল এবং অত্যন্ত প্রজ্বলিত শিখাসহ জ্বলতে লাগল। এর কারণ হলো ম্যাগনেসিয়াম বাতাসের অক্সিজেনে দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে পুড়তে থাকে আর তোমরা প্রজ্বলিত শিখা দেখতে পাও। এভাবে যখন সমস্ত ম্যাগনেসিয়াম পুড়ে শেষ হয়ে যায়, তখন আপনা আপনি শিখা নিতে যায়। শেষে তোমরা ছাই এর মতো কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? এটি আসলে ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেন পুড়ে তৈরি হওয়া ম্যাগনেসিয়াম অঙ্গাইড।



কাজ : মোমের দহন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : মোমবাতি, দিয়াশলাই

পদ্ধতি : দিয়াশলাই দিয়ে মোমবাতি ঝালাও। খুব ভালোভাবে খেয়াল কর কী ঘটছে? সময়ের সাথে সাথে মোমবাতির আকার ছোট হয়ে যাচ্ছে। বলোতো এর কারণ কী? মোমবাতি ঝালানোর ফলে উৎপন্ন তাপে মোম গলে যাচ্ছে। এই গলিত মোমের ছোট একটি অংশ ঠাণ্ডা হয়ে মোমের গা বেয়ে নিচে পড়ছে কিন্তু বেশিরভাগ অংশই সলতের মধ্য দিয়ে উপরে উঠে উৎপন্ন তাপে বাঞ্ছীভূত হচ্ছে। এই বাঞ্ছীভূত মোম দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুর অঙ্গিজনের সাথে বিক্রিয়া করছে। এর ফলে তাপ ও আলোকশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে।

পাঠ ৮ ও ৯ : প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Substitution or displacement reaction)

কাজ : লোহা ও তুঁতের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : লোহার গুড়া, তুঁতে, পানি, টেস্টটিউব

পদ্ধতি : টেস্টটিউবের চার ভাগের এক ভাগ পানি নাও। কিছু তুঁতে যোগ করে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে তুঁতের দ্রবণ তৈরি কর। এবার তুঁতের নীল দ্রবণে কিছু লোহার গুড়া যোগ করে ভালোভাবে ঝাঁকাও। কোনো পরিবর্তন দেখতে পাছ কি? দ্রবণের নীল রং আস্তে আস্তে হালকা সবুজ হয়ে যাচ্ছে আর তামার ছোট ছোট কণা টেস্টটিউবের তলায় জমতে শুরু করেছে। নীল দ্রবণ কেন হালকা সবুজ হলো?

এখানে লোহার গুড়া (আয়রন) ও কপার সালফেটের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে। ফলে ফেরাস সালফেট ও কপার তৈরি হয়েছে। উৎপন্ন ফেরাস সালফেটের রং হালকা সবুজ বলেই দ্রবণের রং নীল থেকে হালকা সবুজ হলো।



এখানে লোহা, কপার সালফেট থেকে কপারকে সরিয়ে নিজে ঐ স্থান দখল করে ফেরাস সালফেট তৈরি করেছে। এ সকল বিক্রিয়া যেখানে একটি মৌল কোনো যোগ থেকে অপর একটি মৌলকে সরিয়ে নিজে ঐ স্থান দখল করে নতুন যোগ তৈরি করে তাকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলে।

তোমরা এখন তুঁতের দ্রবণে জিংক বা দস্তা, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি যোগ করে দেখ কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে।

বিয়োজন বিক্রিয়া (Decomposition reaction)

কাজ : চুনা পাথরের বিয়োজন বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

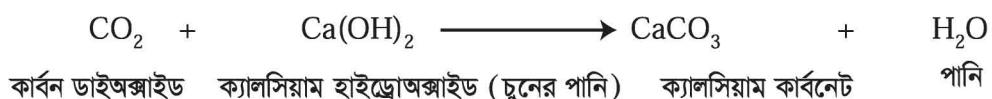
প্রয়োজনীয় উপকরণ : চুনা পাথর, স্পেচুলা বা চামচ, টেস্টটিউব, নির্গমন নল, বুনসেন বার্নার বা স্পিরিট ল্যাঙ্ক, ক্ল্যাঙ্ক, স্ট্যান্ড, কর্ক ও হাতমোজা

পদ্ধতি : হাতমোজা পরে স্পেচুলা বা চামচ দিয়ে প্রায় ৫ গ্রাম চুনাপাথর টেস্টটিউবে নাও। এবার স্পিরিট ল্যাঙ্ক বা বুনসেন বার্নার দিয়ে তাপ দিতে থাক। খুব ভালোভাবে খেয়াল কর কী ঘটছে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে টেস্টটিউবে নেওয়া চুনাপাথর তাপ দেওয়ার ফলে বিয়োজিত হয়ে বা ভেজে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও ক্যালসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে।

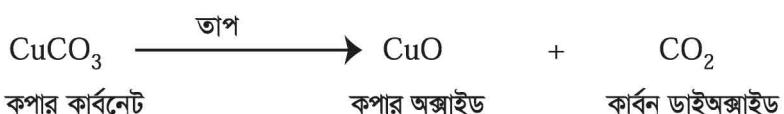


গ্যাসটি কার্বন ডাইঅক্সাইড কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পার। অপর একটি টেস্টটিউবে ১-২ মিলিলিটার স্বচ্ছ চুনের পানি নিয়ে একটি নির্গমন নল প্রথম টেস্টটিউবের সাথে লাগাও। দেখবে চুনের পানি ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। অর্ধাং উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্বিতীয় টেস্টটিউবে (নির্গমন নলের মাধ্যমে) যাওয়ার ফলে সেখানে চুনের পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়া করে আবার ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরি হওয়ায় চুনের পানি ঘোলা হয়ে যাচ্ছে।



নিম্নে বিয়োজন বিক্রিয়ার আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

কপার কার্বনেটকে তাপ দিলে তা ভেজে কপার অক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।



পক্ষান্তরে পটাশিয়াম ক্লোরেটকে তাপ দিলে এটি বিয়োজিত হয়ে পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।



চিত্র ৮.১ : বিয়োজন

এ সকল বিক্রিয়ার মতো যে সকল বিক্রিয়ায় একটি যৌগ ভেজে একাধিক মৌল বা যৌগ উৎপন্ন হয় তাদেরকে বিয়োজন বিক্রিয়া বলে।

পাঠ ১০ ও ১১ : রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তির রূপান্তর

তোমরা মোম জ্বালালে কী ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় তা জেনেছ। এবার বলোতো এখানে কোনো ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটছে কি? জ্বলন্ত মোমের কাছাকাছি হাত নিলে হাতে গরম লাগে। আবার অন্ধকারে মোম জ্বালালে আমরা এর আশেপাশে দেখতে পাই। তাহলে একথা বলা যায় যে, মোম জ্বালানোর ফলে তাপশক্তি উৎপন্ন হয় বলেই হাতে গরম লাগে আর আলোক শক্তি উৎপন্ন হয় বলেই অন্ধকারে মোম জ্বালালে আমরা এর আশেপাশের জিনিস দেখতে পাই। মোম একটি রাসায়নিক বস্তু। একে পোড়ালে এতে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি পরিবর্তিত হয়ে তাপশক্তি ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। একইভাবে গ্যাসের চুলায় গ্যাস জ্বালালেও

গ্যাসে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি পরিবর্তিত হয়ে প্রচুর তাপশক্তি ও আলোক শক্তি উৎপন্ন করে। উৎপন্ন তাপশক্তি দিয়েই আমরা রান্নাবান্নার কাজ করি।

তাহলে আমরা দেখলাম যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির বৃপ্তির ঘটে।

কাজ : খাবার সোডা ও লেবুর রসের বিক্রিয়া

প্রয়োজনীয় উপকরণ : খাবার সোডা বা বেকিং সোডা, টেস্টচিটিভ, লেবুর রস, ড্রপার

পদ্ধতি : টেস্টচিটিভে কিছু খাবার সোডা নাও। ড্রপার দিয়ে আস্তে আস্তে লেবুর রস টেস্টচিটিভে যোগ কর। কী দেখতে পাচ্ছ? গ্যাসের বুদবুদ উঠছে? ইঁহা, প্রচুর গ্যাসের বুদবুদ উঠছে। টেস্টচিটিভের তলায় স্পর্শ করে দেখ হাতে ঠাণ্ডা লাগে কি?

লেবুর রসে থাকে প্রচুর সাইট্রিক এসিড যা বেকিং সোডার সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম সাইট্রেট, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও পানি তৈরি করে। আমরা যে বুদবুদ দেখি তা কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া আর কিছুই নয়।

বেকিং সোডা + সাইট্রিক এসিড \longrightarrow সোডিয়াম সাইট্রেট + কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি

টেস্টচিটিভ স্পর্শ করলে ঠাণ্ডা লাগার কারণ কী? কারণ হলো এই বিক্রিয়ায় তাপশক্তি হ্রাস পায়। তা না হলে ঠাণ্ডা লাগত না।

এখন তোমরা বেকিং সোডার সাথে লেবুর রসের বদলে ভিনেগার বা এসিটিক এসিড যোগ করে দেখ কী ঘটে?

কাজ : চুন ও ভিনেগারের রাসায়নিক বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

উপকরণ : চুন, ভিনেগার, বিকার, হাতমোজা, ড্রপার

পদ্ধতি : হাতমোজা পরে কিছু চুন বিকারে নাও। এবার এতে ড্রপার দিয়ে আস্তে আস্তে ভিনেগার যোগ কর। বিকারটি হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখ। গরম লাগছে? কারণ কী? এখানে চুনের সাথে ভিনেগারের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম এসিটেট ও পানি তৈরি হচ্ছে আর প্রচুর তাপশক্তি ও উৎপন্ন হচ্ছে। উৎপন্ন তাপের কারণেই বিকার স্পর্শ করলে গরম লাগছে।



এখানে চুন হলো ক্ষারীয় পদার্থ ও এসিটিক এসিড হলো অমুদ্ধমী পদার্থ আর উৎপাদিত ক্যালসিয়াম এসিটেট হলো নিরপেক্ষ পদার্থ। এ জাতীয় বিক্রিয়ায় যেখানে বিপরীতধর্মী পদার্থ একে অপরের সাথে বিক্রিয়া করে নিরপেক্ষ পদার্থ তৈরি করে তাকে প্রশমন বিক্রিয়া (Neutralization reaction) বলে।

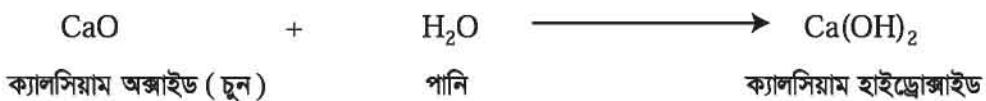
এখন তোমরা চুনে ভিনেগারের বদলে লেবুর রস দিয়ে দেখ কী ধরনের বিক্রিয়া ঘটে?

কাজ : চুনের সাথে পানির বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : চুন, পানি, বিকার, হাতমোজা, স্পেচুলা, ড্রপার

পর্যবেক্ষণ : ৫ গ্রাম (ভিন্ন পরিমাণে নেওয়া যেতে পারে) চুন বিকারে নাও। ড্রপার দিয়ে ৪০ গ্রাম পানি আস্তে আস্তে যোগ কর। হাতমোজা পরে বিকার স্পর্শ কর। পানি যোগ করার পর কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ?

বিকার অনেক বেশি গরম হয়ে যাচ্ছে আর বিকারের মিশ্রণটি পানি ফুটানোর সময় যে রকম টগবগ করে অনেকটা সেরকম করছে। এখানে চুলে পানি যোগ করার ফলে, চুন ও পানির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয়।



উৎপন্ন $\text{Ca}(\text{OH})_2$ স্যাক লাইম নামেই বেশি পরিচিত। এই বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি উৎপন্ন হয় যার ফলে পানি ফুটতে থাকে। স্যাক লাইম বা $\text{Ca}(\text{OH})_2$ পানিতে খুব অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। আর পানিতে $\text{Ca}(\text{OH})_2$ এর সম্পৃক্ষে দ্রবণকেই চুনের পানি বা লাইম ওয়াটার বলা হয়।

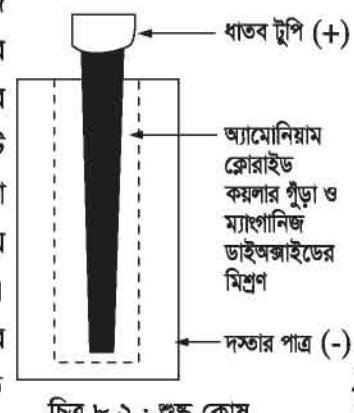
উপরের পরীক্ষাতে তোমরা যে সাসপেনসনটি পেলে তা কিছুক্ষণ রেখে দাও। উপরে পরিষ্কার পানির মতো যে অংশটি দেখা যাচ্ছে সেটিই কিন্তু চুনের পানি।

পাঠ ১২-১৪ : শুষক কোষ (Dry cell)

ଆମରା ଟାର୍ଟ ଲାଇଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ରିମୋଟ କନ୍ଟ୍ରୋଲାର, ନାନା ରକମ ଖେଳନା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରେ ସେ ବ୍ୟାଟାରି ବ୍ୟବହାର କରି ଏଗୁଳୋକେ ଡ୍ରାଇସେଲ ବା ଶୁଷ୍କ କୋଷ ବଲେ ।

তোমরা কি জানো, এই শুষ্ক কোষ কীভাবে তৈরি করা হয় ?

প্রথমে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) , কয়লার গুড়া এবং ম্যাংগানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2) ভালোভাবে মিশিয়ে তাতে অল্প পরিমাণ পানি যোগ করে একটি পেস্ট বা লেই তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণটি সিলিন্ডার আকৃতির দস্তার চোঙে নিয়ে তার মধ্যে একটি কার্বন দণ্ড এমনভাবে বসানো হয় যাতে দণ্ডটি দস্তার চোঙকে স্পর্শ না করে। কার্বন দণ্ডের মাথায় একটি ধাতব টুপি পরানো থাকে। শুষ্ক কোষের উপরের অংশ কার্বন দণ্ডটির চারপাশ পিচের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। দস্তার চোঙটিকে একটি শক্ত কাগজ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এখনে দস্তার চোঙ খণ্ডাক তড়িৎধার বা অ্যানোড হিসেবে কাজ করে আর ধাতব টুপি দিয়ে ঢাকা কার্বন দণ্ডের উপরিভাগ ধনাত্মক তড়িৎধার বা ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে। এখন আমরা দেখে নিই কীভাবে শুষ্ক কোষ কাজ করে।



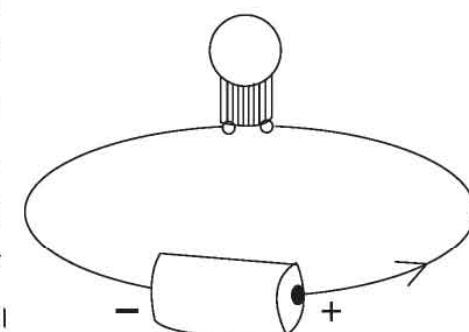
ପିଲ୍ ୧୨ : ଅଳ୍ପ କୋଷ

কাজ : শুষক কোষ দিয়ে তড়িৎ বর্তনী তৈরি করে শক্তির রূপান্তর দেখা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি বৈদ্যুতিক বাল্ব, ১টি শুষক কোষ, ২টি তামার তার

পদ্ধতি : ১টি তামার তারের এক প্রান্ত শুষক কোষের অ্যানোড ও অপর তামার তারটি ক্যাথোডের সাথে যুক্ত কর। এবার চিত্রের মতো করে বৈদ্যুতিক বাল্বের সাথে তার দুটি সংযোগ দাও। বাল্বটি ঝলে উঠল। কারণ হলো এখানে তামার তারের মাধ্যমে বাল্ব ও কোষের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক সার্কিট তৈরি হয়ে গেল।

এখানে কী ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটল? বর্তনী তৈরি হওয়ার ফলে বাল্ব ঝলছে এবং তা আলোক শক্তি দিচ্ছে। এই আলোক শক্তি হচ্ছে কোষের রাসায়নিক শক্তির একটি রূপ। আর কোষের শক্তির উৎস হলো এখানে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ অর্থাৎ দস্তা, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, কয়লার গুড়া ও ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড। তাহলে বলা যায় যে, এই সকল রাসায়নিক পদার্থের সংশ্লিষ্ট শক্তিই রূপান্তরিত হয়ে আলোক শক্তি উৎপন্ন করছে। অর্থাৎ এখানে রাসায়নিক শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।



চিত্র ৮.৩ : শুষক কোষের বর্তনী

তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis)

কাজ : তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ব্যাটারি, তামার তার (দুটি), দুটি জিংক

দঙ্গ (তড়িৎধার), পানি, লবণ, একটি কাচ পাত্র জিংক তড়িৎধার

পদ্ধতি : কাচ পাত্রে ৩০০ মিলিলিটার পানি নিয়ে

(অ্যানোড)

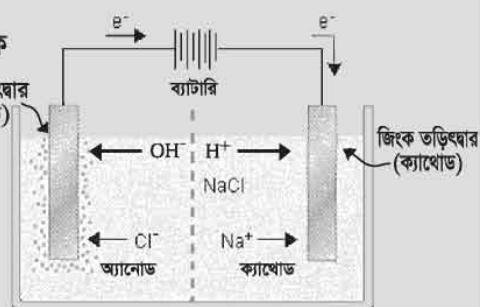
৩০ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ যোগ করে

ভালোভাবে নাড়া দাও। এবার জিংক দঙ্গ দুটি চিত্র

অনুযায়ী তামার তার দিয়ে ব্যাটারির সাথে সংযুক্ত

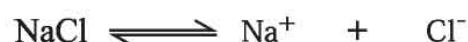
কর। জিংক দঙ্গের দিকে ভালো করে লক্ষ কর।

উভয় দঙ্গের গায়ে গ্যাসের বুদবুদ দেখতে পাচ্ছ কি?



চিত্র ৮.৪ : তড়িৎ বিশ্লেষণ

ইঁয়া, এর কারণ হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে ধনাত্মক সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও ঋণাত্মক ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) উৎপন্ন হয়।



একইভাবে দ্রবণে পানি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রোক্সিল আয়ন উৎপন্ন করে।



ব্যাটারির সাথে সংযোগ দিয়ে দ্রবীভূত লবণের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে হাইড্রোক্সিল আয়ন ও ক্লোরাইড আয়ন অ্যানোডের দিকে অগ্রসর হয়। ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) অ্যানোডে গিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2) উৎপন্ন করে। তাই আমরা অ্যানোডে গ্যাসের বুদবুদ দেখতে পাই। অন্যদিকে সোডিয়াম আয়ন ও হাইড্রোজেন আয়ন ক্যাথোডের দিকে অগ্রসর হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ক্যাথোডে গিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাস (H_2) উৎপন্ন করে যার ফলে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ দেখা যায় ও দ্রবণে সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) থেকে যায়।



সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের মধ্যদিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে অ্যানোডে ক্লোরিন গ্যাস, ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে যায়।

যে সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত বা বিগলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে এবং তড়িৎ প্রবাহের ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে অন্য পদার্থে পরিণত হয় তাদেরকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য (Electrolyte) বলে।

সব পদার্থ তড়িৎ প্রবাহের ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না। যে সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত বা বিগলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে না ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়াও করে না, তাদেরকে তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ বলে। যেমন- চিনি, ঘুঁকোজ ইত্যাদি।

নতুন শব্দ : যোজনী, যৌগমূলক, সংযোজন, দহন, প্রতিস্থাপন, প্রশমন, অ্যানোড, ক্যাথোড, তড়িৎ বিশ্লেষণ, তড়িৎ বিশ্লেষ্য, স্ল্যাক লাইম

এই অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম—

- সংযোজন বিক্রিয়ায় একের অধিক পদার্থ একত্রিত হয়ে একটি নতুন পদার্থ তৈরি করে।
- দহন বিক্রিয়ায় একটি পদার্থ বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে পুড়ে প্রচুর তাপশক্তি ও আলোক শক্তি উৎপন্ন করে
- প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় একটি মৌল কোনো যৌগ থেকে অপর একটি মৌলকে প্রতিস্থাপিত করে নতুন পদার্থ তৈরি করে।
- যে বিক্রিয়ায় একটি যৌগ ভেঙে একের অধিক নতুন পদার্থে পরিণত হয় তাকে বিযোজন বিক্রিয়া বলে।
- প্রশমন বিক্রিয়ায় বিপরীতধর্মী পদার্থ বিক্রিয়া করে একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করে নিরপেক্ষ পদার্থ উৎপন্ন করে। দহন বিক্রিয়ায় সাধারণত রাসায়নিক শক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্বিত হয়।

- রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর ঘটে।
- শুষক কোষ ব্যবহার করলে রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরিত হয়ে আলোক শক্তি বা অন্য কোনো শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- যে সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে তাদেরকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে।
- যে সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে না তাদেরকে তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ বলে।
- মৌলের যোজনীর সংখ্যা অনুযায়ী মৌলগুলো একে অন্যের সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে যোগ গঠন করে।
- রাসায়নিক সমীকরণে পদার্থগুলো সমীকরণটির তীর চিহ্নের বামদিকে এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলো তীর চিহ্নের ডানদিকে হবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. রাসায়নিক বিক্রিয়ায় _____ সৃষ্টি হয়।
২. ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরির বিক্রিয়া একটি _____ বিক্রিয়া।
৩. দহন বিক্রিয়ায় _____ শক্তি উৎপন্ন হয়।
৪. শুষক কোষে দস্তার চোঙ _____ হিসেবে কাজ করে।
৫. হাইড্রোক্লোরিক এসিড তড়িৎ _____ পদার্থ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দহন বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দাও।
২. প্রশমন বিক্রিয়া কী তা ব্যাখ্যা কর।
৩. চুনে পানি যোগ করলে কী ঘটে ব্যাখ্যা কর।
৪. শুষক কোষের গঠন সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা কর।
৫. তড়িৎ বিশ্লেষ্য ও তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থের মূল পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি স্থায়ক লাইম?

- | | | | |
|----|-----------------|----|-------------------|
| ক. | CaO | খ. | CaCO_3 |
| গ. | CaCl_2 | ঘ. | Ca(OH)_2 |

২. একজন ডুরুরি নিচের কোন যোগটির বিয়োজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে অঙ্গিজেন পায়?

- | | | | | |
|----|----|-----------------|----|------------------------|
| ১০ | ক. | CaCO_3 | খ. | CuCO_3 |
| ১১ | গ. | KClO_3 | ঘ. | NH_4Cl |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

স্বপ্না ল্যাবরেটরিতে একটি বিকারে কিছু চুন নিল। অতঃপর এর মধ্যে ড্রপার দিয়ে ভিনেগার যোগ করল।
কিছুক্ষণ পর সে বিকারটি হাত দিয়ে স্পর্শ করে তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ করল।

৩. বিকারে উল্লেখিত যৌগের মধ্যে কোন ধরনের বিক্রিয়া ঘটবে?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. দহন | খ. প্রশমন |
| গ. সংযোজন | ঘ. প্রতিস্থাপন |

৪. উদ্দীপকে উল্লেখিত যৌগের মধ্যে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হবে-

- i. ক্যালসিয়াম এসিটেট
- ii. ক্যালসিয়াম কার্বনেট
- iii. পানি

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. ফাহাদ ও ফারহান কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটালো, বিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ :

- i. কার্বন + অক্সিজেন $\xrightarrow{\text{তাপ}}$
- ii. চুনাপাথর $\xrightarrow{\text{তাপ}}$
- iii. হাইড্রোজেন + অক্সিজেন \longrightarrow
- iv. জিঙ্ক + সালফিটেরিক এসিড \longrightarrow
- ক. খাবার সোডার সংকেত কী?
- খ. ii নং বিক্রিয়াটি কী ধরনের বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকের যে বিক্রিয়ায় মৌলিক গ্যাস উৎপন্ন হয় সেটি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. i ও iii নং বিক্রিয়া দুটি সংযোজন হলেও এদের মধ্যে ভিন্নতা আছে বিশ্লেষণ কর।

২. রিতা তার পুতুলে ব্যাটারির সংযোগ দিয়ে পুতুল নাচ দেখছিল। এমন সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় ওর ছেট বোন ঐশ্বরী একটি মোম জ্বালিয়ে আনল।

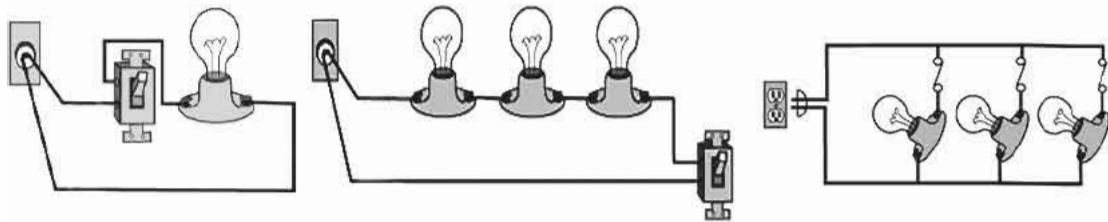
- ক. প্রশমন বিক্রিয়া কী?
- খ. লাইম ওয়াটার বলতে কী বোঝায়?
- গ. রিতার পুতুলে ব্যবহৃত ব্যাটারির গঠন ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পুতুল ও মোমবাতিতে শক্তির কী ধরনের রূপান্তর ঘটে? বিশ্লেষণ কর।

প্রজেক্ট : তোমরা নিজেরা ৪-৫ জনের গুপ্ত তৈরি করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে
জড়িত অস্তত ৫টি রাসায়নিক বিক্রিয়া খুঁজে বের কর। এ সকল বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর ঘটে কিনা চিন্তা ১০
কর। শক্তির রূপান্তর ঘটলে কী ধরনের রূপান্তর ঘটে তার উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর। ১১

নবম অধ্যায়

বর্তনী ও চলবিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ প্রবাহ হলো মূলত ইলেক্ট্রনের প্রবাহ। এ প্রবাহ আবার দু'রূপ- এসি এবং ডিসি প্রবাহ। কোনো বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের জন্য দরকার এর দু'পাঞ্চের বিভিন্ন পার্থক্য। এই বর্তনীতে তড়িৎবন্ধ ও উপকরণসমূহকে শ্রেণি ও সমান্তরাল সংযোগ মুক্ত করা যায়। এছাড়া বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ মাপার জন্য অ্যামিটার বা যেকোনো দু'পাঞ্চের বিভিন্ন পার্থক্য মাপার জন্য দরকার ভোল্টমিটার।



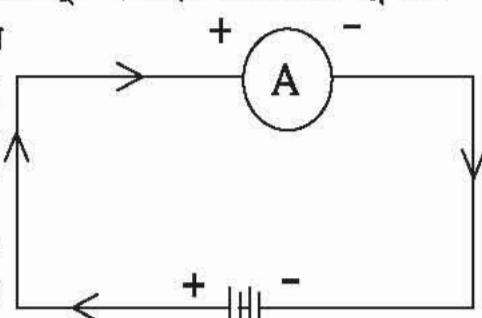
এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- এসি এবং ডিসি প্রবাহের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তড়িৎ বর্তনীতে রোধ, ফিল্ড এবং চাবির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তড়িৎ প্রবাহ এবং বিভিন্ন পার্থক্যের মধ্যকার সম্পর্ক লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শ্রেণি ও সমান্তরাল বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ এবং বিভিন্ন পার্থক্যের ভিন্নতা প্রদর্শন করত পারব;
- তড়িৎ প্রবাহ এবং বিভিন্ন পার্থক্য পরিমাপে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সঠিক ব্যবহার করতে পারব;
- তড়িতের কার্যকর ব্যবহার এবং অপচয় রোধে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

পাঠ ১ : তড়িৎ প্রবাহ

দৃটি ভিন্ন বিভিন্নের ধাতব বস্তুকে যখন পরিবাহী তার দ্বারা মুক্ত করা হয় তখন তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। আধুনিক ইলেক্ট্রন তত্ত্ব থেকে আমরা জানি প্রত্যেক ধাতব পদার্থে কিছু মুক্ত ইলেক্ট্রন থাকে, যারা ঐ পদার্থের মধ্যে মুক্তভাবে ঘূরে বেড়াতে পারে। যখন দৃটি ভিন্ন বিভিন্নের ধাতব বস্তুকে তার দ্বারা সংযুক্ত করা হয়, তখন নিম্ন বিভবসম্পন্ন ধাতব বস্তু থেকে খণ্ডাত্মক আধানযুক্ত ইলেক্ট্রন উচ্চ বিভবসম্পন্ন ধাতব বস্তুর দিকে প্রবাহিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ধাতব বস্তুর মধ্যে বিভব

পার্থক্য বর্তমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত খণ্ডাত্মক আধানের এই প্রবাহ চলে। কোনোভাবে যদি ধাতব বস্তুসম্মের মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য বজায় রাখা যায় তখন এই প্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। খণ্ডাত্মক আধান বা ইলেক্ট্রনের এই প্রবাহের জন্যই তড়িৎ প্রবাহিত হয়। মূলত কোনো পরিবাহীর যেকোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাই হলো তড়িৎ প্রবাহ।



চিত্র ৯.১ : বিদ্যুৎ বর্তনী

তড়িৎ প্রবাহের একক : তড়িৎ প্রবাহের একক হলো অ্যাম্পিয়ার। একে সাধারণত A দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

তড়িৎ বিভব পার্থক্য

প্রতি একক আধানকে তড়িৎক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তর করতে সম্পন্ন কাজের পরিমাণ হলো ঐ বিন্দুর তড়িৎ বিভব পার্থক্য। দুটি বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য না থাকলে তড়িৎ প্রবাহিত হবে না। ফলে কোনো আধান প্রবাহিত হবে না এবং কোনো কাজও সম্পন্ন হবে না।

পাঠ ২ ও ৩ : তড়িৎ প্রবাহের প্রকারভেদ

তড়িৎ প্রবাহ দুই প্রকার— (ক) অপর্যায়বৃত্ত প্রবাহ বা সমপ্রবাহ বা একমুখী প্রবাহ (খ) পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ বা পরিবর্তী প্রবাহ।

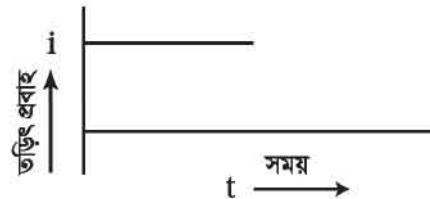
(ক) অপর্যায়বৃত্ত বা একমুখী বা ডিসি প্রবাহ

যখন সময়ের সাথে সাধারণত তড়িৎ প্রবাহের দিকের কোনো পরিবর্তন না ঘটে, অর্থাৎ যে তড়িৎ প্রবাহ সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয়, সেই প্রবাহকে অপর্যায়বৃত্ত প্রবাহ বলে।

তড়িৎ কোষ বা ব্যাটারি থেকে অপর্যায়বৃত্ত প্রবাহ পাওয়া যায়

(চিত্র ৯.২)। আবার ডিসি জেনারেটরের সাহায্যেও এই প্রকার

তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন করা যায়।



চিত্র ৯.২ : অপর্যায়বৃত্ত প্রবাহ

(খ) পর্যায়বৃত্ত বা এসি প্রবাহ

যখন নির্দিষ্ট সময় পরপর তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়, সেই তড়িৎ প্রবাহকে পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ বলে।

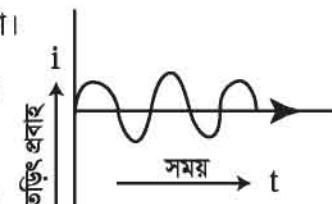
বর্তমান বিশ্বের সকল দেশের তড়িৎ প্রবাহই পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ। এর কারণ তুলনামূলকভাবে এটি উৎপন্ন ও সরবরাহ করা সহজ এবং সাশ্রয়ী। পর্যায়বৃত্ত প্রবাহের উৎস জেনারেটর বা ডায়নামো।

দেশের বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জেনারেটরের সাহায্যে পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ

উৎপন্ন করা হয়। পর্যায়বৃত্ত প্রবাহের দিক পরিবর্তন দেশভেদে বিভিন্ন হয়।

যেমন— বাংলাদেশে পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশবার এবং যুক্তরাষ্ট্রে

প্রতি সেকেন্ডে ষাটবার দিক পরিবর্তন করে।



চিত্র ৯.৩ : পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ

পাঠ ৪ ও ৫ : রোধ

বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি হয় ইলেক্ট্রনের প্রবাহের জন্য। কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য থাকলে এই প্রবাহ শুরু হয়। এক্ষেত্রে ইলেক্ট্রন নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে প্রবাহিত হয়। এই ইলেক্ট্রন স্থোত পরিবাহীর মধ্য দিয়ে চলার সময় পরিবাহীর অভ্যন্তরস্থ অণু-পরমাণুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে এর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বিদ্যুৎ প্রবাহও বিস্থিত হয়। পরিবাহীর এই বাধাদানের ধর্ম হলো রোধ। মূলত

পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয় তাই হলো রোধ।

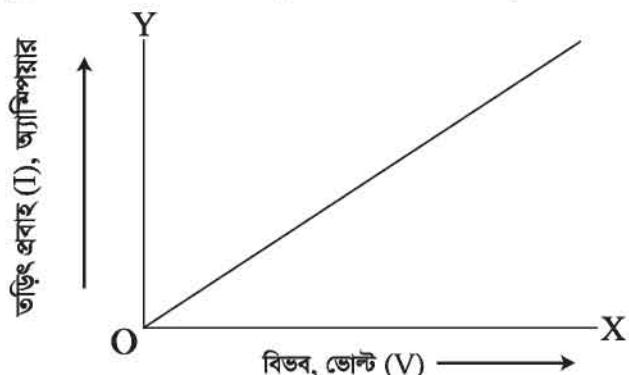
ও'মের সূত্র

কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হবে কিনা তা নির্ভর করছে এই পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের উপর। এছাড়াও পরিবাহীর আকৃতি ও উপাদান এমনকি পরিবাহীর তাপমাত্রার উপরও এর তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা নির্ভর করে। তাপমাত্রা যদি স্থির রাখা যায় তবে নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ শুধুমাত্র এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ও এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের অনুপাত থেকে এই তাপমাত্রায় এই পরিবাহীর রোধ পরিমাপ করা হয়। এছাড়া নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আকৃতির একটি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ এর দুই প্রান্তের সাথে বিভব পার্থক্য একটি নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মটির জন্য জর্জ সাইমন ও'মের (১৭৮৩-১৮৫৪) একটি সূত্র প্রণয়ন করেন, যা ও'মের সূত্র নামে পরিচিত।

ও'মের সূত্র : তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের মান পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মানের সমানুপাতিক।

ও'মের সূত্র থেকে এটা সহজেই বলা যায় যে, পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য বেশি থাকলে তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা বেশি হবে। আবার এই বিভব পার্থক্য কম থাকলে তড়িৎ প্রবাহ কম হবে (চিত্র ৯.৪)।

কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V , এর রোধ R এবং তড়িৎ প্রবাহ I হলে



চিত্র ৯.৪ : ও'মের সূত্রের লেখচিত্র

$$\text{তড়িৎ প্রবাহ}, I = \frac{V}{R}$$

সূত্রাং কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ পরিবাহীর নিজস্ব রোধের ব্যস্তানুপাতিক।

রোধের একক

রোধের এস আই একক হলো ও'ম। কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ১ ভোল্ট এবং এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ ১ অ্যাম্পিয়ার হলে, এই পরিবাহীর রোধ হবে ১ ও'ম।

পাঠ ৬-৮ : তড়িৎ বর্তনী

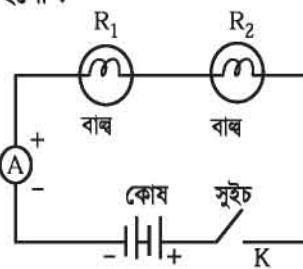
মানুষের চলার জন্য যেমন পথের প্রয়োজন, তড়িৎ প্রবাহের জন্যও প্রয়োজন নির্দিষ্ট পথ। তড়িৎ প্রবাহ চলার এই সম্পূর্ণ পথকেই তড়িৎ বর্তনী বলে। যখন তড়িৎ উৎসের দুই প্রান্তকে এক বা একাধিক রোধ, তড়িৎ যন্ত্র বা উপকরণের সাথে যুক্ত করা হয়, তখন একটি তড়িৎ বর্তনী তৈরি হয়। একটি চাবি বা সুইচের সাহায্যে বর্তনী বন্ধ করা বা খোলা যায়। বর্তনী বন্ধ থাকলে তড়িৎ প্রবাহিত হবে, খোলা থাকলে তড়িৎ প্রবাহিত হবে না।

সাধারণত বর্তনীতে তড়িৎযন্ত্র ও উপকরণসমূহ দু'ভাবে সংযুক্ত করা হয়। এগুলো হলো :

(ক) শ্রেণিসংযোগ বর্তনী (খ) সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী

(ক) শ্রেণি সংযোগ বর্তনী

কোনো বর্তনীতে যদি রোধ, তড়িৎযন্ত্র বা উপকরণসমূহ এমনভাবে সংযুক্ত হয় যেন প্রথমটির এক প্রান্তের সাথে দ্বিতীয়টির অন্য প্রান্ত, দ্বিতীয়টির অপর প্রান্তের সাথে তৃতীয়টির এক প্রান্ত এবং এরূপে সব কয়টি পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে, তবে সেই সংযোগকে অনুক্রম বা শ্রেণিসংযোগ বলে।



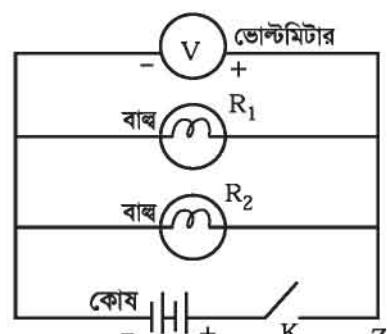
চিত্র ৯.৫ : শ্রেণিসংযোগ বর্তনী

চিত্রে রোধ R_1 , R_2 , অ্যামিটার A এবং চাবি K -কে অনুক্রমে সংযুক্ত করা হয়েছে। তড়িৎ প্রবাহ পরিমাপের জন্য অ্যামিটার ব্যবহৃত হয় এবং একে বর্তনীতে অন্যান্য উপকরণের সাথে অনুক্রমে যুক্ত করা হয়। অ্যামিটারের প্রান্তদৱে + এবং - চিহ্ন থাকলে + চিহ্নিত প্রান্তকে অবশ্যই কোষের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করতে হবে। এ সংযোগের ক্ষেত্রে বর্তনী সকল অংশে সর্বদা একই পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ হয়। কিন্তু বিভিন্ন অংশে বিভব পার্থক্য ভিন্ন হতে পারে।

(খ) সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী

কোনো বর্তনীতে দুই বা ততোধিক রোধ, তড়িৎ উপকরণ বা যন্ত্র যদি এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে সব কয়টির এক প্রান্ত একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অপর প্রান্তগুলো অপর একটি সাধারণ বিন্দুতে সংযুক্ত হয় তবে সেই সংযোগকে সমান্তরাল সংযোগ বলে। সমান্তরাল সংযোগে প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তড়িৎ প্রবাহ চলে কিন্তু প্রত্যেকটির দুই সাধারণ বিন্দুর বিভব পার্থক্য একই থাকে।

চিত্রে রোধ R_1 ও R_2 , এবং ভোল্টমিটার V পরস্পরের সাথে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। কোনো রোধকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য পরিমাপের জন্য ভোল্টমিটার ব্যবহৃত হয় এবং এ কারণে একে রোধকের দুই প্রান্তের সাথে সমান্তরালে যুক্ত করতে হয়। ভোল্টমিটারে + প্রান্তকেও অবশ্যই কোষের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করতে হয়, অন্যথায় যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।



চিত্র ৯.৬ : সমান্তরাল বর্তনী

কোনো একটি বর্তনীতে যদি দুটি বাল্ব সংযোগ করা হয় তাহলে কি বাল্ব দুটি একইভাবে জ্বলবে ?

সিরিজ সংযোগে একই ভঙ্গিৎ প্রবাহ দুটি বাহের মধ্য দিয়ে প্রযাইত হয়। একটি বাহ বত উজ্জ্বলভাবে ঝলতো দুটি বাহ সিরিজ সংযোজনের কলে তার চেয়ে কম উজ্জ্বলভাবে ঝলবে। আবার কোনো একটি বাহ যদি নষ্ট হয়ে থাকে তবে সমস্ত বর্তনীর মধ্য দিয়েই ভঙ্গিৎ প্রবাহ বন্ধ হবে থাবে। কলে অপর বাহটিও ঝলবে না।

সমান্তরাল সংযোগের প্রত্যেকটি বাহের মধ্য দিয়ে ডিন্ডুল গথে ভঙ্গিৎ প্রবাহিত হয়। তাই একটি বাহ নষ্ট হলেও অন্যটি ঝলবে। প্রতিটি বাহই পূর্বক পূর্বকভাবে ঝলানো বা নেভানো থাবে। প্রতিটি বাহের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পার্শ্বক্ষয় একই থাকবে। অর্থাৎ প্রতিটি বাহই ভঙ্গিৎ কোনোর পূর্ণ বিদ্যুৎ চালক পক্ষি পাবে। কলে দুটি বাহই উজ্জ্বলভাবে ঝলবে। যাহা দুটি বলি এক এক করে ভঙ্গিৎ কোনোর সাথে সংযুক্ত করা হত্তো তখন বত উজ্জ্বলভাবে ঝলতো বাহ দুটি সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করলেও একই উজ্জ্বলতা থাকবে। গৃহে বিদ্যুতাভাবনের অন্য সমান্তরাল বর্তনীই সুবিধাজনক।

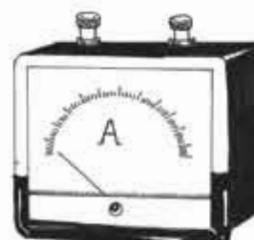
কোজ : বড় সাদা কাপড়ে প্রেপিসডয়োগ ও সমান্তরাল বর্তনীর তিত্র অংকন করে বিদ্যুৎ প্রবাহ চিহ্নিত কর।

পাঠ ১৪ ১০ : অ্যামিটার ও তোল্টমিটার

অ্যামিটার

অ্যামিটার একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এর সাহায্যে বর্তনীর ভঙ্গিৎ প্রবাহ সরাসরি আলিঙ্গন এককে পরিমাপ করা যাব। অ্যামিটারকে বর্তনীর সাথে প্রেপি সংযোগে সূচক থাকে। এই যন্ত্রে একটি গ্যালভানোমিটার থাকে। গ্যালভানোমিটার হচ্ছে সেই যন্ত্র যার সাহায্যে বর্তনীতে ভঙ্গিৎ প্রবাহের অস্তিত্ব ও পরিমাপ নির্ণয় করা যায়। গ্যালভানোমিটার সম্পর্কে তোমরা পরে কিংবালিত জানবে।

এই গ্যালভানোমিটারে বিকল্প নির্ণয়ের অন্য একটি সূচক বা কোঠা লাগানো থাকে। সূচকটি আলিঙ্গন, যিলিঙ্গালিঙ্গ বা মাইক্রোগালিঙ্গ এককে সাপ্তকাটি। একটি স্কেলের উপর সূচকে থাকে। বিদ্যুৎ কোনোর ঘোড়া অ্যামিটারেও দুটি সংযোগ প্রাপ্ত থাকে, একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক প্রাপ্ত। সাধারণত ধনাত্মক প্রাপ্ত লাল এবং ঋণাত্মক প্রাপ্ত কালো রঙের হয়। বর্তনীতে অ্যামিটারকে  ধরাপ করা হয়।

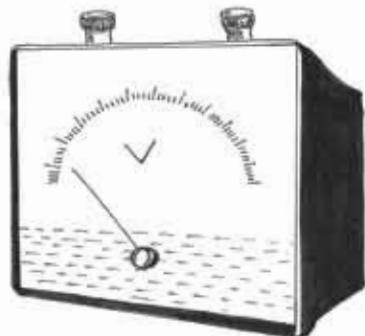


চিত্র ৯.৭ : অ্যামিটার

তোল্টমিটার

যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যেকোনো দুই বিদ্যুৎ মধ্যকার বিভিন্ন পার্শ্বক্ষয় সরাসরি তোল্ট এককে পরিমাপ করা যায় তাকে তোল্টমিটার বলে। বর্তনীর যে দুই বিদ্যুৎ বিভিন্ন পার্শ্বক্ষয় পরিমাপ করতে হবে তোল্টমিটারকে  সেই দুই বিদ্যুৎ সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়।

এই ঘরে একটি প্যালতানোমিটার থাকে। এর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য একটি সূচক বা কাঁচা শাগালো থাকে। সূচকটি ভোল্ট এককে দাখিলভিত্তি একটি সেগলের উপর স্থাপ্ত হয়ে। বর্তনীর যে সূই বিসূয় বিভ্যব পার্শ্বক্য পরিমাপ করতে হবে তেস্টমিটারটিকে সেই সূই বিসূয় সাথে সমাভূতভাবে সম্মত করতে হয়। তড়িৎ কেব বা অ্যামিটারের মতো তেস্টমিটারেও সূচি সহযোগ প্রাপ্ত থাকে, একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক প্রাপ্ত। সাধারণত ধনাত্মক প্রাপ্ত শাব্দ এবং ঋণাত্মক প্রাপ্ত কালো রঙের হয়। বর্তনীতে ভোল্টমিটারকে $+\odot-$ একাগ করা হয়।

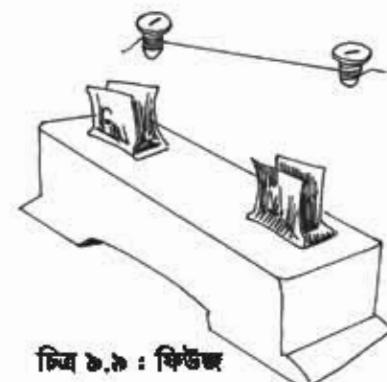


চিত্র ৯.৮ : ভোল্টমিটার

পাঠ ১১ : ফিল্ডজ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে বেসর তড়িৎ ব্যবহার করি সেগুলোর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি তড়িৎ প্রবাহিত হলে তা নষ্ট হয়ে যায়। বাড়ির তড়িৎ বর্তনীতে কেবলে অতিরিক্ত তড়িৎ প্রবাহিত হলে অনেক সময় তার থেকে বাঢ়িতে আগুন পর্যবেক্ষণে গেগে ঘেঁটে পাওয়া। এ ধরনের বৈদ্যুতিক মুর্দাটিনা এড়াবার জন্য বর্তনীতে এক ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা সেবনা হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থা হলো ফিল্ডজ তার ব্যবহার করা। ফিল্ডজ সাধারণত টিন ও সীসার একটি সংকর ধাতুর তৈরি ছোট সূর তার। এটি একটি চিনামাটির কাঠামোর উপর দিয়ে আটকানো থাকে। তামাটি সূর এবং পানোজক কর্ম। এর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত তড়িৎ প্রবাহিত হলে এটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়ে যাব। ফলে তড়িৎ বর্তনী বিস্তৃত হয়ে যায়। এভাবে তড়িৎ প্রবাহ কর্ম করে দিয়ে ফিল্ডজ ব্যবস্থাকে রক্ষা করে। বর্তনীতে ফিল্ডজ সহযোগ করতে হয়।

ফিল্ডজ তারের মান বিন্দিন হয়ে থাকে। সাধারণত আমরা ৫ অ্যাম্পিয়ার, ১৫ অ্যাম্পিয়ার, ৩০ অ্যাম্পিয়ার এবং ৬০ অ্যাম্পিয়ার ফিল্ডজ তার ব্যবহার করে থাকি। ১০ অ্যাম্পিয়ার ফিল্ডজ মানে এর মধ্য দিয়ে ১০ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এটি গেলে যাবে। বিন্দিন ব্যবস্থাক্রমে অন্য বিন্দিন মানের ফিল্ডজ ব্যবহার করতে হয়। বাতি, পাখা, টিতি ইত্যাদির জন্য ৫ অ্যাম্পিয়ার ফিল্ডজ এবং ইলেক্ট্রিক কেটিসি বা ইস্ত্রার জন্য ১৫ অ্যাম্পিয়ার ফিল্ডজ ব্যবহার করতে হয়। বাড়িয়ে যেইন ফিল্ডজ ৩০ বা ৬০ অ্যাম্পিয়ারের হয়ে থাকে।



চিত্র ৯.৯ : ফিল্ডজ

ব্যাগারটা আর একটু বোঝার চেষ্টা কর। টেলিভিশন ৫ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য শুরু যায়। এখন যদি টেলিভিশনের সাথে ৩০ অ্যাম্পিয়ারের ফিল্ডজ শাগাও তাহলে কী হবে? এ ফিল্ডজ কোনো কাজে আসবে না। ইলেক্ট্রিক কেটিসি সাথে ৫ অ্যাম্পিয়ার ফিল্ডজ শাগালো কী হবে? সুইচ অন করলেই ফিল্ডজটি গেলে যাবে। কারণ ইলেক্ট্রিক কেটিসিতে ৫ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। বেধানে বা প্রয়োজন

সেখানে তেমন মানের ফিউজ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মানের ফিউজ ব্যবহার করলে কোনো কাজ দিবে না, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে না। আবার কম মানের ফিউজ ব্যবহার করলে বারবার ফিউজ তার পুড়ে যেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। কেউ কেউ আবার বাড়িতে ফিউজ পুড়ে গেলে তার লাগাবার সময় দুই তিনটি তার একত্র করে লাগান। এ রকম কখনো করা উচিত নয়। কারণ, এতে ফিউজের মান বেড়ে যায়। দুইটি ১০ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ তার একত্র করলে ২০ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ হয়ে যাবে।

পাঠ ১২ : বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার ও অপচয় রোধে সচেতনতা

আমাদের দেশে দিন দিন বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েই চলছে। চাহিদার সাথে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেও চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার মধ্যে বাড়িতি যোগ হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন। যার প্রভাব পড়ছে বিদ্যুতের চাহিদার উপর। বাড়ছে অফিস, বাসা, শপিং কমপ্লেক্স। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বড় বড় বিল্ডিং করার সাথে বাড়ছে লিফ্টের চাহিদা। চাহিদা বাড়ছে নির্মাণ কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার করার প্রবণতা। এই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার জন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব। বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার করে এর অপচয় রোধে সকলকে সম্ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার ও অপচয় রোধে আমরা নিচের কাজগুলো করতে পারি।

- বাসায় বা অফিসে প্রয়োজন ব্যতীত লাইট ফ্যান বা এয়ারকুলার বস্থ রাখার ব্যাপারে সচেতন থাকা।
- সাধারণ বাস্তুর পরিবর্তে ফ্লোরোসেল বা এনার্জি সেভিং বাস্তু ব্যবহার করতে হবে, এতে বিদ্যুৎ সাধারণ হয়।
- রান্নার কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার পরিহার করতে হবে। প্রেসার কুকারে রান্না করলে ২৫% বিদ্যুৎ সাধারণ হয়।
- অপ্রয়োজনে এয়ারকুলারের ব্যবহার না করা নিশ্চিত করতে হবে।
- ফ্রিজ কেনার সময় প্রয়োজনীয় সাইজের কেনা উচিত। প্রয়োজনের চেয়ে বড় সাইজের ফ্রিজে বাড়িতি বিদ্যুৎ লাগে।
- বড় বড় ফ্যাট্রিরগুলোতে নিজেদের জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা।
- সোলার বিদ্যুৎ ব্যবহারে স্টডিয়োগী হওয়া।

নতুন শব্দ

তড়িৎ বিভব, তড়িৎ প্রবাহ, রোধ, একমুখী প্রবাহ, পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ, তড়িৎ বর্তনী, অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ফিউজ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম—

- দুটি ভিন্ন বিভবের ধাতব বস্তুকে সংযুক্ত করলে এদের যে বৈদ্যুতিক অবস্থা এদের মধ্যে চার্জ আদান প্রদানের দিক নির্ণয় করে তাই হলো বৈদ্যুতিক বিভব।
- যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি ধাতব বস্তুর মধ্যে বিভব পার্থক্য বর্তমান থাকে তড়িৎ প্রবাহ ততক্ষণ পর্যন্ত চলে।
- কোনোভাবে যদি ধাতব বস্তুবয়ের মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য বজায় রাখা যায় তখন তড়িৎ প্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে।
- পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় তাই হলো রোধ।

- তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের মান পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মানের সমানুপাতিক।
- যখন তড়িৎ প্রবাহ সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয়, সেই প্রবাহকে অপর্যায়বৃত্ত প্রবাহ বলে।
- যখন নির্দিষ্ট সময় পর পর তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়, সেই তড়িৎ প্রবাহকে পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ বলে।
- বর্তনীতে তড়িৎযন্ত্র ও উপকরণসমূহ দুভাবে সংযুক্ত করা হয়। এগুলো হলো শ্রেণিসংযোগ বর্তনী ও সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী।
- অ্যামিটারের সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা যায়।
- যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যেকোনো দুই কিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা যায় তাই ভেল্টমিটার।
- ফিউজ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য বর্তনীতে এক ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা।
- বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার করে এর অপচয় রোধে সকলকে সম্ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. দুটি ধাতব বস্তুর মধ্যে _____ থাকলে তড়িৎ _____ হয়।
২. পরিবাহীর দুই প্রান্তের _____ কম থাকলে _____ মাত্রা কম হয়।
৩. ইলেক্ট্রনিক কেটিলির সাথে _____ ফিউজ লাগালে এটি _____ যাবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ও'মের সূত্রের ব্যাখ্যা দাও।
২. কোনো পরিবাহীর রোধের সাথে এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহের সম্পর্ক কেমন ?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিদ্যুৎ প্রবাহের একক কী?

- | | |
|------------|-----------------|
| ক. কুলন্দি | খ. অ্যাম্পিয়ার |
| গ. ভোল্ট | ঘ. ও'ম |

২. পর্যায়বৃত্ত প্রবাহের উৎস কোনটি?

- | | |
|-------------|------------------|
| ক. ব্যাটারি | খ. ডিসি জেনারেটর |
| গ. জেনারেটর | ঘ. বিদ্যুৎকোষ |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মিনার পড়ার ঘরে ২টি বাল্ব ও ১টি ফ্যানের সংযোগ দেওয়া আছে। অন্যদিকে তাদের খাবার ঘরে ২টি ২৫
টিউবলাইট, ১টি ফ্যান ও ১টি ইলেক্ট্রিক কেটিলির সংযোগ দেওয়া আছে।

৩. মিনার পড়ার ঘরে কত অ্যাসিয়ারের ফিউজ ব্যবহার করতে হবে?

ক. ৫

খ. ১০

গ. ১৫

ঘ. ৩০

৪. মিনাদের খাবার ঘরে ৫ অ্যাসিয়ারের ফিউজ ব্যবহার করলে-

i. বিদ্যুৎ খরচ কম হবে

ii. প্রায়ই বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটবে

iii. সুইচ অন করা মাত্র গলে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১. হক সাহেব তার অফিসকক্ষে ৬০ ওয়াটের দুটি বাল্ব সিরিজে সংযুক্ত করলেন। কিছু ১টি ফ্যান ও ১টি টেলিভিশন প্যারালালে সংযুক্ত করেন।

ক. বিদ্যুৎ প্রবাহ কী?

খ. ৫ অ্যাসিয়ার ফিউজ বলতে কী বোঝায়?

গ. হক সাহেবের ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলোর সাহায্যে একটি প্যারালাল বর্তনী আঁক।

ঘ. বর্তনী দুটির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক তুলনামূলক আলোচনা করে মতামত দাও।

২. কাফি সাহেবের বাসার বৈদ্যুতিক বর্তনীতে ইদানীং প্রায়ই ছেটখাটো সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যেমন- সুইচ অন করার সময় শক লাগা, বাল্ব ফিউজ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এমতাবস্থায় ইলেক্ট্রিশিয়ান ডাকা হলে তিনি দুটি যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ ও ভোল্টেজ পরীক্ষা করে কিছু ত্বুটি লক্ষ করলেন। তিনি বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহারে পরিবারের সদস্যদের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিলেন।

ক. রোধ কী?

খ. ১০ কিলোওয়াট বলতে কী বোঝায়?

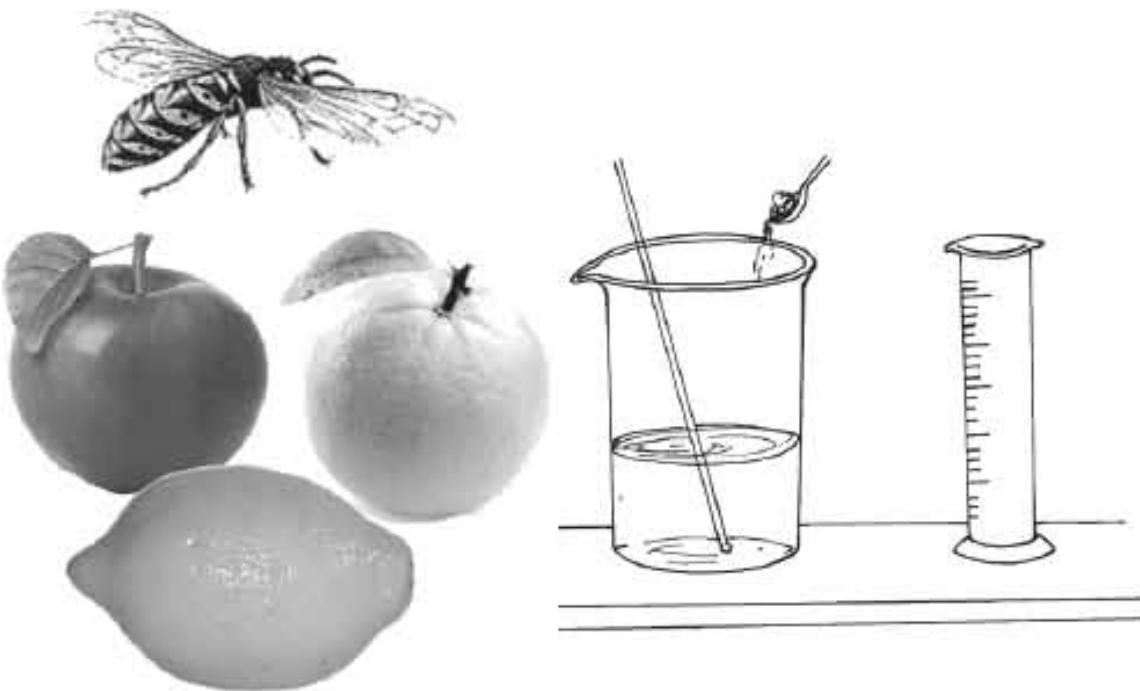
গ. যন্ত্র দুটির সংযোগ প্রক্রিয়া চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

ঘ. বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহারে কাফি সাহেবের পরিবার সচেতন হলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে এর কীরূপ প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়

অপ্তু, কার্বক ও সবশ

সেচুর ইন, ডিনেগো, ছল, এটালিত উদ্ধৃত, খাবার সবশ এখুন্দা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় মুখ্যসামগ্রী। এসের মধ্যে কোমোটি অপ্তু বা এপিক, কোমোটি কার্বক আৰুৰ কোমোটি হয়তো সবশ। এসের রাসায়নিক ধৰ্মত তিনু তিনু। ধৰ্ম অনুবাদী এসের একেকটি এক এক কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।



এই অধ্যায় পঠ শেষে আপো—

- অপ্তু ও কার্বকের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কাজের বৈশিষ্ট্য ব্যবহাৰ কৰতে পারব;
- সবশের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কৰতে পারব;
- সিরাপেক পদাৰ্থ ব্যাখ্যা কৰতে পারব;
- পৰীক্ষণ কৰ্তৃত্বে যত্নশক্তিৰ ব্যবহাৰ সঠিকভাৱে কৰতে পারব;
- আমাদেৱ জীবনে অপ্তু, কার্বক ও সবশেৱ অৱদান উপলব্ধি কৰতে পারব;
- পৰীক্ষণ কৰ্তৃত্ব চলাকলীন প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যৱস্থা গুহ্য সন্তুষ্টিৰ সচেতন কৰতে পারব।

পাঠ ১-৪ : অসম, ক্ষারক ও নির্দেশক

কাজ : অসম কী তা জানা

প্রয়োজনীয় উপকৰণ : লেবুর রস, লিটমাস পেপার, বিকার, চিমটা

পদ্ধতি : টেস্টটিউবে ২-৩ মিলিলিটার সেবুর রস নাও। প্রথমে চিমটা দিয়ে লাল লিটমাস কাগজ বিকারে নেওয়া সেবুর রসে ডুবাও। কাগজের রং কি পরিবর্তন হলো ? না, হলো না। এবার নীল লিটমাস কাগজ সেবুর রসে ডুবাও। এখন কি লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন হলো ? ইয়া, লিটমাস কাগজের রং নীল থেকে লাল হয়ে গেল।

তোমরা কি জান এর কারণ কী ? লিটমাস কাগজ তৈরি করা হয় সাধারণ কাগজে লাইকেন (Lichens) নামক এক ধরনের গাছ থাকে প্রাপ্ত রঙের সাহায্যে। এভাবে প্রাপ্ত লিটমাস কাগজ দেখতে লালবর্ণের হয়। এ লালবর্ণের লিটমাস কাগজকে যেকোনো ক্ষরীয় মুবণে ডুবালে তা নীলবর্ণ ধারণ করে। অন্যদিকে নীলবর্ণের লিটমাস কাগজে কোনো এসিড যোগ করলে তা লাল বর্ণের লিটমাস কাগজে পরিণত হয়।

সেবুর রসে থাকে সাইট্রিক এসিড। এতে যখন লাল লিটমাস ডুবানো হয়, তখন কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না, ফলে লিটমাস কাগজের রঙের কোনোই পরিবর্তন হয় না। পক্ষান্তরে নীল লিটমাস কাগজ ডুবালে লিটমাসের সাথে সেবুর সাইট্রিক এসিডের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, ফলে লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে যায়।



কাজ : লেবুর রসের বদলে তোমরা নিজেদের মধ্যে দল করে ভিনেগার, কামরাঙা, কমলার রস ইত্যাদি নিয়ে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ দিয়ে পরীক্ষা করে রং পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ কর।

তাহলে একথা বলা যায় যে, এসিডের একটি ধর্ম হলো এরা নীল লিটমাসকে লাল করে।

তোমরা কি জানো, সেবুর রসের মতো আমলকি, করমচা, কামরাঙা, বাতাবি সেবু, আঙুর ইত্যাদি টক লাগে কেন ? কারণ হলো এই ফলগুলোতে নানা রকম এসিড থাকে। অর্থাৎ এটা বলা যায় যে, এসিডসমূহ টক স্বাদযুক্ত হয়।

নিচের টেবিলে বেশ কিছু ফল ও এতে উপস্থিত এসিডের নাম দেওয়া হলো।

ফলের নাম	উপস্থিত এসিড
আঙুর, কমলা, লেবু	সাইট্রিক এসিড
তেঁতুল	টারটারিক এসিড
টমেটো	অঙ্গালিক এসিড
আমলকি	এসকরবিক এসিড
আপেল, আনারস	ম্যালিক এসিড

কাজ : ক্ষারক সম্পর্কে জানা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : চুন, বিকার, পানি, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, হাতমোজা, নাড়ানি, চামচ, ড্রপার, চিমটা পানি যোগ কর। নাড়ানি দিয়ে ভালোভাবে নাড়া দাও। এবার ড্রপার দিয়ে আস্তে আস্তে ১০০ মিলিলিটার পানি যোগ কর। নাড়ানি দিয়ে ভালোভাবে নাড়া দাও। এরপর ১০ মিনিট মিশ্রণটিকে রেখে দাও। সতর্কতার সাথে মিশ্রণের উপরিভাগ থেকে পরিষ্কার দ্রবণ আলাদা করে নাও। এই পরিষ্কার দ্রবণটিই হলো চুনের পানি। এখন চুনের পানিতে চিমটা দিয়ে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ জুবাও। লিটমাস কাগজের রং কি পরিবর্তন হলো ?

হ্যাঁ, লাল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে নীল হয়ে গেল আর নীল লিটমাসের রং পরিবর্তন হলো না। পরবর্তীতে তোমরা রং পরিবর্তনের কারণ আরও বিশদভাবে জানতে পারবে।

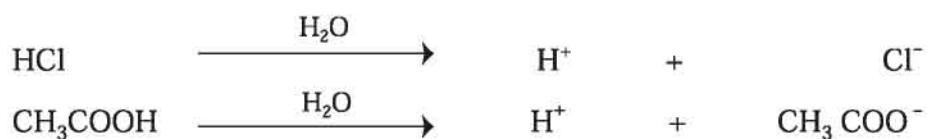
চুনের পানিতে থাকা $\text{Ca}(\text{OH})_2$ এর মতো যে সকল রাসায়নিক পদার্থ লাল লিটমাস কাগজকে নীল করে তাদেরকে আমরা ক্ষারক বলি। সোডিয়াম হাইড্রোকাইড (NaOH) একটি ক্ষারক যা সাধারণ তৈরির একটি মূল উপাদান। এটি কাগজ ও রেয়ন শিল্পেও ব্যবহৃত হয়।

নির্দেশক : তোমরা উপরে যে লিটমাস কাগজ ব্যবহার করলে তা নিজের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি পদার্থ অন্ন না ক্ষারক তা নির্দেশ করল। লিটমাস কাগজ এর মতো যেসব পদার্থ নিজেদের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি বস্তু অন্ন না ক্ষার বা কোনোটিই নয় তা নির্দেশ করে তাদেরকে নির্দেশক বলে। লিটমাস কাগজের মতো মিথাইল অরেঞ্জ, ফেনোফথ্যালিন, মিথাইল রেড এগুলো নানা রকমের নির্দেশক যা একটি অজানা পদার্থ এসিড, ক্ষারক না নিরপেক্ষ তা বুঝতে সাহায্য করে।

এসিড : আমরা কয়েকটি এসিডের সংকেত লক্ষ করি। ভিনেগর বা এসিটিক এসিড (CH_3COOH), অঙ্গীকৃত এসিড (HOOC-COOH), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4)।

এই সবগুলো এসিডের মিল কোথায় ?

এদের সবগুলোতেই এক বা একাধিক H পরমাণু আছে এবং এরা সবাই পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে। তাহলে বলা যায় যে, এসিড হলো ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে H^+ উৎপন্ন করে।

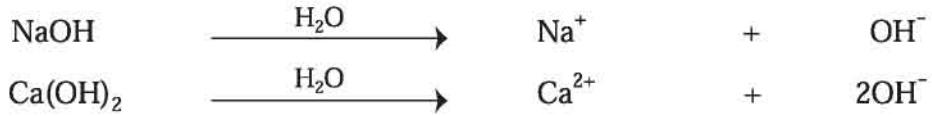


মিথেন (CH_4) কি এসিড

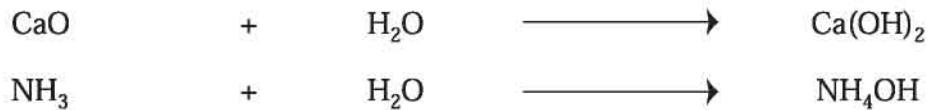
এটি এসিড নয়। মিথেনে ৪টি H পরমাণু আছে, কিন্তু মিথেন পানিতে H^+ উৎপন্ন করে না।

এবার দুটি ক্ষারকের দিকে লক্ষ করি। সোডিয়াম হাইড্রোকাইড (NaOH) এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোকাইড $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ ।

ক্ষারক হলো সেই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে অঞ্জিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) তৈরি করে।



তবে কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ, যেমন— ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুন, অ্যামোনিয়া (NH_3), যাদের মধ্যে অঞ্জিজেন ও হাইড্রোজেন দু'ধরনের পরমাণু নেই, কিন্তু এরা পানিতে OH^- তৈরি করে, এদেরকেও ক্ষারক বলা হয়।



ক্ষারক : তোমরা এর আগে জেনেছ যে, ক্ষারক হলো মূলত ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড। কিছু কিছু ক্ষারক আছে যারা পানিতে দ্রবীভূত হয় আর কিছু আছে যারা দ্রবীভূত হয় না। যে সমস্ত ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হয় তাদেরকে ক্ষার বলে। তাহলে ক্ষার হলো বিশেষ ধরনের ক্ষারক। NaOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NH_4OH এগুলো ক্ষার। এগুলোকে কিন্তু ক্ষারকও বলা যায়। পক্ষান্তরে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড $[\text{Al}(\text{OH})_3]$ কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হয় না। তাই এটি একটি ক্ষারক হলেও ক্ষার নয়। অতএব একথা বলা যায় যে, সকল ক্ষার ক্ষারক হলেও সকল ক্ষারক কিন্তু ক্ষার নয়।

তোমরা সবাই জানো যে, সাধারণ স্পর্শ করলে পিছিল মনে হয়। এর কারণ হলো সাধারণে ক্ষার থাকে। তাহলে বলা যায় যে, ক্ষার ও ক্ষারকের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এরা পিছিল হয়। আবার দেখা গেছে যে ক্ষার ও ক্ষারকসমূহ সাধারণত কাঁচু স্বাদযুক্ত হয়। উল্লেখ্য ক্ষারকের স্বাদ পরীক্ষা না করাই ভালো।

পাঠ ৫ ও ৬ : এসিড ও ক্ষারকের ব্যবহার

তোমরা কি জানো, আমাদের বহুল ব্যবহৃত প্লিটিং পাউডার কীভাবে তৈরি হয়?

এটি তৈরি হয় শুকনো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও ক্লোরিন গ্যাসের (Cl_2) বিক্রিয়া ঘটিয়ে। আবার ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পাতলা দ্রবণ যা চুনের পানি বা লাইম ওয়াটার (Lime water) নামে পরিচিত সেটি আমাদের ধরবাড়ি হোয়াইট ওয়াশ করতে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে পানি ও ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের তৈরি পেস্ট যা মিক্ষ অফ লাইম (Milk of Lime) নামে অধিক পরিচিত, তা পোকামাকড় দমনে ব্যবহৃত হয়।

তোমরা কি জানো, আমাদের পাকস্থলীতে এসিডিটি হলে যে এন্টাসিড উষ্ণ খাই তা আসলে কী?

এন্টাসিড উষ্ণ হলো মূলত ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড $[\text{Mg}(\text{OH})_2]$ যা সাসপেনশান ও ট্যাবলেট দুভাবেই পাওয়া যায়। ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড $[\text{Mg}(\text{OH})_2]$ এর সাসপেনশান মিক্ষ অফ ম্যাগনেসিয়া (Milk of Magnesia) নামেই অধিক পরিচিত। কখনো কখনো এন্টাসিডে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডও $[\text{Al}(\text{OH})_3]$ থাকে।

ফলমূল বা সবজিতে যে সকল এসিড থাকে এদেরকে জৈব এসিড বলে। এদেরকে খাওয়া যায় এবং কোনো কোনোটি মানব দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। যেমন— এসকরবিক এসিড যা আমরা ভিটামিন সি বলে জানি। এর অভাবে মানবদেহে স্কার্টি (Scurvy) রোগ হয়। অন্যদিকে কিছু কিছু এসিড আছে যেমন— হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), ফসফরিক এসিড (H_3PO_4), নাইট্রিক এসিড (HNO_3), পারক্লোরিক এসিড ($HClO_4$) ইত্যাদি প্রকৃতিতে প্রাপ্ত নানারকম খনিজ পদার্থ থেকে তৈরি করা হয়, এদেরকে খনিজ এসিড (Mineral Acids) বলে। এগুলো খাওয়ার উপযোগী নয়। বরং বলা যায় এরা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। খনিজ এসিড ত্বকে লাগলে ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

তোমরা কি জানো, আমাদের সমাজের কিছু খারাপ চরিত্রের লোক যে এসিড ছুড়ে মানুষের শরীর ঝলসে দেয় সেগুলো কোন ধরনের এসিড? এগুলো হলো খনিজ এসিড।

তোমরা কি জানো, এসিড ছোড়ার শাস্তি কী?

এসিড ছোড়ার শাস্তি খুবই কঠোর। এমনকি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে।

দুষ্ট চরিত্রের লোকেরা এসিড ছুড়ে একদিকে যেমন মারাত্মক অপরাধ করছে অন্যদিকে শিল্প কারখানায় অতি প্রয়োজনীয় এসিড অপচয় করছে। এর বিরুদ্ধে অবশ্যই আমাদের সোচার হতে হবে এবং মানুষকে সচেতন করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা পোস্টার, লিফলেট এগুলো তৈরি করে মানুষের মধ্যে বিলি করতে পারি। এতে একদিকে যেমন আমাদের মূল্যবান সম্পদ খনিজ এসিডসমূহের অপচয় রোধ করা যাবে অন্যদিকে এসিড ছোড়ার মতো মারাত্মক শাস্তিযোগ্য অপরাধ থেকে আমাদের সমাজও রক্ষা পাবে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং শিল্প কারখানায় এসিডের ব্যবহার অনস্বীকার্য। আমরা টয়লেট পরিষ্কারের কাজে যে সমস্ত পরিষ্কারক ব্যবহার করি তাতে এসিড থাকে। সোনার গহনা তৈরির সময় স্বর্ণকাররা নাইট্রিক এসিড ব্যবহার করেন। আমরা বিভিন্ন কাজে যেমন— আইপিএস, গাড়ি, মাইক বাজানোর সময়, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ব্যাটারি ব্যবহার করি তাতে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয়। তোমরা অনেকে হয়তো জানো যে, বাসাবাড়িতে সাপের উপদ্রব কমানোর জন্য যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় সেটি হলো কার্বোলিক এসিড।

তোমরা কি জানো, আমাদের খাদ্যদ্রব্য হজম করার জন্য পাকস্থলীতে এসিড অত্যাবশ্যকীয় এবং সেটি হলো হাইড্রোক্লোরিক এসিড।

সার কারখানায় অতি প্রয়োজনীয় একটি উপাদান হলো সালফিউরিক এসিড। এছাড়া ডিটারজেন্ট থেকে শুরু করে নানারকম রং, উষ্ণথপত্র, কীটনাশকসহ পেইন্ট, কাগজ, বিস্ফোরক ও রেয়ন তৈরিতে প্রচুর H_2SO_4 ব্যবহৃত হয়।

কোনো একটি দেশ কতটা শিল্পোন্নত তা বিচার করা হয় ঐ দেশ কতটুকু H_2SO_4 ব্যবহার করে তার উপর ভিত্তি করে। ইস্পাত তৈরির কারখানা, উষ্ণথ, চামড়া শিল্প ইত্যাদি অনেক শিল্প HCl ব্যবহৃত হয়।

সার কারখানায়, বিস্ফোরক প্রস্তুতি, খনি থেকে মূল্যবান ধাতু যেমন সোনা আহরণে ও রকেটে জ্বালানির সাথে HNO_3 ব্যবহৃত হয়।

পাঠ ৭- ১০ : এসিড ও ক্ষারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

কাজ : চুনাপাথরের সাথে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : চুনাপাথর, চামচ, পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কাচের ঢ্রপার, এ্যাপ্রোন

পদ্ধতি : এ্যাপ্রোনটি পরে নাও। চুনাপাথর গুঁড়া করে চামচে নাও। এবার কাচের ঢ্রপার দিয়ে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড চামচে যোগ করতে থাক। কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? গ্যাসের বৃদ্ধবৃদ্ধ উঠছে? ইঁয়া, গ্যাসের বৃদ্ধবৃদ্ধ উঠছে এবং অনেকটা ফেনার মতো মনে হচ্ছে। কারণ চুনাপাথরে (CaCO_3) পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করাতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং সে কারণেই আমরা বৃদ্ধবৃদ্ধ দেখি। উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে গেলে আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের ও পানির পরিষ্কার দ্রবণ দেখতে পাই।

হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মতো প্রায় সকল এসিডই কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।



তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, কখনো কখনো এসিডের এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে উৎপন্ন CO_2 আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

তোমরা বলোতো খাবার সোডা (NaHCO_3) ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় কী ঘটবে?

খাবার সোডা ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ, পানি ও CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হবে।



তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে খাবার সোডাতে লেবুর রস বা ভিনেগার যোগ করলে কী ঘটে তা জেনেছ। তোমাদের তা কি মনে আছে? এখানে কী ধরনের বিক্রিয়া ঘটবে লেখ।

কাজ : এসিডের সাথে ধাতু মেশালে কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ধাতু হিসেবে দস্তার গুঁড়া (Zn), পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড, স্পিরিট ল্যাঙ্স, টেস্টটিউব, এ্যাপ্রোন

পদ্ধতি : এ্যাপ্রোন পরে নাও। টেস্টটিউবের অর্ধেক পরিমাণ পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও। অন্ন পরিমাণ দস্তার গুঁড়া টেস্টটিউবে নেওয়া এসিডে ছেড়ে দাও। কোনো গ্যাসের বৃদ্ধবৃদ্ধ উঠছে কি? না উঠলে স্পিরিট ল্যাঙ্স জ্বালিয়ে টেস্ট টিউবের তলায় হালকা তাপ দাও। গ্যাসের বৃদ্ধবৃদ্ধ উঠছে কি?

এটি দস্তা ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসের বৃদ্ধবৃদ্ধ। এটি হাইড্রোজেন গ্যাস কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পার। টেস্টটিউবের মুখে একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই ধরে দেখ কী ঘটে? পপ পপ শব্দ করে জ্বলছে? ইঁয়া ঠিক তাই। এটি হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য গ্যাস হলে এমন শব্দ হতো না।



হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মতো প্রায় সকল এসিডই ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

কাজ : চুনের পানির সাথে এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : চুন, পানি, সালফিটরিক এসিড, বিকার, লাল লিটমাস কাগজ, নাড়ানি, চিমটা, ড্রপার

পদ্ধতি : চুনের পানি তৈরি কর। ছোট বিকারে ১০ মিলিলিটার চুনের পানি নাও। এবার চিমটা দিয়ে লাল লিটমাস কাগজকে চুনের পানিতে ডুবাও। লিটমাস কাগজের রং লাল থেকে নীল হয়ে গেল কি? ইংো, ঠিক তাই। এতে প্রমাণিত হলো চুনের পানি একটি ক্ষারকীয় পদার্থ। এবার পাতলা সালফিটরিক এসিড ড্রপার দিয়ে আস্তে আস্তে ঘোঁষ কর ও নাড়ানি দিয়ে নাড়া দাও। লিটমাস কাগজ বিকারের দ্রবণে ডুবিয়ে দেখ এর রঙের কী ধরনের পরিবর্তন হয়। এভাবে আস্তে আস্তে H_2SO_4 ঘোঁষ করতে থাক এবং লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে পরীক্ষা কর। এক পর্যায়ে দেখবে লিটমাস কাগজের রং আর পরিবর্তন হচ্ছে না।

কেন লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন হচ্ছে না?

কারণ হলো চুনের পানিতে থাকা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড $[Ca(OH)_2]$ এর সাথে সালফিটরিক এসিড $[H_2SO_4]$ বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম সালফেট ও পানি উৎপন্ন করে। ফলে ধীরে ধীরে $Ca(OH)_2$ এর পরিমাণ কমতে থাকে এবং যখন সব $Ca(OH)_2$, H_2SO_4 এর সাথে বিক্রিয়া করে ফেলে তখন লিটমাস কাগজের রং আর পরিবর্তন হয় না।

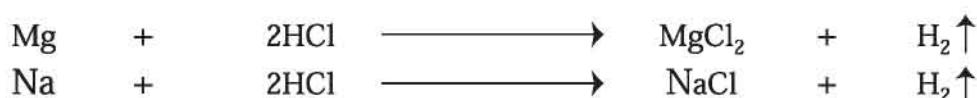


এখানে উৎপন্ন ক্যালসিয়াম সালফেট হলো একটি লবণ। তাহলে আমরা বলতে পারি ক্ষারক ও এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন মূল পদার্থই হলো লবণ।

আরও কিছু ক্ষারক ও এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণ দেখে নেওয়া যাক :



তবে একমাত্র ক্ষারক ও এসিডের বিক্রিয়াতেই যে লবণ উৎপন্ন হয় তা নয়। অন্য বিক্রিয়ার মাধ্যমেও লবণ উৎপন্ন করা যায়। যেমন— ধাতু ও এসিডের মধ্যে বিক্রিয়া লবণ উৎপন্ন হয়।



আবার কার্বনেটের সাথে (যা একটি লবণ) এসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়েও লবণ উৎপন্ন করা যায়।



পাঠ ১১-১৩ : অন্ত, ক্ষার ও লবণ শনাক্তকরণ

কাজ : পানি ও খাবার লবণের মিশ্রণে লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন হয় কি না তা পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : বিকার, নাড়ানি, লবণ, পানি, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, চিমটা

পদ্ধতি : একটি বিকারে ৫০ মিলিলিটার পানি নিয়ে তাতে ১০-১৫ গ্রাম খাবার লবণ যোগ কর। নাড়ানি দিয়ে ভালোভাবে নাড়া দাও। এবার চিমটা দিয়ে প্রথমে নীল লিটমাস কাগজ ও পরে লাল লিটমাস কাগজ লবণ-পানির মিশ্রণে ডুবাও। লিটমাস কাগজের রং কি পরিবর্তন হলো? না, হলো না। কেন হলো না?

কারণ এখানে কোনো এসিড বা ক্ষারক নেই। এসিড থাকলে নীল লিটমাস লাল হতো আর ক্ষারক থাকলে লাল লিটমাস নীল হতো। পানিতে যে লবণ আছে তা একটি নিরপেক্ষ পদার্থ। না এসিড, না ক্ষারক। তাই কোনো লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন হয় না। খাবার লবণের মতো অনেক লবণ আছে যারা নিরপেক্ষ পদার্থ অর্থাৎ এরা লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করে না।

কখনো কখনো বিশেষ কারণে অর্থাৎ দূষিত পানিতে এসিড বা ক্ষারক থাকতে পারে। তখন কিন্তু নিরপেক্ষ পদার্থ হলোও পানি লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করতে পারে।

কাজ : ফুল ও সবজির নির্যাস তৈরি এবং অন্ত ও ক্ষারক শনাক্তকরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : জবা, বাগান বিলাস ও হলুদ কৃষ্ণচূড়া ফুলের পাপড়ি, বেগুনি বাঁধাকপির পাতা, সালাদ তৈরির বীটা, পুই শাকের বীজ, বিকার (৬টি), নাড়ানি, পানি, বুনসেন বার্নার বা গ্যাসের চুলা, ফিল্টার কাগজ, বোতল, কাগজ, কলম, লেবুর রস, ভিনেগার, টক দই, চুনের পানি, সাবান পানি, খাবার সোডা, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, হাইড্রোক্লেরিক এসিড, কাচের খণ্ড, ড্রপার।

পদ্ধতি : উপরে বর্ণিত নানা রকম ফুল ও সবজির উপাদান সংগ্রহ কর। আলাদাভাবে এক একটি বিকারে এক একটি ফুলের পাপড়ি বা সবজির উপাদান নিয়ে তাতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে বুনসেন বার্নার বা চুলায় ঝাল দাও। পানি প্রায় অর্ধেক হলে মিশ্রণগুলো ঠাণ্ডা কর। ফিল্টার কাগজ দিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে ছেকে প্রাপ্ত নির্যাস তিনি তিনি বোতলে রাখ। কোন বোতলে কোন ধরনের নির্যাস তা বোতলের গায়ে লিখে রাখ। এবার টেস্টটিউব নিয়ে একে একে লেবুর রস, চুনের পানি, টক দই, ভিনেগার, সাবান পানি, খাবার সোডা, HCl, NaOH নাও ও কোনটিতে কী নিলে তা গায়ে লিখে রাখ। এবার একটি নির্যাস নিয়ে ড্রপার দিয়ে অন্ত পরিমাণে প্রতিটি টেস্টটিউবে যোগ করে ভালোভাবে ঝাঁকাও। নির্যাসের রঙে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বর্ণ লাল ও কোন ক্ষেত্রে নীল হয়েছে তা ছক তৈরি করে লিখে রাখ। এই ছক থেকে তোমরা বুঝতে পারবে কোন দ্রব্যটি এসিডীয় ও কোনটি ক্ষারকীয়।

একে একে প্রতিটি নির্যাস নিয়ে রং পরিবর্তন ছকে লিখে রাখ। এবার প্রতিটি দ্রব্য নিয়ে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ দিয়ে দেখ কোন দ্রব্যটি অল্লায় আর কোনটি ক্ষারকীয়। একই ধরনের সকল বস্তু একই রকম বর্ণ ধারণ করে।

নতুন শব্দ : অস্ত্র, ক্ষারক, নির্দেশক, লিটমাস, লাইম ওয়াটার, এল্টাসিড

এই অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম—

- যে সমস্ত পদার্থ পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে তারা হলো অস্ত্র বা এসিড।
- অস্ত্র নীল লিটমাসকে লাল করে। অস্ত্র টক স্বাদযুক্ত হয়।
- ধাতব অঙ্গাইড ও হাইড্রোঅঙ্গাইডসমূহ হলো ক্ষারক। ক্ষারক লাল লিটমাসকে নীল করে।
- ক্ষার হলো সেই সমস্ত ক্ষারক যারা পানিতে দ্রবীভূত হয়। ক্ষারকসমূহ কটু স্বাদের হয়।
- নির্দেশকসমূহ নিজেদের বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি বস্তু অস্ত্র, ক্ষারক না নিরপেক্ষ তা নির্দেশ করে।
- লবণ হলো অস্ত্র ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন নিরপেক্ষ পদার্থ।
- এসিডের সাথে ধাতব কার্বনেট বা বাইকার্বনেটের বিক্রিয়ায় লবণ, পানি ও কার্বন ডাইঅঙ্গাইড তৈরি হয়।
- এসিডের সাথে ধাতুর বিক্রিয়ায় লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. এসিডসমূহ পানিতে ————— উৎপন্ন করে।
২. ক্ষার হলো এক ধরনের ক্ষারক যারা —————।
৩. সকল ————— কিন্তু সকল ————— নয়।
৪. এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়া ————— উৎপন্ন হয়।
৫. এল্টাসিড হলো ————— জাতীয় পদার্থ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. এসিড ও ক্ষারকের মূল পার্থক্য কী?
২. সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয়— এ কথার ব্যাখ্যা দাও।
৩. চুনের পানিতে কার্বন ডাইঅঙ্গাইড গ্যাস চালনা করলে কী ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তা বিক্রিয়াসহ লেখ।
৪. বিশুদ্ধ পানি ও লবণ কি লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
৫. নির্দেশক বলতে কী বোঝায়?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. টমেটোতে কোন এসিড থাকে?

- ক. এসিটিক এসিড
গ. ম্যালিক এসিড

- খ. অঙ্গালিক এসিড
ঘ. সাইট্রিক এসিড

২. কোন এসিড খাওয়া যায়?

ক. HNO_3

খ. HCl

গ. H_2SO_4

ঘ. CH_3COOH

নিচের বাক্যটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

আদিল একদিন জিঙ্ক অঙ্গাইড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া ঘটালো।

৩. বিক্রিয়াটিতে উৎপন্ন যৌগ হলো—

i. লবণ

ii. ক্ষার

iii. পানি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. কার্বনেটযুক্ত লবণের সাথে দ্বিতীয় যৌগটির বিক্রিয়া ঘটালে কী উৎপন্ন হবে?

ক. H_2

খ. O_2

গ. CO_2

ঘ. Cl_2

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফারাহ তৈলাক্ত খাবার খেতে পছন্দ করে। ইদানীং তার পেটে প্রায়ই ব্যথা হয়। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার জানালেন তার এসিডিটি হয়েছে। ডাক্তার তাকে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করার পাশাপাশি একটি ঔষধ খেতে পরামর্শ দিলেন।

ক. লবণ কী?

খ. মিক্ষ অফ লাইম বলতে কী বোঝায়?

গ. ডাক্তার কী ঔষধ খাওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং কেন দিলেন?

ঘ. উদ্দীপকে উন্নিষ্ঠিত এসিডিটি তৈরি হওয়ার উপাদানটি কোন ধরনের যৌগ এবং কেন? বিশ্লেষণ কর।

২. মানচূরা খানম মাঝে মাঝে পান খান। তিনি একদিন একটি পাত্রে চুন ভিজিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলেন, পাত্রটি অনেক গরম হয়ে গেছে। তিনি আরও লক্ষ করলেন, পাত্র থেকে চুন নেওয়ার সময় চুনের পানিতে নিঃশ্বাস পড়ায় পানিটা ঘোলা হয়ে গেল।

ক. ক্ষার কী?

খ. চুনের পানি ঘোলা হওয়ার কারণ কী?

গ. মানচূরা খানমের পাত্রে ভিজানো যৌগটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার ব্যাখ্যা কর।

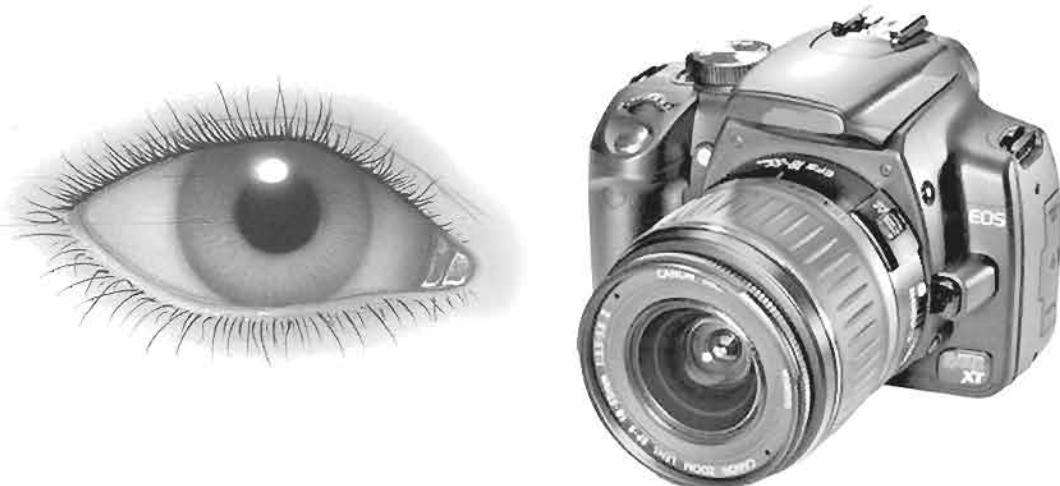
ঘ. উদ্দীপকে উৎপন্ন ১ম যৌগটি ক্ষার ও ক্ষারক উভয় ধর্মই প্রদর্শন করে, বিশ্লেষণ কর।

৩. কাজ : বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত নানা রকম অন্ন, ক্ষারক ও লবণের তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন কর।

একাদশ অধ্যায়

আলো

আলোক রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্থকভাবে আপত্তি হলে মাধ্যম পরিবর্তনে এর গতিপথের ভিন্নতা দেখা যায়। এটি হলো আলোর প্রতিসরণ। এই অধ্যায়ে আমরা দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত আলোর প্রতিসরণের বিভিন্ন ঘটনা, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এবং এর প্রয়োগ হিসাবে অপটিক্যাল ফাইবারের সাথে পরিচিত হব। এছাড়া ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কাজ, মানব চক্ষু ও ক্যামেরার কার্যক্রম তুলনা নিয়ে আলোচনা করব।



এ অধ্যায় পাঠ শেবে আমরা—

- দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত প্রতিসরণের ঘটনাগুলো চিত্র অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অপটিক্যাল ফাইবারের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- চশমার কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ক্যামেরা এবং চোখের কার্যক্রম তুলনা করতে পারব;
- আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রমে আলোর অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ ১ : আলোর প্রতিসরণ

তোমরা কি কখনো কোনো গ্লাসের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তোমাদের নিজের ছবি দেখার চেষ্টা করেছ? গ্লাস থেকে আলোর প্রতিফলনের ফলে তোমরা কি একটা অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখেছ? এই প্রতিবিম্বটা কি কোনো আয়নায় তৈরি তোমাদের প্রতিবিম্ব থেকে তিন্ন? এটাকে অনেক বেশি আবছা লাগে কেন বলতে পার? গ্লাস হলো স্বচ্ছ মাধ্যম। অধিকাংশ আলোই এর মধ্য দিয়ে চলে যায়, কেবল খুবই কম অংশ প্রতিফলিত হয় বলেই প্রতিফলিত প্রতিবিম্বটি এটটা আবছা দেখা যায়। তাহলে আলো বখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে চলে গেল তখন এর গতিগত কেমন? চলো আমরা এবার এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানব। তবে প্রথমে তোমরা নিচের কাজটি করে নাও।

কাজ : আলোর প্রতিসরণের ধারণা

যায়েজনীয় উপকরণ : একটি পেশিল, একটি কাচের গ্লাস, পানি

পদ্ধতি : একটি কাচের গ্লাসে $\frac{3}{4}$ অংশ পূর্ণ করে পানি নাও। এবার বলতে পারবে একটি পেশিলকে একটু কাত করে চিত্রের মতো পানির ভিতর রাখলে পানির ভিতরে পেশিলের অংশটিকু কেমন দেখাবে?

তুমি পানির মধ্যে পেশিলটিকে পর্যবেক্ষণ কর। তোমার পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল সেখ। আমরা জানি কোনো বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়লেই কেবল ঐ বস্তুকে দেখতে পারি। তুমি নিচয়ই পেশিলটিকে পানির মধ্যে খাটো, মোটা এবং পানির তল বরাবর এটি ভেজো গেছে বলে মনে করছ।



চিত্র ১১.১ : আলোর প্রতিসরণ

উপরের কাজটির ক্ষেত্রে পানির ভিতরে পেশিলের নিচের অংশ থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ছে। এর পূর্বে এটি এক স্বচ্ছ মাধ্যম পানি থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যম বায়ুতে এসে তোমাদের চোখে পড়ছে। দুইটি তিন্ন মাধ্যমে আলো যদি একই সরল রেখায় চলত তাহলে পেশিলটিকে নিচয়ই সোজা দেখাত। কিন্তু তোমরা দেখতে পেলে এটিকে পানির তলে ভেজো গেছে বলে মনে হচ্ছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে আলো বখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন এটি তার গতিগতের দিক পরিবর্তন করে। আলোক রশ্মির এই দিক পরিবর্তনই হলো আলোর প্রতিসরণ। একটি নির্দিষ্ট স্বচ্ছ মাধ্যমে আলো সরল রেখায় চলে কিন্তু অন্য মাধ্যমে প্রবেশের সাথে সাথেই এটি মাধ্যমের ঘনত্ব অনুসারে দিক পরিবর্তন করে। এখানে উক্তের্য যে লক্ষ্যভাবে আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় এর গতিগতের কোনো দিক পরিবর্তন হয় না।

পাঠ ২ ও ৩ : আলোর প্রতিসরণের নিয়ম

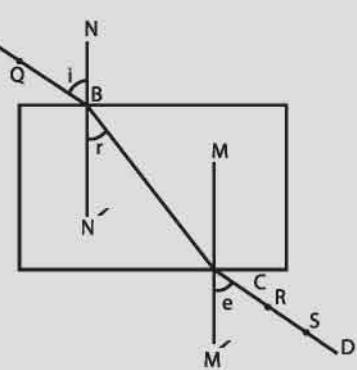
আলোক রশ্মি প্রতিসরণের সময় যে নিয়মগুলো মেনে চলে তা বোঝার জন্য প্রথমেই পরীক্ষাটা করে নাও।

কাজ : কাচফলকে আলোর প্রতিসরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : আলপিন, কাচফলক, ড্রাই বোর্ড

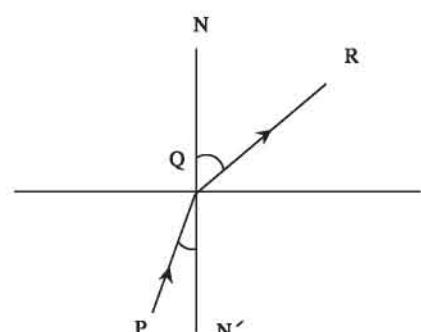
পদ্ধতি : প্রথমেই ড্রাই বোর্ডে একটি সাদা কাগজ আটকিয়ে নাও। কাচফলকটিকে সাদা কাগজের কেন্দ্রে রাখ এবং এর চারদিকে দাগাঞ্চিত কর। এবার কাচফলকটি সরিয়ে নাও এবং একটি আপত্তি রশ্মি AB আঁক। মোটামুটি ৫ সে মি দূরত্বে AB রেখার উপর P এবং Q বিন্দুতে দুটি পিন খাড়াভাবে রাখ। কাচফলকটি পুনরায় পূর্বের স্থানে রাখ এবং পিন যে প্রান্তে রেখেছে তার উন্টো দিক থেকে পিন দুটিকে দেখার চেষ্টা কর (শিক্ষকের নির্দেশনা প্রয়োজন)।

এবার কাচফলকের অপর প্রান্তে R এবং S বিন্দুতে আরও দুটি পিন খাড়াভাবে রাখ যেন কাচফলকের মধ্য দিয়ে P, Q, R ও S একই লাইনে আছে বলে মনে হয়। R এবং S বিন্দু দুটি চিহ্নিত করে পুনরায় কাচফলক সরিয়ে CD লাইন টান। পাশাপাশি BC প্রতিসরিত রশ্মি, অভিলম্ব MM' এবং NN' আঁক। চাঁদা দিয়ে আপত্তন কোণ ABN, প্রতিসরণ কোণ CBN' এবং নির্গত কোণ DCM' চিহ্নিত করে মাপ।



চিত্র ১১.২ : কাচের সাপেক্ষে আলোর প্রতিসরণ

উপরের কাজটি করে তোমরা কী পর্যবেক্ষণ করতে পারছ? এখানে আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যম (বায়ু) থেকে ঘন মাধ্যমে (কাচ) প্রবেশ করেছে। কোণগুলোকে মেপে দেখা যাচ্ছে আপত্তন কোণ i প্রতিসরণ কোণ r অপেক্ষা বড় এবং আপত্তন কোণ i ও নির্গত কোণ e সমান। তাহলে তোমরা কী সিদ্ধান্ত নিতে পার :



চিত্র ১১.৩ : ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ

- আলোক রশ্মি যখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন এটি অভিলম্বের দিকে সরে আসে। এই ক্ষেত্রে আপত্তন কোণ প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা বড় হয়।
- আলোকরশ্মি প্রথমে একটি মাধ্যম থেকে (যেমন বায়ু) অন্য মাধ্যমে (কাচ) প্রতিসরিত হয় এবং পুনরায় একই মাধ্যমে (বায়ু) নির্গত হলে আপত্তন কোণ ও নির্গত কোণ সমান হয়।

* আপত্তি রশি, প্রতিসরিত রশি এবং আপত্তন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদ কলে অভিজ্ঞ অভিলম্ব একই সমতলে থাকে। এছাড়াও উপরের পরীক্ষাটির সাথে অনুসূত পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, আলোক রশি বখন বন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন এটি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। এই ক্ষেত্রে আপত্তন কোণ প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা ছোট হয়। অপর পক্ষে আলোক রশি বখন অভিলম্ব বরাবর আপত্তি হয় তখন আপত্তন কোণ, প্রতিসরণ কোণ ও নির্ণিত কোণের মান শূন্য হয়। একেন্দ্রে আপত্তি রশির দিক পরিবর্তন হয় না।

পাঠ ৪ ও ৫ : প্রতিসরণের বাস্তব প্রয়োগ

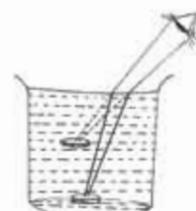
তোমরা এখন নিচের কর্মকৃতি ক্ষেত্রে প্রতিসরণের বাস্তব প্রয়োগ দেখতে পাবে।

(১) একটি সোজা শাঠিকে কাত করে পানিতে ঢুবালে উপর থেকে তাকালে পানিয় শিকর শাঠির অল্পটি কেমন দেখাবে। পর্যবেক্ষণ করে দেখ শাঠিটি ছোট, মোটা এবং উপরে দেখা যাবে বলে যন্তে হচ্ছে? আসলে প্রতিসরণের কলে এমন হচ্ছে। তিনি অনুসারে এখানে বন মাধ্যম পানি থেকে আলো প্রতিসরিত হয়ে হালকা মাধ্যমে তোমার চোখে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। শাঠিটির নিয়ন্ত্রিত অংশের প্রতিটি বিন্দু উপরে উঠে আসে। কলে শাঠিকে খানিকটা উপরে, দৈর্ঘ্যে কম এবং মোটা দেখাব।



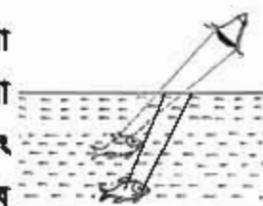
চিত্র ১১.৪ : আলোর প্রতিসরণ

(২) একটি স্টিলের মল বা চিনামাটির বাটি নাও। এরসম মল বা বাটিতে একটি মূল্য রাখ। এখন তোমার চোখকে এমন স্থানে রাখ যেন তুমি মূল্যটিকে দেখতে না পাও। এবার অন্য একজনকে ধীরে ধীরে মল বা গাত্রে পানি ঢালতে বলো। কী হবে এবং কেন হবে তা বলতে পারবে? পর্যবেক্ষণ করে দেখবে আস্তে আস্তে তুমি মূল্যটিকে দেখতে পাবে। এটি প্রতিসরণের ফলে সত্ত্ব হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিসরণের ফলে আলো বন মাধ্যম পানি থেকে হালকা মাধ্যম বায়ুতে তোমার চোখে প্রতিসরিত হওয়ার তুমি মূল্যটির অবস্থা প্রতিবিহীন দেখতে পাছ।



চিত্র ১১.৫ : আলোর প্রতিসরণের ফলে মূল্যায়নের পরিবর্তন

(৩) তুমি কি কখনো মাছ শিকার করেছ? সাধারণত পানিতে যে জাহাজার মাছটি দেখা যাব আসলে কি মাছটি ঐ জাহাজার থাকে? মোটেই না? আসলে যে মাছটি আমরা দেখি এটি হলো তার অবস্থা প্রতিবিহীন। প্রকৃতপক্ষে মাছ থাকে আরেকটু দূরে এবং পড়িতে। যদি তুমি টেটা বা কোচ সিয়ে মাছ মারতে চাও তাহলে এটিকে মারতে হবে আরও নিচে ও দূরে।



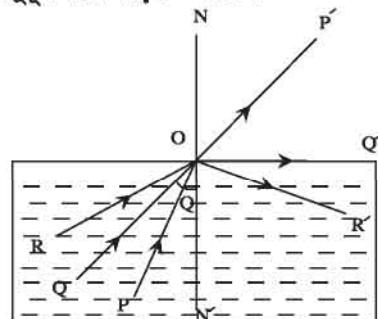
চিত্র ১১.৬ : আলোর প্রতিসরণের ফলে মাছের অবস্থানের পরিবর্তন

(৪) ভূমি নিচয়ই বর্ষাকালে দেখেছ যে পুকুর ঘাট পানিতে তলিয়ে যায়। বর্ষার স্বচ্ছ পানির জন্য পুকুর ঘাটের সিঁড়িটা কোথায় দেখা যায়, আসলে এটিকে যেখানে দেখা যায় এটি থাকে তার চেয়ে একটু নিচে। ফলে অনেকেই বুঝতে না পেরে পড়ে যায়। এমন ঘটনা আরও দেখতে পাবে তোমরা যদি সেটমার্টিন দীপের পাশে অবস্থিত ছেঁড়া দীপে বেড়াতে গিয়ে থাক। ওখানকার স্বচ্ছ পানিতে নিচের পাথর ও শৈবাল অনেক কাছে মনে হয়। এটা হয় মূলত আলোর প্রতিসরণের জন্যই।

পাঠ ৬ ও ৭ : পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ও সংকট কোণ (ক্রান্তি কোণ)

আলোক রশ্মি যখন ঘন স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে হালকা স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন প্রতিসরিত রশ্মি আপতন বিস্তৃতে অঙ্গিত অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। ফলে প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণের চেয়ে বড় হয়। এভাবে আপতন কোণের মান ক্রমশ বাঢ়তে থাকলে প্রতিসরণ কোণও অনুরূপভাবে বাঢ়তে থাকে।

কিন্তু এই নির্দিষ্ট দুটি মাধ্যমের জন্য আপতন কোণের কোনো একটি মানের জন্য (এ ক্ষেত্রে অবশ্যই 90° অপেক্ষা কম) প্রতিসরণ কোণের মান 90° হয় অর্থাৎ প্রতিসরিত রশ্মিটি বিভেদ তল বরাবর চলে আসে। এ ক্ষেত্রে এই আপতন কোণকে আমরা সংকট কোণ বলি। এখন আপতন কোণের মান যদি সংকট কোণের চেয়ে বেশি হয় তখন কী হবে? প্রতিসরণ কোণের মান তো আর 90° এর বেশি হতে পারে না?



চিত্র ১১.৭ : পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ও সংকট কোণ

পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই ক্ষেত্রে আলোক রশ্মি আর প্রতিসরিত না হয়ে বিভেদ তল থেকে একই মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে আসবে। এক্ষেত্রে বিভেদ তল প্রতিফলক হিসেবে কাজ করে এবং এই প্রতিফলন সাধারণ প্রতিফলনের নিয়মানুসারে হয়। এই ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলা হয়। অর্থাৎ ঘন মাধ্যম থেকে আপত্তি রশ্মি তখন দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে সাধারণ প্রতিফলনের নিয়মানুসারে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে আবার ঘন মাধ্যমেই ফিরে আসে।

চিত্র অনুসারে PO আপত্তি রশ্মির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে ছোট, যার প্রতিসরিত রশ্মি হলো OP'। QO আপত্তি রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের সমান। যার প্রতিসরিত রশ্মি হলো OQ' রশ্মি এবং এটি বিভেদ তল বরাবর প্রতিসরিত হয়েছে অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ 90° । RO রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড়। এক্ষেত্রে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়েছে OR' রশ্মিটি প্রতিফলিত রশ্মি।

এখন প্রশ্ন হলো এর সাথে সাধারণ প্রতিফলনের পার্থক্য কোথায়? সাধারণ প্রতিফলনের সময় দেখা যায় আলোর কিছু না কিছু অংশ প্রতিসরিত হয়; কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে দেখা যায় এক্ষেত্রে সমস্ত আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়।

পূর্ণ অভ্যর্জনীণ প্রতিক্রিয়ামের শর্ত

১. আলোক রশ্মি কেবলমাত্র ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যান্ত্রয়ার সময় এটি ঘটে।
২. ঘন মাধ্যমে আপত্তি কোথ অবস্থাই এর মাধ্যম দ্রুতির সংকট কোথের চেয়ে বড় হতে হবে।

পাঠ ৮ : অপটিক্যাল ফাইবার ও ম্যাগনিফাইং গ্লাস

অপটিক্যাল ফাইবার

অপটিক্যাল ফাইবার হলো একটি খুব স্ক্রু কাচতনু। এটা যান্ত্রের চূল্পের মতো টিকল এবং সহজীয়। আলোক রশ্মিকে বহনের কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। আলোক রশ্মি বখন এই কাচতনুর মধ্যে প্রবেশ করে তখন এর দেয়ালে শুনঃগুন পূর্ণ অভ্যর্জনীণ প্রতিক্রিয়াম ঘটিত থাকে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে আলোক রশ্মি কাচতনুর অপর পাশ পিয়ে বের না হওয়া পর্যন্ত। সাধারণত ভাস্কুল মাসবদেহের ডিভারে কোনো অল (যেমন পাকস্বী, কেলন ইত্যাদি দেখার জন্য) যে আলোক নলটি ব্যবহার করে এটি একগুচ্ছ অপটিক্যাল ফাইবারের সমন্বয়ে গঠিত। এছাড়া অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহারের আরেকটি ফেজ হলো টেলিযোগাযোগ। এতে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করার ফলে একই সাথে অনেকগুলো সফ্টকেত প্রেরণ করা যায়। সফ্টকেত যত দূরেই থাক না কেল এর শক্তি ছাপ পাব না।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস

কোনো উভল সেলের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে কোনো ফস্টকে স্বাপন করে সেলের অপর পাশ থেকে বস্তুটিকে দেখলে ফস্টকে একটি সোজা, বিবর্ণিত ও অবাসন্ত্য বিষ দেখা যায়। এখন এই বিষ চোখের যত কাছে গঠিত হবে তোখের বীক্ষণ কোণও তত বড় হবে এবং বিষটিকেও বড় দেখাবে। কিন্তু বিষ চোখের নিকট বিস্তু চেয়ে কাছে গঠিত হলে সেই বিষ আর স্পষ্ট দেখা যায় না।

সুতরাং বিষ বখন তোখের নিকট কিন্তু অর্ধীৎ স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বে গঠিত হয় তখনই তা খালি তোখে সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। ফলে বে সমন্বয় লেখা বা কল্প তোখে পরিকার দেখা যায় না তা স্পষ্ট ও বড় করে দেখার জন্য যত্ন কোকাস দূরত্বের একটি উভল লেপ ব্যবহার করা হয়। উপরুক্ত হ্রেমে আবশ্য এই উভল লেপকে বিবর্ণক কাচ বা পঁচল কাচ বা সরল অঙুরীক্ষণ ব্যবহার করে। এই বর্জে খুব বেশি বিবর্ণন পাওয়া যায় না।

শিককের সহায়তায় তোমরা এ ধরনের ম্যাগনিফাইং গ্লাস দেখতে পাব।

কর্ম-১৫, বিজ্ঞান-অষ্টম প্রেমি



চিত্র ১১.৮ : ম্যাগনিফাইং গ্লাস

পাঠ ৯ ও ১০: মানব চক্ষু

চোখ আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম। চোখ দিয়ে আমরা দেখি। মানব চক্ষুর কার্যপদ্ধতি ছবি তোলার ক্যামেরার মতো। চিত্রে মানব চক্ষুর বিশেষ বিশেষ অংশ দেখানো হয়েছে। প্রধান অংশগুলোর বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো (চিত্র ১১.১)।

(ক) অক্ষিগোলক (Eye-ball) : চোখের কোটরে অবস্থিত এর গোলাকার অংশকে অক্ষিগোলক বলে। একে চক্ষু কোটরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমার চারদিকে ঘুরানো যায়।

(খ) শ্বেতমণ্ডল (Sclera) : এটা অক্ষিগোলকের বাহিরের সাদা, শক্ত ও ঘন ঔপন্যাসিক অস্বচ্ছ আবরণবিশেষ। এটি চক্ষুকে বাহিরের বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট হতে রক্ষা করে এবং চোখের আকৃতি ঠিক রাখে।

(গ) কর্ণিয়া (Cornea) : শ্বেতমণ্ডলের সামনের অংশকে কর্ণিয়া বলে। শ্বেতমণ্ডলের এই অংশ স্বচ্ছ এবং অন্যান্য অংশ অপেক্ষা বাহিরের দিকে অধিকতর উভ্য।

(ঘ) কোরায়েড বা কৃক্ষমণ্ডল (Choroid) : এটি কালো রঙের একটি খিত্রি দারা গঠিত শ্বেতমণ্ডলের ভিতরের গাত্রের আচ্ছাদনবিশেষ। এই কালো রঙের জন্য চোখের ভিতরে প্রবিষ্ট আলোকের প্রতিফলন হয় না।

(ঙ) আইরিস (Iris) : এটি কর্ণিয়ার ঠিক পিছনে অবস্থিত একটি অস্বচ্ছ পর্দা। পর্দাটি স্থান ও লোকবিশেষে বিভিন্ন রঙের নীল, গাঢ়, বাদামি, কালো ইত্যাদি হয়ে থাকে।

(চ) মণি বা তারামণ্ডল (Pupil) : এটি কর্ণিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মাংসপেশিযুক্ত একটি গোলাকার ছিদ্রপথ। মাংসপেশির সংকোচন ও প্রসারণে তারামণ্ডলের আকার পরিবর্তিত হয়।

(ছ) স্ফটিক উভ্যল লেন্স (Crystalline Convex lens) : এটি কর্ণিয়ার পিছনে অবস্থিত জেলির মতো নরম স্বচ্ছ পদার্থে তৈরি একটি উভ্যল লেন্স।

(জ) অফিস্ট বা রেটিনা (Retina) : এটি গোলকের পিছনে অবস্থিত একটি দ্বিদল গোলাপি আলোকহাতী পর্দা। রেটিনার উপর আলো পড়লে ঐ স্নায়ুতন্ত্রে এক প্রকার উভেজনা সৃষ্টি হয় এবং মস্তিষ্কে দর্শনের অনুভূতি জাগায়।

(ঝ) অ্যাকুয়াস হিটমার ও ভিট্রিয়াস হিটমার (Aqueous humour and vitreous humour) : লেন্স ও কর্ণিয়ার মধ্যবর্তী স্থান এক প্রকার স্বচ্ছ জলীয় পদার্থে ভর্তি থাকে। একে বলা হয় অ্যাকুয়াস হিটমার। লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী অংশে এক প্রকার জেলি জাতীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে। একে বলা হয় ভিট্রিয়াস হিটমার।



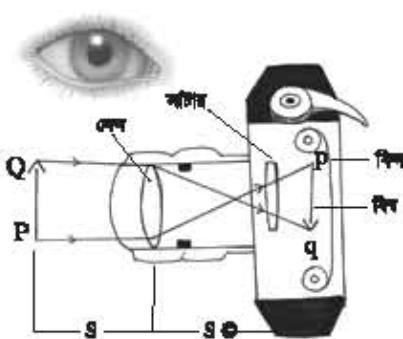
চিত্র ১১.১ : চোখের অভ্যন্তরীণ গঠন

আলোক-চিকিৎসা ক্যামেরা (Photographic Camera)

এই যত্নে আলোকিত বস্তুর চিত্র লেনের সাহায্যে আলোক চিকিৎসা প্রটের উপর গঠন করা হয়। এই কারণে বহুটি আলোক-চিকিৎসা ক্যামেরা সমূহে ক্যামেরা নামে পরিচিত। ক্যামেরার বিভিন্ন অংশ হলো :

- (১) ক্যামেরা বাজে
- (২) ক্যামেরা লেন
- (৩) রেফ্রেজারেশন
- (৪) সাটোর Q
- (৫) পর্দা
- (৬) আলোক চিকিৎসা প্রটে এবং (৭) স্লাইড।

ক্রিয়া (Action) : কোনো বস্তুর ছবি তোলার পূর্বে ক্যামেরার ঘৰ্য্যা কাচের পর্শটি বিসিয়ে বন্ধাটিকে লক্ষকস্তুর PQ এর দিকে ধরে সাটোর খুলে দেওয়া হয়। অভচ্চের ক্যামেরা বাজের দৈর্ঘ্য কমিয়ে বাড়িয়ে তিনি প্রতিবিষ্ট pq এমন অবস্থায় রাখা হয় যাতে লক্ষকস্তুর উপর প্রতিবিষ্ট pq



চিত্র ১১.৩০ : আলোকচিকিৎসা ক্যামেরার পর্ণস

পর্দার উপর গঠিত হয়। ভারাক্রান্তের সাহায্যে প্রতিবিষ্ট প্রয়োজন মতো উচ্চল করা হয়। এরপর ঘৰ্য্যা কাচের পর্শ সরিয়ে সাটোর বন্ধ করা হয় এবং এই স্থানে আলোক চিকিৎসা প্রটেসহ স্লাইড বসানো হয়। এখন স্লাইডের ঢাকনা সরিয়ে সাটোর ও ভারাক্রান্তের মধ্য দিয়ে একটি শির্ষিক্ষ সময় পর্ণত আলোক চিকিৎসা প্রটের উপর আলোক আগতিত হতে দিয়ে শুনোয় ভারাক্রান্ত বন্ধ করা হয়। এই প্রতিবিষ্টাকে একশোভার বা আলোক সম্পাদ (exposure) বলে। এই আগতিত আলোকে আলোক চিকিৎসা প্রটের বৌগ্য মুখে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। এইবাবে স্লাইডের মুখের ঢাকনা বন্ধ করে অবস্থার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আলোক চিকিৎসা প্রটেটিকে স্লাইড হতে বের করে ডেভেলপার (developer) নামক এক প্রকার রাসায়নিক মুখে দ্রুবিয়ে রাখা হয়। সিলভার হ্যালাইড ডেভেলপার বিজ্ঞাপণ (reduction) প্রক্রিয়ায় বৌগ্য ধাতবে পরিণত করে। লক্ষকস্তুর বে অব্দি যত উচ্চল, প্রটের সেই অব্দি তত রূপা জয়া হয় এবং তত বেশি কালো দেখায়। আলোর ফটোফো ও উন্নোচনকার্যের উপর রূপার স্ফরণের পুরাক্রম তারতম্য নির্ভর করে। এখন প্রটেটিকে পানিতে ধূৰে হাইপো (Sodium thiosulphate) নামক মুখে ধূৰানো হয়। এতে প্রটের বে বে অব্দি আলো গড়ে না সেই সকল অবস্থার সিলভার হ্যালাইড গলে যায়। অভচ্চের পরিকার পানি হারা প্রটেট ধূৰে মেলা হয়। এভাবে প্রটেট লক্ষকস্তুর একটি নেপেটিত চিত্র পাওয়া যায়।

নেপেটিত হতে প্রকৃত চিত্র অর্থাৎ পরিচিত মূল্যিত করার জন্য নেপেটিতের নিচে সিলভার হ্যালাইড মুখের প্রস্তুত দেওয়া ফটোফোকের কাগজ স্থাপন করে অর্থ সময়ের অন্য নেপেটিতের উপর আলোক সম্পাদ করতে হয়। এরপর পূর্বে মতো হাইপোর মুখে ফটোফোকের কাগজ দ্রুবিয়ে পরিকার পানিতে ধূৰে পরিণত পাওয়া যায়।

ক্যামেরার সাথে মানব চক্ষুর তুলনা

ক্যামেরা	চক্ষু
১) এতে একটি রূপ্স্ব আলোক প্রকোষ্ঠ থাকে যার ভিতর দিক কালো রঙে রঞ্জিত। কালো রঙের জন্য ক্যামেরার ভিতর প্রবিষ্ট আলোকের প্রতিফলন হয় না।	১) চোখের অক্ষিগোলকের কৃষ্ণ প্রাচীর রূপ্স্ব আলোক প্রকোষ্ঠের মতো ক্রিয়া করে। এই প্রাচীরের জন্য চোখের ভিতর আলোকের প্রতিফলন হয় না।
২) ক্যামেরার সাটারের সাহায্যে লেন্সের মুখ যেকোনো সময়ের জন্য খোলা রাখা যায়।	২) চোখের পাতার সাহায্যে চক্ষু লেন্সের মুখ যেকোনো সময়ের জন্য খোলা রাখা যায়।
৩) ডায়াফ্রামের বৃত্তাকার ছিদ্র পথ ছোট বড় করে প্রতিবিস্ত গঠনের উপযোগী প্রয়োজনীয় আলোক ক্যামেরায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।	৩) আপত্তিৎ আলোকের তীব্রতা ভেদে কর্নিয়ার ছিদ্র পথে আপনা আপনি সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে প্রতিবিস্ত গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আলোক প্রবেশ করতে দেয়।
৪) লেন্সের একটি নির্দিষ্ট ফোকাস দূরত্ব থাকে।	৪) লেন্সের ফোকাস দূরত্ব এর সাথে যুক্ত পেশি বন্ধনীর সাহায্যে পরিবর্তন করা যায়।
৫) এটির অভিসারী লেন্সের সাহায্যে লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিস্ত গ্রহণ করা যায়।	৫) কর্নিয়া, অ্যাকুয়াস হিউমার, চক্ষু লেন্স, ভিট্রিয়াস হিউমার একত্রে একটি অভিসারী লেন্সের মতো ক্রিয়া করে লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিস্ত গঠন করে থাকে।
৬) আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটে লক্ষ্যবস্তুর একটি বাস্তব, উল্টা ও খাটো প্রতিবিস্ত ফেলা হয়।	৬) আলোক সুবেদী অক্ষিপটে লক্ষ্যবস্তুর বাস্তব, উল্টা ও খাটো প্রতিবিস্ত গঠিত হয়।

নতুন শব্দ : আলোর প্রতিসরণ, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন, সংকট কোণ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম—

- একটি নির্দিষ্ট স্বচ্ছ মাধ্যমে আলো সরল রেখায় চলে কিন্তু অন্য মাধ্যমে প্রবেশের সাথে সাথেই মাধ্যমের ঘনত্ব অনুসারে এর দিক পরিবর্তন হয়।
- লহভাবে আলো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় এর গতিপথের কোনো দিক পরিবর্তন হয় না।
- আলোক রশ্মি যখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন এটি অভিলম্বের দিকে সরে আসে। আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন এটি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়।

- পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সময় ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ অবশ্যই এর মাধ্যম দুটির সংকট কোণের চেয়ে বড় হতে হবে।
- মানব চক্ষুর কার্যপ্রণালি আলোক চিত্রগ্রাহী ক্যামেরার মতো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ভিন্ন মাধ্যমে আলোক রশ্মির গতিপথের দিক নির্ভর করে মাধ্যমের _____ উপর।
২. অভিলম্ব বরাবর আপত্তিত আলোক রশ্মি _____ হয়ে নির্গত হয়।
৩. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে _____ কোণ _____ কোণের চেয়ে বড়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আলো ভিন্ন মাধ্যমে গতিপথ পরিবর্তন করে কেন?
২. সংকট কোণ কী? এটি কখন সৃষ্টি হয়?
৩. মানব চোখ ও ক্যামেরার অভিলগ্নো কী কী?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

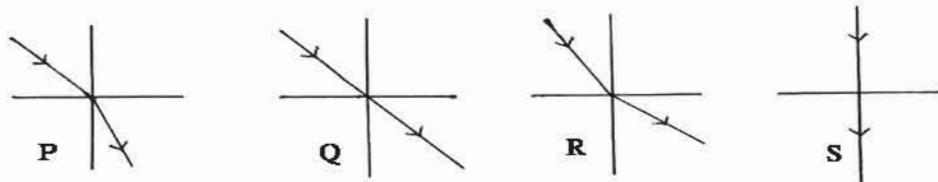
১. চোখের শ্বেতমালের সামনের অংশকে কী বলে?

ক. লেপ	খ. রেটিনা
গ. কর্নিয়া	ঘ. আইরিস
২. অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হয়-
 - i. জ্বালানি কাজে
 - ii. পাকস্থলী পর্যবেক্ষণে
 - iii. টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও



৩. কোন চিত্রে আলোকরশি ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করছে?

ক. P

খ. Q

গ. R

ঘ. S

৪. কোন চিত্রে আপাতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের মান সমান-

ক. P & R

খ. Q & R

গ. Q & S

ঘ. S & P

সূজনশীল প্রশ্ন

১. আনিস একদিন গোসল করতে পুকুর থাটে গেল। সে পুকুরের স্বচ্ছ পানিতে দৃশ্যমান সিডিতে পা রাখল। কিন্তু সিডিটি তার ধারণার চেয়ে নিচে থাকায় সে পড়ে গেল। অন্যদিকে তার ছোট ভাই পুকুরে সড়কি দিয়ে মাছ ধরতে গেল। কিন্তু সঠিক অবস্থানে সড়কি নিক্ষেপ না করায় সে মাছ ধরতে ব্যর্থ হলো।

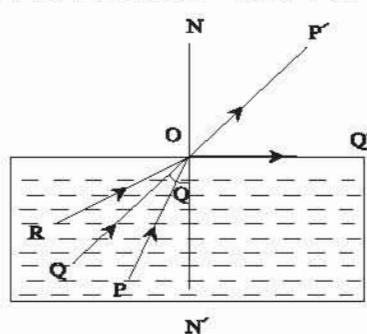
ক. আলোর প্রতিসরণ কী?

খ. আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তনের কারণ কী?

গ. পুকুরে আনিসের পড়ে ঘোওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করলে আনিসের ছোট ভাইয়ের মাছ শিকার করা সম্ভব হতো? যুক্তিসহ মতামত দাও।

২.



ক. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কী?

খ. অপটিক্যাল ফাইবার বলতে কী বোঝায়?

গ. RO রশ্মির গতিগত চিত্র একে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে কোন রশ্মি সংকট কোণ তৈরি করে ব্যাখ্যা কর।

ବାଦମ୍ ଅଧ୍ୟାଯ

ମହାକାଶ ଓ ଉପରେ

ଦିନରେ ବେଳେ ଆକାଶର ଦିକେ ତାକାଲେ ଆମରା ସୁର୍କତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ । ରାତରେ ସେଷମୁଣ୍ଡ ଆକାଶ ଆମାଦେଇ ବିଶିଷ୍ଟ କରେ । ରାତର ଆକାଶ ଧାରେ ଚାନ୍ଦ ଓ ମିଟାର୍ଟ କରେ ଜୁଲା ଅସଂଖ୍ୟ ତାରା । ଏଦେଇ ସୌମର୍ଦ୍ଦ ଆମାଦେଇ ମୂଳ କରେ । ଆମାଦେଇ ଯାଥର ଉପର ରାତରେ ଅନ୍ୟ ଆକାଶ, ଶୀଘ୍ରାହୀନ ଝାଁକା ଜାରିଗା ବା ମହାକାଶ । ସୁର୍ଦ୍ଦ, ଚାନ୍ଦ, ଶର୍ଷ, ଭାଗ୍ନା, ମହାକାଶ, ଛାଯାପଥ, ଲ୍ୟାଲାର୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖା ନା ଦେଖା ସବକିଛୁକେ ନିମ୍ନେ ମହାବିଶ୍ୱ । ମହାବିଶ୍ୱର ସକଳ କିଛୁକେ କଣ କୁ କୁ ନତୋମତିଲିଯି କମ୍ଭୁ । ଏହି ଅଧ୍ୟାଯେ ଆମରା ମହାବିଶ୍ୱ ନିମ୍ନେ ଆମୋଚନା କରିବ ।



ଏହି ଅଧ୍ୟାଯ ପାଠ ଶେବେ ଆମରା—

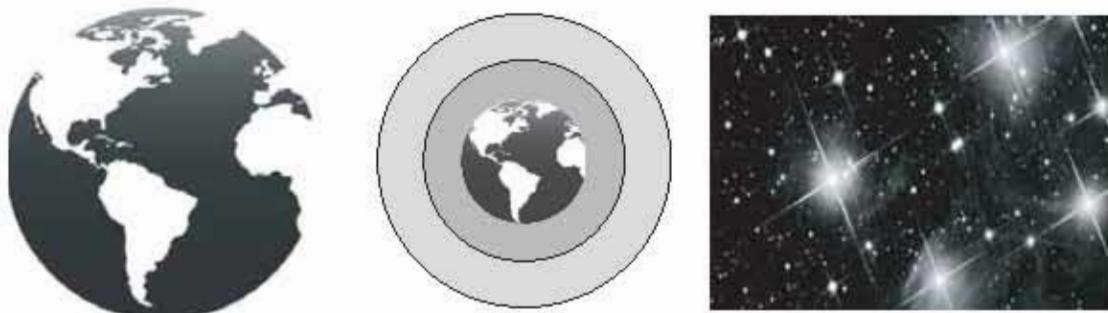
- ମହାକାଶ ଏବଂ ମହାବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପାଇବ;
- ଶାକୁତିକ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପାଇବ;
- ଉପରୀହେତେ କର୍ମପଥେ ଚଳାର ଗତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପାଇବ;
- କୃତ୍ରିମ ଉପରୀହେତେ ବ୍ୟବହାର ଓ ପୁନ୍ରୂପ ବର୍ଣନା କରିବାକୁ ପାଇବ;
- କୃତ୍ରିମ ଉପରୀହେତେ ଅବଧାନ ଉପାର୍ଥି କରିବାକୁ ପାଇବ ।

পাঠ ১ : মহাকাশ

আমরা আকাশের দিকে তাকালে দূর দূরাতের অনেক বস্তু দেখতে পাই। দিনের আকাশের সূর্য রাতের আকাশের শহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি আমাদের চোখে পড়ে। আমরা বাদি দূরবীক্ষণ দিয়ে আকাশের দিকে তাকাই আরও অনেক কিন্তু দেখতে পাই। মৃহস্তি শহ তার উপরাহসহ অপরাহ্ন করতে থাকে। শহ, নক্ষত্র, ছয়াপথ, গ্যালাক্সি ইত্যাদির মাঝখানে যে খালি জায়গা তাকে মহাকাশ বা মহাশূন্য বলে। মহাকাশের দিকে তাকালে আমরা দেখব বস্তু দেখতে পাই তা হলো পদাৰ্থ, বেদন আমাদের এই পৃষ্ঠিকী। মহাকাশ কোনো পদাৰ্থ দিয়ে তৈরি নহ। মহাকাশ কলতে পদাৰ্থের অনুপস্থিতি বোঝায়। এটা হলো সেই ফুঁকা জায়গা বা অকল বেখান দিয়ে পৃষ্ঠিকী, টাই, সূর্য ও তারামার চলাচল করে।

মহাকাশ বা মহাশূন্যের শূরু কোথা থেকে

পৃষ্ঠিকীর মতো এর বায়ুমণ্ডলও মহাকাশে সুযোগে। এজন্য বায়ুমণ্ডলকে মহাকাশের অল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। একে পৃষ্ঠিকীর অল্প হিসেবে বিবেচনা করা হব। তাহলে কেখা থেকে বায়ুমণ্ডলের শেষ এবং মহাকাশের শূরু? অধিকাংশ বায়ুমণ্ডল পৃষ্ঠিকীর কেলি কাছাকাছি। পৃষ্ঠিকী পৃষ্ঠ থেকে দূরবৰ্ত যত বাঢ়তে থাকে বায়ুমণ্ডল তত হালকা হতে থাকে এবং ১৬০ কিলোমিটারের পর বায়ুমণ্ডল থাকে না বললেই চলে। অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন যে, পৃষ্ঠিকী থেকে ১৬০ কিলোমিটার উচ্চতার বায়ুমণ্ডলের শেষ এবং মহাকাশের শূরু।



চিত্র ১২.১ : পৃষ্ঠিকী, বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশ

মহাকাশ কৃতা দূর পর্যন্ত কিস্তৃত? মহাকাশের কি কেনো সীমা আছে? এক সময় মানুষ ভাবত, মহাকাশের সীমা আছে। তারা ভাবত যে, যতো দূর পর্যন্ত সবচেয়ে দূরের কস্তুরি তারা দেখতে পায়, সে পর্যন্তই মহাকাশ বিস্তৃত এবং মহাকাশ বকাকৃতির। পরবর্তীতে দূরবীক্ষণ বজ্র আবিষ্কারের পর তার সৃষ্টিসীমার বাইরের অনেক শহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু ও গ্যালাক্সি দেখতে পেল। তারা সিদ্ধান্তে এলো যে, মহাকাশের কোনো পেৰ নেই।

বক্তব্য : বিভিন্ন বই ও ম্যাপাজিন থেকে জেনে নাও মহাকাশ কী? মহাকাশে কী কী আছে? সবকিছু জোয়াজ খাকার নোট কর। অন্য বস্তুদের সম্মুখীন তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখ। কোনো অধিক গোজা পেলে তা শিককের উপস্থিতিতে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

পাঠ ২ : মহাবিশ্ব

মহাবিশ্ব কী

এ সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে তার সবকিছু নিয়েই মহাবিশ্ব। ক্ষুদ্র পোকামাকড় ও ধূলিকণা থেকে শুরু করে আমাদের এই পৃথিবী, দূর-দূরান্তের গ্রহ-নক্ষত্র, ধূমকেতু, গ্যালাক্সি এবং দেখা না দেখা সবকিছু নিয়েই মহাবিশ্ব। মহাবিশ্ব যে কত বড় তা কেউ জানে না। কেউ জানে না মহাবিশ্বের আকার বা আকৃতি কেমন? অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ নেই। কেউ কেউ এখনও বিশ্বাস করেন মহাবিশ্বের আকার ও আকৃতি আছে। মানুষ প্রতিনিয়তই মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করছে। তবু, এর অনেক কিছুই এখনও অজানা রয়ে গেছে। এই অজানা হয়তো চিরকালই থাকবে।

অনেক কিছু অজানা থাকলেও বিজ্ঞানীরা এটা জানতে পেরেছেন যে, মহাবিশ্বের অনেককিছুই মহাকাশ নামক সীমাহীন ফাঁকা জয়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মহাবিশ্বের কোনো কোনো অংশে এসব বস্তু বা পদার্থের উপস্থিতি অন্য অংশের চেয়ে বেশি। যেসব অংশে পদার্থ বা বস্তু বেশি জড়ে বা ঘনীভূত হয়েছে তাদের বলা হয় গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রজগৎ। গ্যালাক্সি হলো গ্রহ ও নক্ষত্রের এক বৃহৎ দল। আমাদের বাসভূমি পৃথিবী যে গ্যালাক্সিতে অবস্থিত তার নাম ছায়াপথ বা মিঞ্চিওয়ে। এরকম কোটি কোটি গ্যালাক্সি রয়েছে মহাবিশ্বে, যেখানে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র।

গ্যালাক্সিগুলো মহাকাশে ঝাঁকে ঘূরে বেড়ায়, ঠিক যেন বায়ুমণ্ডলে উড়ে বেড়ানো মৌমাছির ঝাঁকের মতো। মহাকাশের সীমাহীনতার তুলনায় গ্যালাক্সি নক্ষত্রগুলোকে খুব কাছাকাছি মনে হয় আসলে তা নয়। এরা পরস্পর থেকে অনেক দূরে। এদের মধ্যকার দূরত্ব সম্পর্কে তোমাদের একটু ধারণা দেওয়া যাক। আমরা জানি যে, আলো এক সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ যেতে পারে। পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার, সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। অন্যদিকে সূর্য থেকে এর সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্র আলফা সেল্টেরিনে আলো পৌছাতে সময় লাগে ৪ বছরের চেয়ে বেশি। এক দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে অন্য দূরবর্তী নক্ষত্রে আলোর পৌছাতে সময় লাগে কয়েক মিলিয়ন বছর। এবার নিচয়ই বুঝতে পারছ নক্ষত্রগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব কতো বেশি আর মহাবিশ্ব কতো বিশাল।

সৌরজগৎ মিঞ্চিওয়ে নামক গ্যালাক্সির অন্তর্গত। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলোকে দপ্দপ্ বা মিট্টিট করে জ্বলতে দেখা যায়। নক্ষত্রগুলো প্রত্যেকে এক একটি জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড বলে এদের সবাইই আলো ও উভাপ আছে। মহাবিশ্বের নক্ষত্রগুলোকে তাদের আলোর তীব্রতা অনুসারে লাল, নীল, হলুদ এই তিন বর্ণে ভাগ করা হয়েছে। অতি বৃহৎ নক্ষত্রের রং লাল, মাঝারি নক্ষত্রের রং হলুদ এবং ছোট নক্ষত্রের রং নীল হয়ে থাকে।

মহাবিশ্বের উৎপত্তি হলো কীভাবে

মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত যেসব তত্ত্ব আছে তার মধ্যে বহুল প্রচলিত হলো ‘বিগব্যাঙ তত্ত্ব’। বাংলায় একে বলা হয় ‘মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব’। এই তত্ত্বের মতে মহাবিশ্ব একসময় অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ঘনরূপে বা ঘন অবস্থায় ছিল যা অতি দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল। দ্রুত প্রসারণের ফলে মহাবিশ্ব ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং বর্তমান প্রসারণশীল অবস্থায় পৌছায়। অতি সম্প্রতি জানা গেছে যে, বিগব্যাঙ বা মহাবিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছিল প্রায় ফর্মা-১৬, বিজ্ঞান-অষ্টম শ্রেণি

১৩.৭৫ বিলিয়ন বছর (১৩৭৫ কোটি বছর) পূর্বে এবং এটাই মহাবিশ্বের বয়স। বিশ্বজাত তত্ত্ব একটি বড় পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যা বেশিরভাগ বিজ্ঞানী ধ্রুণ করেছেন। এর কারণ, জ্যোতির্বিদদের পর্যবেক্ষিত প্রায় সকল ঘটনাই এই তত্ত্ব সঠিক ও ব্যাখ্যকৃত ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। বর্তমান কালের বিষয়াত পদার্থবিজ্ঞানী স্টোরেন হকিং এই তত্ত্বের পক্ষে সুন্দর দেন এবং পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

পাঠ ৩ : আকৃতিক শহ ও উপগ্রহ

আমরা আসেই বলেছি যে প্রাচীনতমে আমরা বাস করি তার নাম ছায়াগ্রহ। এই ছায়াগ্রহে রয়েছে সূর্য ও এর গরিবার যাকে সৌরজগৎ বলা হয়। সৌরজগতে রয়েছে সূর্য ও একে ধিরে আবর্তনশীল ৮টি শহ। বেলব বস্তু সূর্যের চারাদিকে ঘূর ভাবের ব্যাপার এই। সূর্যকে ধিরে আবর্তনশীল আটটি শহ হলো বৃথ, শূক্র, গৃহিণী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন।



চিত্র ১২.২ : সৌরজগৎ

কোনো কোনো শহের রয়েছে একাধিক উপগ্রহ। যারা শহকে কেন্দ্র করে ঘূরে এনের ব্যাপার এই উপগ্রহ। বেদন পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘূরে চাঁদ তাই চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। সূত্রাং পৃথিবী সূর্যের একটি শহ এবং চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। নিচের কাষটি কর তাহলে শহ ও উপগ্রহের গতি সূচাতে গোরবে।

কাষ : শহ ও উপগ্রহের আবর্তন সম্পর্কে জানা

গতি : প্রেশিকফে বা প্রেশিকফের বাইরে একটি যৌকা আয়গায় যাও। তোমার কোনো কান্দুকে একটি নির্দিষ্ট আয়গায় দৌড়াতে বলো। তাকে কেন্দ্র করে একটি বড় বৃত্ত দৌক। এই বৃত্তের রেখার উপর ভূমি দৌড়াও। এবার তোমার অন্য কোনো কান্দুকে তোমাকে কেন্দ্র করে একটি ছোট বৃত্ত দৌকতে বলো। তোমার কান্দুকে এই বৃত্ত পথে তোমার চারাদিকে ঘূরতে বলো। এখন ভূমি তোমাকে ধিরে আবর্তনকরী বন্ধুসহ প্রথম বন্ধুর চারাদিকে বড় বৃত্তগ্রহে ঘূরতে দৌক। এখানে তোমার প্রথম বন্ধু হলো সূর্য, ভূমি হলো পৃথিবী আর তোমার ধিরীয় বন্ধু হলো চাঁদ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা শহের অন্যের সময় একেকটি নকশাকে ধিরে কয়েকটি মহাজগতিক মেষ আবর্তিত হতো। এরা নকশের আকর্ষণে ঘনিষ্ঠুত হয়ে অবশেষে জমাট বেঁধে শহে রূপান্বিত হয়। এভাবেই আবার শহের চারাগালে অথা মহাজগতিক মেষ থেকেই উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এসব উপগ্রহ হলো আকৃতিক উপগ্রহ আছে।^১ এরা এদের প্রত্যেক যাধ্যাকর্ত্ত্ব বলের প্রভাবে শহের চারাদিকে ঘূরে।

শহ ও উপগ্রহের কেন্দ্রে আলো ও ঔপন্বাস নেই। এদের উপর সূর্যের আলো পড়ে তা প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীর ১টি, মঙ্গলের ২টি, বৃহস্পতির ৬টি, শনির ৬২টি, ইউরেনাসের ২৭টি এবং নেপচুনের ১৪টি আকৃতিক উপগ্রহ আছে।^১ এরা এদের প্রত্যেক যাধ্যাকর্ত্ত্ব বলের প্রভাবে শহের চারাদিকে ঘূরে।

পাঠ ৪ : কৃত্রিম উপগ্রহ ও এর ইতিহাস

মানুষের পাঠানো যেসব বস্তু বা মহাকাশযান পৃথিবীকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে তাদের বলা হয় কৃত্রিম উপগ্রহ। রকেটের সাহায্যে এদের উৎক্ষেপণ করা হয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টানের প্রভাবে টাঁদের মতো এরা এদের কক্ষপথে ঘুরে। কৃত্রিম উপগ্রহ টাঁদের তুলনায় অনেক ছোট এবং টাঁদের তুলনায় অনেক নিচু দিয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে। নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরার জন্য এদের প্রয়োজনীয় দ্রুতি থাকতে হয়। পৃথিবী থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের উচ্চতা যত বেশি হবে তার দ্রুতি হবে তত কম। ফলে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে এরা বেশি সময় লেবে। আমরা জানি পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় এর নিজ অক্ষের চারদিকে একবার পাঁক খায়। সুতরাং, কোনো কৃত্রিম উপগ্রহ যদি ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসে তাহলে একে পৃথিবী থেকে স্থির বলে মনে হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশ যাত্রার ইতিহাস খুব একটা পুরোনো নয়, একেবারেই নতুন। তোমরা জেনে অবাক হবে যে, মহাকাশযাত্রার প্রথম পদক্ষেপটির সূচনা হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। এই যাত্রার সূচনা করে তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন। তারা স্পুটনিক-১ নামক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে। স্পুটনিক শব্দের অর্থ হলো অমগ্নসজ্জী। একই বছর ২ৱা নভেম্বর স্পুটনিক-২ নামক আরেকটি কৃত্রিম উপগ্রহ তারা মহাকাশে পাঠান। প্রথম মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের নাম এক্সপ্লোরার-১। এই উপগ্রহ ১৯৫৮ সালের ২ৱা ফেব্রুয়ারি মহাকাশে পাঠানো হয়। ভস্টক-১ নামক সোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষ নিয়ে প্রথম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। যে মানুষটি প্রথম মহাকাশে গিয়েছিলেন তার নাম সোভিয়েট ইউনিয়নের ইউরি গ্যাগারিন। তিনি ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল ভস্টক-১ কৃত্রিম উপগ্রহে চড়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন। ভস্টক-৬ নামক কৃত্রিম উপগ্রহে (মহাকাশযান) চড়ে প্রথম সোভিয়েট নারী মহাকাশচারি ডেনেনিট্রা তেরেসকোভা মহাকাশে ঘুরে আসেন ১৯৬৩ সালে। ইনটেলসেট-১ কৃত্রিম উপগ্রহকে পাঠানো হয় বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য যোগাযোগ উপগ্রহ হিসেবে। রিমোটসেন্সি বা দূর অনুধাবনের জন্য পাঠানো প্রথম উপগ্রহ হলো ল্যান্ডসেট-১। একে পাঠানো হয় ১৯৭২ সালে। আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপনের জন্য অ্যাপোলো-সয়োজ টেস্ট প্রজেক্ট নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রথম পাঠানো হয় ১৯৭৫ সালে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এ পর্যন্ত হাজার হাজার কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে। কয়েক শত কৃত্রিম উপগ্রহ বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং হাজার হাজার অব্যবহৃত কৃত্রিম উপগ্রহ বা তাদের অংশবিশেষ মহাকাশ ধ্বন্দ্বাবশেষ হিসেবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

পাঠ ৫ : কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথে চলা বা ভ্রমণ

পৃথিবীর চারদিকে ঘুরার জন্য কেন্দ্রমুখি বল বা টানের প্রয়োজন হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল বা অভিকর্ষ বলই এই কেন্দ্রমুখি বল জোগায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, যদি কোনো কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর প্রায় ২৫০ কিলোমিটার উপরে তুলে পৃথিবী পৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৮ কিলোমিটার বেগ দেওয়া যায় তবে কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে। কিন্তু এত উপরে তুলে কোনো বস্তুকে এত বেশি বেগ দেওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ, বায়ুস্তরের সাথে তীব্র সংঘর্ষে এত তাপ উৎপন্ন হবে যে, বস্তুটি

পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তিনটি রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় ভুলে পরে ভূগ্রের সমান্তরালে বেগ দেওয়া হয়। তখন কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর চারপাশে ঘূরতে থাকে। কৃত্রিম উপগ্রহ কীভাবে পৃথিবীর চারদিকে ঘূরে তা জানতে নিচের কাজটি কর।

কাজ : পৃথিবীর চারদিকে কৃত্রিম উপগ্রহের আবর্তন সম্পর্কে জানা

পদ্ধতি : একটি টেলিস বলকে প্রায় ১ মিটার লম্বা একটি সূতার এক মাথায় শক্ত করে বাঁধ। এবার সূতার অপর মাথা এক হাতে শক্ত করে ধরে অপর হাতে বলটি ভূগ্রের সমান্তরালে ছুড়ে দাও। দেখবে বলটি সামনের দিকে সাধান্য গিয়ে বৃত্তাকার পথে যেতে চাইছে। সূতার মাথা ধরে বলটি ঘূরালে বলটি সূতার টানে বৃত্তাকার পথে ঘূরবে। এখানে ভূমি হলে পৃথিবী, বল হলো কৃত্রিম উপগ্রহ এবং সূতার টান হলো অভিকর্ষ বল। বৃত্তাকার পথটি হলো কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ।



এখন নিচয়ই বুঝতে পারছ উৎক্ষেপণের পর কৃত্রিম উপগ্রহ কেন পৃথিবীর চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূরছে।

পাঠ ৬ ও ৭ : কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার ও প্রযুক্তি

কৃত্রিম উপগ্রহ নানান রকম কাজে ব্যবহার করা হয়। ব্যবহার অনুসারে এদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন— যোগাযোগ উপগ্রহ, আবহাওয়া উপগ্রহ, পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ, সামরিক বা গোরেন্স উপগ্রহ, নৌপরিবহন উপগ্রহ ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক উপগ্রহ।

যোগাযোগ উপগ্রহ

আমরা অনেকে ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকা বা অন্য যেকোনো দেশে আজীব-স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলে থাকি। আমরা যখন টেলিফোনে অন্য দেশের কারো সাথে কথা বলি, তখন আমাদের দেশের কোনো ডিশ এরিয়েল থেকে একটি বেতার সঙ্কেত কৃত্রিম উপগ্রহে প্রেরিত হয়। উপগ্রহটি সঙ্কেতটিকে অপর দেশের কোনো একটি ডিশ এরিয়েলে পাঠিয়ে দেয়, সেখান থেকে যার সাথে কথা বলছি তার টেলিফোনে পৌছায়।

এছাড়া আমরা বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ বা অলিম্পিক গেইম টেলিভিশনে দেখে থাকি। অন্যদেশ থেকে একইভাবে বেতার সঙ্কেত কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আমাদের টেলিভিশনে পৌছায়। যে দেশে খেলা হচ্ছে সে দেশ থেকে ডিশ এরিয়েলের মাধ্যমে একটি সঙ্কেত উপগ্রহে পাঠানো হয়। উপগ্রহ সঙ্কেতটি পুনরায় আমাদের দেশের কোনো ডিশ এরিয়েলে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে আমাদের টেলিভিশনে পৌছে। কৃত্রিম উপগ্রহ এখানে রিলে স্টেশনের কাজ করে। এই উপগ্রহ টেলিভিশন প্রোগ্রাম ও টেলিফোন সংবাদ পৃথিবীর ১০

আবহাওয়া উপগ্রহ

আমরা টেলিভিশন ও রেডিওতে আবহাওয়ার খবর শুনি এবং পত্রিকায় আবহাওয়ার খবর পড়ি। এসব মাধ্যম আবহাওয়ার এই পূর্বাভাস কোথা থেকে পায়? আবহাওয়া উপগ্রহ আবহাওয়ার পূর্বাভাসদানকারী ব্যক্তিদের জানিয়ে দেয় এই দিনের বা পরবর্তী কয়েক দিনের আবহাওয়া কেমন হবে? কোথায় মেষ সূর্য হচ্ছে? কোন দিকে মেষ যাচ্ছে? কোথায় কখন বৃষ্টি হতে পারে? বায়ু প্রবাহ, সাইক্লোন সূর্য হওয়া, কোথায় ঘনীভূত হচ্ছে, কোন দিকে আঘাত হানতে পারে তার সবকিছু এই উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ করে পূর্বাভাস দিতে পারে। এজন্য এই উপগ্রহের নাম আবহাওয়া উপগ্রহ।

পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ

এই উপগ্রহ পৃথিবীগৃহের সুস্পষ্ট চিত্র দিতে পারে। সমুদ্রে কোথায় কোন জাহাজ থেকে তেল চুইয়ে পরিবেশ দূষণ করছে? কোন শহরের বায়ু দূষিত ও ময়লা, এই উপগ্রহের সাহায্যে ছবি তুলে জানা যেতে পারে। কোন মাঠে ফসল ভালো হচ্ছে, কোনো ফসলে রোগবালাই বা পোকামাকড় আক্রমণ করেছে কি না, তা জানতে তথ্য ও ছবি এই উপগ্রহ পাঠাতে পারে। বনে কোথায় আগুন লেগেছে, কোনো জাহাজের যাত্রাপথে হিমবাহ আছে কি না তা জানতে এই উপগ্রহ সহায়তা করতে পারে। মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ নির্ণয়ের জন্যও এই উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়।

সামরিক বা গোয়েন্দা উপগ্রহ

গোয়েন্দার কাজ করার জন্য সামরিক বাহিনীতে এই উপগ্রহ ব্যবহার করা হয় তাই এর নাম গোয়েন্দা উপগ্রহ। প্রতিপক্ষ যোদ্ধারা কোথায় লুকিয়ে আছে, গোপনে তারা কোথাও অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে কি না, কোনো গোপন আক্রমণ হচ্ছে কি না ইত্যাদি খবর সঞ্চারের জন্য এই উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়।

নৌপরিবহন উপগ্রহ

আমরা গাড়ি, বিমান বা জাহাজে ভ্রমণ করে থাকি। বিশাল সমুদ্রে জাহাজ কী করে এর অবস্থান নির্ণয় করে? কোন বিমান আকাশে কোথায় আছে তা কী করে জানে? এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাবার সময় কী করে বুঝতে পারে কোথায় আছে? গাড়ি, সামুদ্রিক জাহাজ ও বিমান এদের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য নৌপরিবহন উপগ্রহের সহায়তা নিয়ে থাকে।

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক উপগ্রহ

এই উপগ্রহে রাখা টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণযন্ত্র মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিভিন্ন অঙ্গনা তথ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দিয়ে থাকে।

২০ নতুন শব্দ

মহাকাশ, মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সি, ছায়াপথ, সৌরজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ, কৃত্রিম উপগ্রহ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম—

- গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, গ্যালাক্সি ইত্যাদির মাঝখানে যে খালি জায়গা থাকে তাকে মহাকাশ বা মহাশূন্য বলে।
মহাকাশ কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি নয়।
- সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, তারা, মহাকাশ, ছায়াপথ, গ্যালাক্সি ইত্যাদি দেখা না দেখা সবকিছুকে নিয়ে মহাবিশ্ব।
- মহাবিশ্বের যেসব অংশে পদার্থ বা বস্তু বেশি জড়ো বা ঘনীভূত হয়েছে তাদের বলা হয় গ্যালাক্সি।
- যে গ্যালাক্সিতে আমরা বাস করি তার নাম ছায়াপথ। এই ছায়াপথেই রয়েছে সৌরজগৎ।
- সূর্য একটি নক্ষত্র। সূর্যের রয়েছে আটটি গ্রহ। এরা হলো— বৃথ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন।
- নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে যারা ঘুরে তাদের বলা হয় গ্রহ। গ্রহকে কেন্দ্র করে যারা ঘুরে তাদের বলা হয় উপগ্রহ।
- মানুষের পাঠানো যেসব মহাকাশবান পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে তাদের বলা হয় কৃত্রিম উপগ্রহ।
- কাজ অনুসারে কৃত্রিম উপগ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন— যোগাযোগ উপগ্রহ, আবহাওয়া উপগ্রহ, পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ, সামরিক বা গোয়েন্দা উপগ্রহ, নৌপরিবহন উপগ্রহ, জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক উপগ্রহ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান প্রৱণ কর

১. মহাবিশ্বের অসীম ফাঁকা স্থানকে _____ বলে।
২. গ্রহকে আবর্তনকারী বস্তুদের বলা হয় _____।
৩. সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সিতে রয়েছে তার নাম _____।
৪. মানুষের তৈরি _____ হলো কৃত্রিম উপগ্রহ।
৫. যে নারী প্রথম _____ ভ্রমণ করেছেন তার নাম ডেলেনটিনা তেরেসকোভা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মহাকাশ ও মহাশূন্যের মধ্যে পার্থক্য কী?
২. মহাবিশ্বের বিশালতা ব্যাখ্যা কর।
৩. গ্যালাক্সি কী? আমরা কোন গ্যালাক্সিতে বাস করি?
৪. সৌরজগৎ কাকে বলে? এখানে কী কী গ্রহ আছে?
৫. কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারাদিকে কেন ঘুরে?
৬. উপগ্রহ মানুষের অনেক কাজে লাগে— ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বৃহস্পতি গ্রহের কয়টি উপগ্রহ?

- ক. ১৪টি
গ. ৬২টি

- খ. ২৭টি
ঘ. ৬৭টি

২. গ্যালাক্সি হলো-

- i. মহাবিশ্বের কোনো স্থানে ঘনীভূত পদার্থের আধিক্য
- ii. গ্রহ, নক্ষত্রের মাঝে অবস্থিত খালি জায়গা
- iii. নক্ষত্রকে বেস্ট্রি করে পরিভ্রমণকারী জ্যোতিষক

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
গ. i ও iii

- খ. ii
ঘ. ii ও iii

নিচের ছক্টি অবলম্বনে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ক্রত্রিম উপগ্রহ	কাজ
M	জাহাজের যাত্রাপথে হিমবাহের উপস্থিতি নির্ণয়
N	আকাশে বিমানের অবস্থান নির্ণয়
O	মহাবিশ্ব সম্পর্কে অজানা তথ্য নির্ণয়
P	ফসলে পোকামাকড়ের আক্রমণের তথ্য ও ছবি সংগ্রহ

৩. N উপগ্রহটি কী?

- ক. যোগাযোগ উপগ্রহ
গ. জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক উপগ্রহ
- খ. নৌ পরিবহন উপগ্রহ
ঘ. পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ

৪. ছকে উল্লিখিত কাজের ভিত্তিতে কোন দুটি উপগ্রহ একই প্রকৃতির?

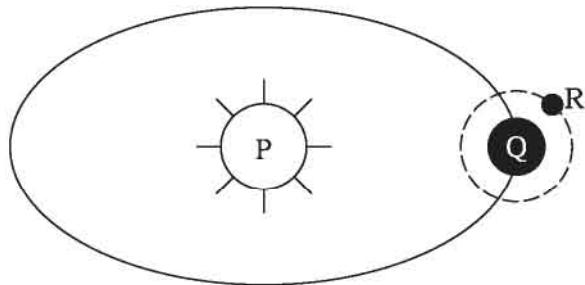
- ক. M ও N
গ. O ও P
- খ. N ও O
ঘ. M ও P

সূজনশীল প্রশ্ন

১. মাছ ধরার নৌকার মালিক বকর সওদাগর রেডিওতে শুনতে পেলেন বজোগসাগরের দক্ষিণে ঘূর্ণিবাড় ঘনীভূত হচ্ছে। যেকোনো সময় উপকূলে আঘাত হানতে পারে। কুকুরবাজার সমুদ্রক্ষেত্রকে তিনি নন্দের বিপদ সংজ্ঞেত দেখাতে বলা হয়েছে এবং মাছ ধরার নৌকাকে উপকূলের কাছাকাছি থাকতে বলা হয়েছে।

- ক. কৃত্রিম উপগ্রহ কাকে বলে?
- খ. মহাবিশ্ব বলতে কী বোঝায়?
- গ. রেডিও অফিসের ঘূর্ণিবাড় ঘনীভূত হওয়ার তথ্য পাওয়াতে বকর সওদাগরের কী উপকার হলো?
- ঘ. আবহাওয়া বার্তাটি বকর সওদাগর ও উপকূলবাসীদের কীভাবে সতর্ক করতে পারে। ব্যাখ্যা কর।

২.



- ক. মহাশূন্য কাকে বলে?
- খ. চাঁদ ও কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।
- গ. P কোন ধরনের জ্যোতিষ্ক? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. P, Q ও R সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর।

প্রজেক্ট : শিক্ষকের সহায়তায় সৌরজগতের একটি মডেল তৈরি কর।

ଅରୋଦଶ ଅଧ୍ୟାଯ

ଆଦ୍ୟ ଓ ପୁଣ୍ଡି

ବର୍ତ୍ତମାନେ ଗୃହସୀତେ ବାସ କରାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଲାଖ ଲାଖ ବିଭିନ୍ନ ଜାତେର ଥାଏ । ଏଦେର ଆକାର-ଆକୃତି ଓ ବୈଶିକ୍ତ୍ୟ ସେମନ ଡିଲ୍ଲିତର ଫେମନ ବିଚିତ୍ର ଏଦେର ଜୀବନଧାରା, ସଂଭାବ, ଆଦ୍ୟ ଓ ଆଦ୍ୟାହାର ପରମାଣୁ । ମେହେରେ ବୃଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ଓ ବୈଚ ଧାକାର ଜନ୍ୟ ଥୀବିଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଦ୍ୟ ଅଗରିହାର୍ମ । ଅତଏବ ମାନସଦେହଙ୍କେ ସୁଖ-ସକଳ ଜୀବନର ଜଳାଓ ଆଦ୍ୟ ଅଗରିହାର୍ମ । ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୁଣ୍ଡି ସଞ୍ଚାରେ ଯେବେଳେ ଖାଇଲା ଅର୍ଜନ କରା ଦେହକେ ସୁଖ ଜୀବନ ପୂର୍ବଶର୍ତ୍ତ । ଆହିସ, ଶର୍କରା, ଜେଲ ଓ ଚର୍ବି ଇତ୍ୟାଦି ଜୈବବୌଗ ଆମରା ଆଦ୍ୟ ହିସେବେ ପରମ କରି । ଆମ ଏ ସକଳ ଆଦ୍ୟ ଥେବେ ପୁଣ୍ଡି ପାଇ । ଆଦ୍ୟ ବଳତେ ଦେଇ ସକଳ ଜୈବ ଉପାଦାନକେ ବୋରାଯ ଦେଖିଲୋ ଜୀବର ଦେଇ ଗଠନ, କରପୂରମ ଓ ଶକ୍ତି ଉପାଦାନେ ବାବଦତ ହୁଏ । ଆମ ଏ ଆଦ୍ୟ ଥେବେ ଜୀବ ପୁଣ୍ଡି ଲାଭ କରୋ ।



ଏ ଅଧ୍ୟାଯ ପାଠ ଶେବେ ଆମରା—

- ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକିଳ୍ପନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଇ ପାଇବ;
- ପୁଣ୍ଡିର ଅଭାବଜନିତ ଝୋଗ ନିର୍ମଳ ଓ ଥକିଝୋଧେର ଉପାର୍କ କରିବା କରାଇ ପାଇବ;
- ଚାହିସା ଅନୁଯାୟୀ ଆଦ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ପାଇବ ।

পাঠ ১ : পুষ্টি, পুষ্টিমান ও খাদ্য উপাদান

ইঞ্জিন চালানোর জন্য কয়লা, ডিজেল, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি উপাদান ব্যবহার করা হয়। বলতে পারো, এ জ্বালানিগুলোর কাজ কী? এ জ্বালানিগুলো পুড়ে শক্তি উৎপন্ন করে। আর এ শক্তি যানবাহনগুলোকে গতি দান করে। যানবাহনগুলো চলতে থাকে। মানবদেহকে একটি ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করা হয়। অন্যান্য ইঞ্জিনের মতো আমাদের দেহ নামক ইঞ্জিনটি চালানোর জন্য চাই শক্তি। মানবদেহ এ শক্তি কোথা থেকে পায়? খাদ্য আমাদের দেহের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে ও শক্তি যোগায়। খাদ্যের মূল উৎস সজীব দেহ। খাদ্য মূলত বিভিন্ন যৌগের সমন্বয়ে গঠিত। আমরা উষ্ণিদ ও প্রাণী থেকে মূলত খাদ্য পাই। খাদ্য বলতে সেই জৈব উপাদানকে বোঝায় যা জীবের দেহ গঠন ও শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যের মধ্যে যে সকল উপাদান বা পুষ্টিদ্রব্য থাকে তা আমাদের দেহে প্রধানত তিনটি কাজ করে। যথা—

- জীবের বৃদ্ধি সাধন, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- তাপশক্তি ও কর্মশক্তি প্রদান।
- রোগ প্রতিরোধ, সুস্থতা বিধান ও শারীরবৃত্তীয় কাজ (যেমন : পরিপাক, শ্বসন, রেচন ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে।

পুষ্টি ও পুষ্টিমান

পুষ্টি একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াতে খাদ্যবস্তু খাওয়ার পরে পরিপাক হয় এবং জটিল খাদ্য উপাদানগুলো ভেঙ্গে সরল উপাদানে পরিণত হয়। দেহ এসব সরল উপাদান শোষণ করে নেয়। শোষণের পরে খাদ্য উপাদানগুলো দেহের সকল অঞ্জের ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের পুনর্গঠন ও দেহের বৃদ্ধির জন্য নতুন কোষ গঠন করে। তাছাড়া তাপ উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুষ্টি যোগায়। দেহে খাদ্যের এই সকল কাজই পুষ্টি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। অর্থাৎ পুষ্টি উপাদান হচ্ছে প্রতিদিনের খাবারের গুণসম্পন্ন সেব উপাদান যা দেহের শক্তি ও যথাযথ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে, মেধা ও বৃদ্ধি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ করে, অসুখ-বিসুখ থেকে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করে এবং মানুষকে কর্মক্ষম করে।

কোন খাদ্যে কী পরিমাণ ও কত রকম খাদ্য উপাদান থাকে তার উপর নির্ভর করে ঐ খাদ্যের পুষ্টিমান বা পুষ্টিমূল্য। যেমন— সিদ্ধ চালে ৭৯% শ্বেতসার, ৬% স্নেহ পদার্থ থাকে। এছাড়া সামান্য পরিমাণ আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। ১০০ গ্রাম চাল থেকে ৩৪৫-৩৪৯ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। সিদ্ধ চালে শ্বেতসার, আমিষ ও ভিটামিন থাকে। কিন্তু এতে শ্বেতসারের পরিমাণ বেশি থাকে। অতএব চাল একটি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ।

কোনো খাদ্য উপাদানের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জানতে হলে ঐ খাদ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। খাদ্যের প্রকৃতি বলতে এটা কি মিশ্র খাদ্য, নাকি বিশুদ্ধ খাদ্য তাকে বোঝায়। মিশ্র খাদ্যে একের অধিক পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। যেমন— দুধ, ডিম, খিচুরি, পেয়ারা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিশুদ্ধ খাদ্যে শুধুমাত্র একটি উপাদান থাকে। যেমন— চিনি, ঘুকোজ। এতে শর্করা ছাড়া আর কোনো উপাদান থাকে না।

খাদ্য উপাদান

খাদ্য অনেকসূলো রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এ রাসায়নিক উপাদানগুলোকে খাদ্য উপাদান বলা হয়। কেবলমাত্র একটি উপাদান দিয়ে গঠিত এমন খাদ্যবস্তুর সত্য খুবই কম। উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

১. আমিষ বা প্রোটিন - ক্রয়পুরুশ, বৃক্ষিসাধন ও দেহ গঠন করে।
২. শর্করা বা শ্রেণিসাধন - শক্তি উৎপাদন করে।
৩. প্রেৰ বা চার্বি - ভাগ ও শক্তি উৎপাদন করে।

এছাড়া অন্যান্য তিন প্রকার উপাদান বিশেষ প্রয়োজন। যথা—

১. খাদ্যাশ বা ভিটামিন - ক্লো অক্সিজেন, শক্তি বৃদ্ধি, বিকল্প জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার উচ্চীপদা যোগায়।
২. খনিজ সবজ - বিকল্প জৈবিক প্রক্রিয়ার অংশ নেয়।
৩. পানি - দেহে পানির সমতা রক্ষা করে, কোবের পুণ্যবলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষ অভ্যাধুসমূহকে ধারণ ও কাশের সমতা রক্ষা করে।

পার্ট ২ ও ৩ : শর্করা ও আমিষ

শর্করা বা শ্রেণিসাধন

আমরা সামাজিক মুটি, মুড়ি, চিঙ্গা, শৈটেম্পটি ইত্যাদি খাই। এগুলো শর্করা জাতীয় খাদ্য। শর্করা শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের বিকল্প উপাদানগুলোর মধ্যে শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে। শর্করা সহজপাত্য। সব শর্করাই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। শর্করা দেহের কর্মক্ষমতা বোধায়। শুকেজ এক ধরনের সরল শর্করা।

রাসায়নিক গঠনপথটি অনুসারে সব শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। একটি যাত্র শর্করা অণু দিয়ে গঠিত হয় মনোস্ট্যাকারাইড। একে সরল শর্করাও বলে। বি-শর্করা ও বহু শর্করা পরিপন্থকের মাধ্যমে সরল শর্করায় পরিপন্থ হয়ে দেহের পোকশবোপ্ত্য হয়। মানবদেহ পরিপুর্ণির জন্য সরল শর্করা অত্যধিক পুরুষসূর্য। কর্তৃপ মানবদেহ পুরুষার সরল শর্করা পুরুষ করতে পারে। শুকেজ, কুকটোজ, গ্যালাকটোজ এ তিনটি শর্করার মধ্যে শুকেজ রান্ধন মাধ্যমে সারা দেহে পরিবাহিত হয়।



চিত্র ১৩.১ : শর্করা জাতীয় খাদ্য

শর্করা, প্রেৰ ও আমিষের মধ্যে শর্করা সর্বাংসেক্ষণ সহজপাত্য। দেহে শোষিত হওয়ার পর শর্করা খুব কম সময়ে ভাগ উৎপন্ন করে দেহে শক্তি বোঝায়। ১ গ্রাম শর্করা ৪ কিলোক্যালরি ভাগ উৎপন্ন করে। মানবদেহে আর ৩০০-৪০০ গ্রাম শর্করা জয়া থাকতে পারে। এ পরিমাণ শর্করা ১২০০-১৬০০ কিলোক্যালরি ভাগ উৎপন্ন করে দেহের শক্তি বোঝায়।

বরফ, দেহের ওজন, উচ্চতা, পরিশ্রমের মাত্রার উপর শর্করার চাহিদা নির্ভর করে। একজন পূর্ণ বয়স্ক শুরুদের দৈনিক শর্করার চাহিদা তার দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের ৪.৬ গ্রাম হয়ে থাকে। একজন ৬০ কেজি ওজনের পুরুষ মানবের প্রতি দৈনিক শর্করার চাহিদা - (৬০×৪.৬) গ্রাম বা ২৭৬ গ্রাম। আমাদের যেটি প্রয়োজনীয় ক্যালরির প্রতিক্রিয়া ৬০-৭০ ভাগ শর্করা হতে পুরুষ কয়া সরকার।

কর্ম : শর্করা বা শ্রেতসাঙ্গের উপস্থিতি নির্ধারণ

বায়োজনীয় উপকরণ : এয়ারট মুখ্য বা ভাতের মাড়, টেস্ট টিউব, আয়োডিন, পানি ও ছলগাম

পদ্ধতি : সামান্য পরিমাণ এয়ারট মুখ্য বা ভাতের মাড় একটি টেস্টটিউবে নাও এবং এর সাথে সামান্য পরিমাণ পানি মেশাও। এবার এর ডিক্ষন দুই-তিন কোটি আয়োডিন মুখ্য মেশাও। কী ঘটে দেখ?

মুখ্যটি সীল বর্ণ খালন করবে। এ থেকে উক্ত মুখ্যে শর্করা বা শ্রেতসাঙ্গের উপস্থিতি নির্ধারণ করা যাব।

অভ্যন্তরীণ গোপ

আহারে কম বা বেশি শর্করা গ্রহণ করে দেহের জন্য ক্ষতিকর। শর্করার অভাবে অগ্নুষ্ঠি দেখা দেয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে দেহে বিপাক ক্রিয়ার সমস্যা সৃষ্টি হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গেলে হাইপোগ্লাইডিয়ার সম্মত দেখা দেয়।

বেমন— ক্রূধা অনুভব করা, বথি বথি ভাব, অতিরিক্ত ঘামানো, দ্রুক্ষণ বেড়ে বা কমে ঘাওয়া।

আমিষ বা প্রোটিন

আমিষ আয়াসের দেহের পঠন উপাদান। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফারের সমন্বয়ে আমিষ গঠিত। আমিষে ১৬% নাইট্রোজেন থাকে। শুক্র বিজ্ঞানে আমিষ একটি পুরুষপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। আমিষ হলো অ্যামাইলো এসিডের একটি জাতিল যৌগ। পরিপূর্ণ প্রক্রিয়া দ্বারা এটি দেহে শোষণ উপযোগী অ্যামাইলো এসিডে পরিণত হয়। এ পর্যবেক্ষণজাত মুখ্যে ২২ প্রকার অ্যামাইলো এসিডের সম্মত পাওয়া গেছে। আমিষ বা হালো বা ইংরেজি বর্ণনালভাস্টে সাহিয়ে যেমন অসংখ্য শব্দ পঠন করতে পারি, তেমনি ২২টি অ্যামাইলো এসিড বিভিন্ন সংখ্যায়, বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন আভিকে মিলিত হয়ে আমিষের উৎপত্তি ঘটায়। এ ফার্মে মাছ, মূধ, মাস ইত্যাদি খাবারের মাদ, গুড় ও বর্ণের তারতম্য দেখা যায়।

দেহের বৃক্ষি, ক্রমপূর্ণ ও নাইট্রোজেনের সমতা রক্তের জন্য অ্যামাইলো এসিড অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন। কিন্তু কিন্তু অ্যামাইলো এসিডকে অভ্যন্তরীণ অ্যামাইলো এসিড বলে। অভ্যন্তরীণ অ্যামাইলো এসিড দেহে তৈরি হয় না। খাদ্য থেকে এ অ্যামাইলো এসিডগুলো সংগ্রহ করতে হয়।



চাল



মুধ



মাছ



মাংস

অভ্যন্তরীণ অ্যামাইলো এসিডের অভাব ঘটলে নানা খোপের উপসর্গ দেখা দেয়। বেমন— বথি বথি ভাব, মূত্রে জৈব এসিডের পরিমাণ বেড়ে ঘাওয়া, নাইট্রোজেনের ভারসাম্য বজায় না থাকে ইত্যাদি।

চিত্র ১৩.২ : আমিষ জাতীয় খাদ্য

সব আমিষ দেহে সমান পরিমাণে শোষিত হয় না। আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করার পর এর শতকরা বত ভাস অন্তর থেকে দেহে শোষিত হয় ক্ষত ভাসকে সেই আমিষের সহজপাচ্যতার পূর্ণক ধরা হয়। সহজপাচ্যতার উপর ১৩

আমিষের পুষ্টিমান নির্ভর করে। যে আমিষ শতকরা ১০০ ভাগই দেহে শোষিত হয় এবং দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে কাজ করে তার সহজপাচ্যতার গুণক ১। এক্ষেত্রে আমিষ গ্রহণ এবং দেহের ধারণের পরিমাণ সমান। সহজ অর্থে বলতে গেলে যতটুকু আমিষ গ্রহণ করা হয় তার সম্পূর্ণটাই দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে কাজ করে। আর তা না হলে সহজপাচ্যতার গুণক ১ হতে কম হয়। মাঝের দুধ ও ডিমের আমিষের সহজপাচ্যতার গুণক ১। অন্যান্য সব আমিষেরই সহজপাচ্যতার গুণক ১ হতে কম।

কাজ : আমিষের উপস্থিতি নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ডিমের সাদা অংশ, হামানদিস্তা, পানি, টেস্টচিউব, সোডিয়াম হাইড্রোজ্যাইড, কপারসালফেট

পদ্ধতি : সামান্য পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্য (ডিমের সাদা অংশ) হামানদিস্তার সাহায্যে পিষে ফেলতে হবে। ভালো করে পিষে ফেলার জন্য সামান্য পরিমাণ পানি মেশানো যেতে পারে। এবার টেস্টচিউবে সামান্য পরিমাণ আমিষের দ্রবণ নাও। উক্ত দ্রবণে কয়েক ফেঁটা সোডিয়াম হাইড্রোজ্যাইডের দ্রবণ এবং কয়েক ফেঁটা কপার সালফেট দ্রবণ মেশাও। এতে উক্ত দ্রবণে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কি?

আমিষের দ্রবণের সাথে রাসায়নিক দ্রব্যগুলো মিশানোর পর দ্রবণটি বেগুনি রং ধারণ করেছে। এভাবে উক্ত দ্রবণে আমিষের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

আমিষের অভাবজনিত রোগ

খাদ্যে পরিমিত প্রয়োজনীয় জৈব আমিষ বা মিশ্র আমিষ না থাকলে শিশুর দেহে আমিষের অভাবজনিত সমস্যার সূষ্টি হয়। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগলে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। শিশুদের কোয়াশিয়ারকর ও মেরাসমাস রোগ দেখা দেয়।

কোয়াশিয়ারকর রোগের লক্ষণ

- শিশুদের খাওয়ায় অরুচি হয়।
- পেশি শীর্ণ ও দুর্বল হতে থাকে, চামড়া এবং চুলের মসৃণতা ও রং নষ্ট হয়ে যায়।
- ডায়ারিয়া রোগ হয়, শরীরে পানি আসে।
- পেট বড় হয়।

উপর্যুক্ত চিকিৎসার দ্বারা এ রোগ নিরাময় হলেও দেহে মানসিক স্থিরতা আসে। কোয়াশিয়ারকর রোগ মারাত্মক হলে শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।

মেরাসমাস রোগের লক্ষণ

- আমিষ ও ক্যালরি উভয়েরই অভাব ঘটে, ফলে দেহের বৃদ্ধি ব্র্যাক হয়ে যায়।
- শরীর ক্ষীণ হয়ে অস্থিচর্মসার হয়।
- চামড়া বা ত্বক খসখসে হয়ে ঝুলে পড়ে।
- শরীরের ওজন হ্রাস পায়।

শিশুদের অন্য এন্ডুক অফস্বা বিপজ্জনক। অছ্যাক্স প্রোটিনের অভাবে বয়স্কদের হোল-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাব ও ইন্সুলিন দেখা দেয়।

পাঠ ৪ ও ৫ : মেহ গদার্থ

একে শক্তি উৎপাদনকারী উপাদান বলা হয়। মেহ গদার্থে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। কার্বনের দাহন ক্ষমতা বেশি থাকার মেহ গদার্থের অগু থেকে বেশি ভাগপত্রি উৎপন্ন হয়। মেহ গদার্থ ফ্যাটি এসিড ও প্রিসাইলের সমন্বয়ে পাঠিত একটি বোগ। মেহ গদার্থ পরিপাক হয়ে ফ্যাটি এসিড ও প্রিসাইলে পরিষ্পত হয়। ফ্যাটি এসিড ও প্রিসাইল ক্ষুদ্রাঙ্গের ডিমাইডের তিতেরে অবস্থিত লসিকা নালির মাধ্যমে শোবিত হয়। মেহ গদার্থে ২০ প্রকর চর্বি জাতীয় এসিড পাওয়া যায়। চর্বি জাতীয় এসিড দুই প্রকর। বৰ্বা—
১. অসম্ভৃত চর্বি জাতীয় এসিড ও ২. সম্ভৃত চর্বি জাতীয় এসিড।

দেহে বক্তৃতের মধ্যে চর্বি জাতীয় এসিড তৈরি হয়। তবে বক্তৃতের চর্বি জাতীয় এসিড তৈরিয়ে ক্ষমতা অত্যন্ত কম। অন্যদিকে কিছু কিছু চর্বি জাতীয় এসিড আছে যা দেহের অন্য অক্ত্যাবশ্যক। এগুলো প্রধানত উচ্চিজ্ঞ তেলে পাওয়া যাব। খাদ্যে মেহ গদার্থের পরিমাণ বাড়া এবং উপকারিতা বাচাই করা যাব না। বে মেহ জাতীয় খাদ্যে অসম্ভৃত চর্বি জাতীয় এসিড বেশি থাকে তা বেশি উপকারী। যেমন— সুরাবিন তেল, সূর্যমুখী তেল, তিলের তেল, সুটোর তেল ইত্যাদি। এসব তেল দিয়ে তৈরি খাবার উৎকৃষ্টতর মেহ জাতীয় খাদ্যের অকর্তৃত। যেমন— মেজাজি, সালাদ জ্বেলি, কাসুপি, তেলের আচার ইত্যাদি উৎকৃষ্টতর মেহ জাতীয় খাদ্যের অকর্তৃত। যেসব খাদ্যে সম্ভৃত চর্বি জাতীয় এসিড বেশি থাকে সে সকল খাদ্যগুলোকে মেহবুল খাদ্য কৰা হয়। যেমন— মাস, মাঘন, পশির, ভালভা, চকলেট, বাদাম ইত্যাদি। শুক্তিবিজ্ঞানীদের মতে দৈনিক মোট শক্তির ২০%-৩০% পঞ্জি মেহ থেকে পাওয়া যাব। দৈনিক আহারে এমন মেহবুল খাদ্য অকর্তৃত কৰা উচিত যা অক্ত্যাবশ্যকীয় চর্বি জাতীয় এসিড বোাতে পারে এবং ডিটামিন ম্যানে সক্ষম হয়।

খাদ্যে মেহ গদার্থের অভাব স্টলে সেহেরে চর্বিতে মুক্তীয় ডিটামিনের অভাব পরিসরিত হয় কলে ডিটামিনের অভাবজনিত বোগ দেখা দেয়। যেমন— সুক শুক ও খসখসে বাবে দেহের সৌন্দর্য সংক্ষ কৰে, অক্ত্যাবশ্যকীয় চর্বি জাতীয় এসিজের অভাবে শিশুদের একজিমা ব্রোগ হয় ও বয়স্কদের চর্মত্রাপ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যাব।



চিত্র ১৩.৩ : চর্বি জাতীয় খাদ্য

কাজ : স্নেহ পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণ : সয়াবিন তেল, ইথানল ও পানি

পদ্ধতি : একটি টেস্টচিটিবে কয়েক ফোটা সয়াবিন তেল নাও। এর ভিতর সামান্য ইথানল মিশাও। এবার টেস্টচিটিবটিকে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নাও। এবার দ্রবণটিতে সামান্য পানি মিশিয়ে টেস্টচিটিবটি আবার ঝাঁকিয়ে নাও। কী ঘটে লক্ষ কর। তেলের দ্রবণটি ঘোলাটে বর্ণ ধারণ করবে।

এভাবে সরিষা, নারিকেল ও তিলের তেলের সাহায্যে উক্ত পরীক্ষাটি কর এবং কী ঘটে তা বর্ণনা কর।

খাদ্যের ক্যালরি ও কর্মশক্তি

শর্করা, আমিষ ও স্নেহ পদার্থ খাদ্যের এ তিনটি উপাদান থেকে দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। এ তাপ আমাদের দেহে কাজ করার শক্তি যোগায়। কোনো খাদ্যে পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ জানার জন্য শর্করা, আমিষ ও চর্বির ক্যালরিমূল্য বের করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির ক্যালরিমূল্য শূন্য ধরে হিসেব করতে হবে।

আমাদের দেহে

১ গ্রাম শর্করা থেকে ৪ কিলোক্যালরি
১ গ্রাম আমিষ থেকে ৪ কিলোক্যালরি
এবং
১ গ্রাম চর্বি থেকে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

আমাদের দেহের ভিতর খাদ্য পরিপাক, শ্বসন, রক্তসংবহন ইত্যাদি কার্যক্রম বিপাক ক্রিয়ার অঙ্গরূপ। বিপাক ক্রিয়া চালানোর জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তাকে মৌলিক বলে। আবার শারীরিক পরিশ্রমেও আমাদের শক্তি ব্যয় হয়। আমরা খাবার থেকে শক্তি পাই।

খাদ্য থেকে দেহের ভিতর যে তাপ উৎপন্ন হয় তা আমরা ক্যালরিতে প্রকাশ করি। ১০০০ ক্যালরিতে ১ কিলোক্যালরি। খাদ্য তাপশক্তি মাপের একক হলো কিলোক্যালরি। দেহের শক্তির চাহিদাও কিলোক্যালরিতে নির্ণয় করা হয়।

আমার, তোমার, তোমার ছোট ভাই, তোমার বাবার দেহের ক্যালরি চাহিদা এক রকম নয়। আমাদের দেহে দুই ভাবে শক্তি ব্যয় হয় যথা— ১. দেহের অভ্যন্তরীণ কাজে অর্থাৎ মৌলিকাকে এবং ২. পরিশ্রমের কাজে। প্রতিদিন কার কত ক্যালরি বা তাপ শক্তির প্রয়োজন তা নির্ভর করে প্রধানত বয়স, দৈহিক উচ্চতা এবং দৈহিক ওজনের উপর। এছাড়া বিভিন্ন পেশা এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদে দৈনিক ক্যালরি চাহিদা কম বা বেশি হয়ে থাকে।

নিচের সারণীতে ক্যালরির ব্যবহার ও খাদ্য চাহিদা দেখানো হলো

শিশু, নারী ও পুরুষের বিভিন্ন বয়সে দৈনিক ক্যালরির বরাদ্দ

বয়স (বৎসর)	গড় উজ্জন (কিলোগ্রাম)	গড় শক্তি (কিলোক্যালরি)	বয়স (বৎসর)	গড় উজ্জন (কিলোগ্রাম)	গড় শক্তি (কিলোক্যালরি)
বাচ্চা			নারী		
০.০-০.৫ মাস	৬	১১৫	১০-১২	৩০	১৯০০
০.৬ মাস-১.০ বছর	৯	১০০	১৩-১৫	৪২	২২০০
শিশু			১৬-১৯	৫১	২১০০
১ - ৩	১৩	১৩০০	২০-৩৯	৫৪	২০০০
৪ - ৬	২০	১৫০০	৪০-৪৯	৫৩	১৯০০
৭ - ১০	২৮	১৮০০	৫০-৫৯	৫২	১৮০০
পুরুষ			৬০-৬৯	৫১	১৬০০
১০ - ১২	৮০	২২০০	৭০+	৫১	১৪০০
১৩ - ১৫	৮৮	২৫০০	সম্ভান সম্ভবা		
১৬ - ১৯	৬৭	৩০০০	মাতার		
২০ - ৩৯	৬৭	২৭০০	অতিরিক্ত চাহিদা		
৪০ - ৪৯	৭০	২৪০০	প্রথম ৩ মাসে	+১৫০	
৫০ - ৫৯	৬৮	২৩০০	দ্বিতীয় ৩ মাসে	+২০০	
৬০ - ৬৯	৬৫	২২০০	তৃতীয় ৩ মাসে	+৩০০	
৭০ +	৬৫	১৯০০	প্রসূতি মাতার অতিরিক্ত চাহিদা	+৪০০	

একজন লোকের কী পরিমাণ শক্তি দরকার তা আমরা কেমন করে জানতে পারব? একজন লোকের দৈনিক কী পরিমাণ শক্তির দরকার তা প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ১. মৌলিকাক ২. দৈহিক পরিশ্রম ও ৩. খাদ্যের প্রভাব।

দৈনিক খাদ্য আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া উচিত। খাদ্য নির্বাচনের সময় আমাদের লক্ষ রাখতে হবে যে, খাদ্য থেকে দেহ যেন প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যালরি পেতে পারে এবং ভিটামিন, খনিজ লবণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো যেন এতে থাকে।

পাঠ ৬ : খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন যে, খাদ্যে শর্করা, আমিষ, স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ ছাড়াও আরও কতগুলো সূক্ষ্ম উপাদানের প্রয়োজন। এর অভাবে শরীর নানা রোগে (যেমন- রাতকানা, বেরিবেরি, স্কার্টি ইত্যাদি) আক্রান্ত হয়। ভিটামিন বলতে আমরা খাদ্যের ঐ সব জৈব রাসায়নিক পদার্থকে বুঝি যা খাদ্যে সামান্য পরিমাণে উপস্থিত থাকে। ভিটামিনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে দেহ গঠনে অংশগ্রহণ না করলেও ১০
এদের অভাবে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃক্ষিসাধন বা তাপশক্তি উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষিয়াগুলো সুসম্পন্ন হতে পারে না। ১১

ভিটামিনের প্রকারভেদ : দ্রবণীয়তার গুণ অনুসারে ভিটামিনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. স্নেহ জাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন— এ, ডি, ই, এবং কে।
২. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন— ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স এবং সি।

ভিটামিনের উৎস : গাছের সবুজ পাতা, কচি ডগা, হলুদ ও সবুজ বর্ণের সবজি, ফল ও বীজ ইত্যাদি অংশে ভিটামিন থাকে।

ভিটামিন এ

উৎস : মাছের তেল ও প্রাণিজ স্নেহে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়। ক্যারোটিন সমৃদ্ধ শাকসবজি যেমন— লালশাক, পুইশাক, পালংশাক, টমেটো, গাজর, বীট ও মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন— পেঁপে, আম, কঁঠালে ভিটামিন ‘এ’ থাকে। মলা ও ঢেলা মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ থাকে।

কাজ : দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখা, ত্বক ও শ্লেষাবিল্লিকে সুস্থ রাখা এবং দেহকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করা, খাদ্যব্য পরিপাক ও ক্ষুধার উদ্রেক করা, রক্তে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা ও দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

অভাবজনিত রোগ

১. রাতকানা : এ রোগের লক্ষণ স্বল্প আলোতে বিশেষ করে রাতে আবছা আলোতে দেখতে না পাওয়া। শিশুরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে চোখ সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত শিশুকে সবুজ শাকসবজি ও রঙিন ফলমূল খাওয়ানো উচিত। ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। আমাদের দেশে টিকা দিবসে বিভিন্ন টিকা কেন্দ্রে শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

২. জেরপথালমিয়া : ভিটামিন ‘এ’ এর অভাব ঘটলে চোখের কর্নিয়ার আচ্ছাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কর্নিয়ার উপর শুষ্ক স্তর পড়ে। তখন চোখ শুকিয়ে যায় এবং পানি পড়া ক্ষম্ব হয়ে যায়। চোখে আলো সহ্য হয় না, চোখে পুঁজ জমে এবং চোখের পাতা ফুলে যায়।

এ অবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসা করালে এ রোগ থেকে উপশম পাওয়া যেতে পারে। তবে সময় মতো চিকিৎসা না হলে শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া ভিটামিন ‘এ’ এর অভাব ঘটলে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স

ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স এর কাজ হলো বিশেষ বিশেষ উৎসেচকের অংশ হিসেবে আমিষ, শর্করা ও স্নেহ পদার্থকে বিশ্রিষ্ট করে এবং এদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে মুক্ত হতে সাহায্য করে।

ভিটামিন বি_১ (ধায়ামিন) : এর প্রধান কাজ হলো শর্করা বিপাকে অংশগ্রহণ করে শক্তিমুক্ত করা। তাছাড়া স্বাভাবিক ক্ষুধা বজায় রাখতে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে সহায়তা করে।

ভিটামিন বি_২ (রিবোফ্লেবিন) : অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ও কার্বহাইড্রেটের বিপাকে অংশ নিয়ে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে।

ভিটামিন বি_৬ (পাইরিডিনিন) : শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।

ভিটামিন বি_{১২} (সাম্যানোকোবালামিন) : লোহিত রক্তকণিকা বৃদ্ধি ও উৎপাদনে সহায়তা করে। শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

পাঠ ৭ : ভিটামিন ‘সি’

দেহের জন্য ভিটামিন ‘সি’ অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এ ভিটামিন পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং সামান্য তাপেই নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন ‘সি’ দেহে জমা থাকে না তাই প্রতিদিন খাওয়া দরকার। টক জাতীয় ফল আমলকী, আনারস, পেয়ারা, কমলালেবু, লেবু, আমড়া ইত্যাদি ফলে প্রচুর ভিটামিন ‘সি’ থাকে। সবুজ শাকসবজি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, লেটসপাতা থেকে আমরা ভিটামিন ‘সি’ পাই। পাকা ফল অপেক্ষা কাঁচা সবজি ও ফলে এ ভিটামিন বেশি থাকে।

ভিটামিন ‘সি’ পেশি ও দাঁত মজবুত করে, ক্ষত নিরাময় ও চর্মরোগ রোধে সহায়তা করে, কঠনালি ও নাকের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

অভাবজনিত রোগ

প্রাপ্ত বয়স্কদের দেহে ভিটামিন ‘সি’—এর অভাব প্রকট হলে নিচের লক্ষণগুলো দেখা দেয় :

- হাড়ের গঠন শক্ত ও মজবুত হতে পারে না।
- হাড় দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যায়।
- ত্বক খসখসে হয়, চুলকায়, ত্বকে ঘা হলে সহজে তা শুকাতে চায় না।

স্কার্টি

- দাঁতের মাড়ি ফুলে নরম হয়ে যায়।
- দাঁতের গোড়া আলগা হয়ে যায় এবং গোড়া থেকে রক্ত পড়ে।
- দাঁতের এনামেল উঠে যায় এতে অকালে দাঁত পড়ে যেতে পারে। শিশু ও বয়স্কদের এ রোগ বেশি হয়।
- গ্রন্থি ফুলে যায় এবং মুখে ব্যথা হয়।
- রক্তক্ষরণ সহজে ব্যবহৃত হয় না, ঘা শুকাতে দেরি হয়।
- অন্যান্য রোগ বিশেষ করে সর্দি, কাশি খুব সহজে আক্রমণ করে।

প্রতিকার

এ অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিরোধ

কোলের শিশুকে মায়ের দুধের সঙ্গে অন্যান্য পরিপূরক খাদ্য যেমন ফলের রস, সবজির সুপ ইত্যাদি খাওয়াতে হবে।

ভিটামিন ‘ডি’

ভোজ্য তেল, দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য, বিভিন্ন মাছের তেল, ডিমের কুসুম, মাখন, ঘি, চর্বি এবং ইলিশ মাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ‘ডি’ পাওয়া যায়।

কাজ

- অস্থি ও দাঁতের কাঠামো গঠন।
- অঙ্গে ক্যালসিয়াম শোষণ বাড়ায়।
- রক্ত প্রবাহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

অভাবজনিত রোগ

ভিটামিন ‘ডি’ এর অভাবে লোহার শোষণ, সংক্ষয় ও হিমোগ্লোবিন তৈরিতে বিপ্লব ঘটে।

রিকেটস

রিকেটস রোগের লক্ষণ

- ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের অভাবে শিশুদের হাড় নরম হয়ে যায় এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- পায়ের হাড় ধনুকের মতো বেঁকে যায় এবং দেহের চাপে অন্যান্য হাড়গুলোও বেঁকে যায়।
- হাত-পায়ের অস্থিসম্মিলি বা গিট ফুলে যায়।
- বুকের হাড় বা পাঁজরের হাড় বেঁকে যায়।

প্রতিকরণ

এ অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিরোধ

শিশুকে ভিটামিন ‘ডি’ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানো উচিত। সূর্যরশি থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। তাই শিশুকে কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্রে খেলাধুলা করতে দেওয়া উচিত।

অস্টিওম্যালেশিয়া

বয়স্কদের রিকেটস অস্টিওম্যালেশিয়া নামে পরিচিত। এই রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ –

- ভিটামিন ‘ডি’ এর অভাবে ক্যালসিয়াম শোষণে বিপ্লব ঘটে।
- ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের সংক্ষয় করতে থাকে।
- থাইরয়েড গ্রন্থির কাজের পরিবর্তন ঘটে।
- অস্থি দুর্বল হয়ে অস্থির কাঠিন্য কমে যায় এবং হালকা আঘাতেই অস্থি ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

প্রতিকার

উপরের লক্ষণগুলো দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। উপরুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ‘ডি’ যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে উক্ত উপাদানগুলোর জন্য ঔষধ সেবন করা একান্ত জরুরি।

প্রতিরোধ

- শিশুকাল থেকেই ভিটামিন ‘ডি’ ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া সুনিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুদেরকে কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্রে খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভিটামিন ‘ই’

ডোজ্যুলেন ভিটামিন ‘ই’ এর সবচেয়ে ভালো উৎস। শস্যদানা, যকৃৎ, মাছ-মাংসের চর্বিতে ভিটামিন ‘ই’ পাওয়া যায়।

কাজ

- ভিটামিন ‘ই’ কোষ গঠনে সহায়তা করে।
- শরীরের কিছু ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
- খুব কম ক্ষেত্রে ভিটামিন ‘ই’ এর অভাব ঘটে এবং এর অভাবজনিত লক্ষণও কম।

ভিটামিন ‘কে’

সবুজ রঙের শাকসবজি, লেটুসপাতা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ডিমের কুসুম, সয়াবিন তেল এবং যকৃতে ভিটামিন ‘কে’ পাওয়া যায়।

কাজ

- দেহে ভিটামিন ‘কে’ প্রথ্রোম্বিন নামক প্রোটিন তৈরি করে।
- প্রথ্রোম্বিন রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে।

অভাবজনিত সমস্যা

যকৃৎ থেকে পিস্তরস নিঃসৃত হয়। পিস্তরস নিঃসরণে অসুবিধা হলে ভিটামিন কে-এর শোষণ করে যায়। ভিটামিন ‘কে’-এর অভাবে ত্বকের নিচে ও দেহাভ্যন্তরে যে রক্ত ক্ষরণ হয় তা বন্ধ করার ব্যবস্থা না নিলে রোগী মারা যেতে পারে। এই ভিটামিনের অভাবে অপারেশনের রোগীর রক্তক্ষরণ সহজে বন্ধ হতে চায় না। এতে রোগীর জীবন নাশের আশংকা বেশি থাকে।

নিচের ছক্টি পূরণ কর

ভিটামিন	উৎস	কাজ	অভাবজনিত রোগ
‘এ’			
‘সি’			
‘ডি’			
‘কে’			

পাঠ ৮ : খনিজ লবণ

তাত এবং তরকারির সাথে আমরা প্রত্যহ খাবার লবণ খাই, এছাড়া আরও অনেক প্রকার লবণ আছে যা আমাদের দেহের জন্য অতীব প্রয়োজন। খাদ্যে খনিজ লবণ, আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থের মতো দেহে তাপ উৎপন্ন করে না। কিন্তু দেহকোষ ও দেহে তরলের জন্য খনিজ লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, আয়োডিন, লৌহ, সালফার ইত্যাদি লবণ জাতীয় দ্রব্য খাদ্যের সাথে দেহে প্রবেশ করে ও দেহ গঠনে সহায় করে। এসব উপাদান দেহে মৌলিক উপাদান হিসেবে থাকে না, অন্য পদার্থের সঙ্গে জৈব ও অজৈব ঘোগরূপে থাকে। প্রধানত দুই ভাবে খনিজ লবণ দেহে কাজ করে। যথা— দেহ গঠন উপাদানরূপে ও দেহ অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মাংস, ডিম, দুধ, সবুজ শাকসবজি এবং ফল খনিজ লবণের প্রধান উৎস।

খনিজ লবণ দেহ গঠন ও দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, অস্থি, দাঁত, এনজাইম ও হরমোন গঠনের জন্য খনিজ লবণ অপরিহার্য উপাদান, স্নায়ু উদ্বিপনা ও পেশি সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে, দেহের জলীয় অংশে সমতা রক্ষা করে ও বিভিন্ন এনজাইম সক্রিয় রাখে।

মানবদেহে খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা

ক্যালসিয়াম দাঁত ও হাড় গঠনে, রক্ত জমাট বাঁধতে, স্নায়ু ব্যবস্থায় সুষ্ঠু কাজ সম্পাদনে সহায়তা করে। ফসফরাস দাঁত ও হাড় গঠন, ফসফোলিপিড তৈরি করে। লৌহ রক্তের লোহিত রক্তকণিকা গঠন, উৎসেচক বা এনজাইমের কার্যকারিতায় সহায়তা করে। আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ও বিপাকের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করে। দেহের অধিকাংশ কোষ ও দেহরসের জন্য সোডিয়াম প্রয়োজন। পেশি সংকোচনে পটাশিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠ ৯ : অভাবজনিত রোগ

রিকেটস : দেহে ভিটামিন ‘ডি’-এর সঙ্গে ক্যালসিয়াম শোষিত হয়। এই ভিটামিনের অভাবে রিকেটস রোগ হয়। ভিটামিন অংশে এর বর্ণনা তোমরা পড়েছ।

গলগত : গলগত রোগকে ঘ্যাগ বলে। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর, জামালপুর ও ময়মনসিংহে এ রোগের প্রকোপ বেশি। যখন আমাদের রক্তে কোনো কারণে আয়োডিনের অভাব ঘটে তখন গলায় অবস্থিত থাইরয়েডগ্রন্থি ক্রমশ আকারে বড় হতে থাকে। গলা ফুলে যায়। একে গলগত বা ঘ্যাগ বলে। এ রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ :

- থাইরয়েডগ্রন্থি ফুলে যায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
- শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় শব্দ হয়।
- গলার আওয়াজ ফ্যাসফেসে হয়ে যায়।
- গলায় অস্বস্তিবোধ হয়, খাবার গিলতে কষ্ট হয়।
- আক্রান্ত ব্যক্তি অবসাদ ও দুর্বলতাবোধ করে।

প্রতিকার

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ, সামুদ্রিক মাছ, মাছের তেল ও সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ক্ষেত্রিক নিষিদ্ধ

সাধারণত আয়োডিনের অভাবে শিশুদের এ রোগ হয়। এই রোগে আক্রান্ত শিশুর দেহে যে লক্ষণগুলো দেখা দেয় তা হলো—

- দেহের বর্ধন মন্থর হয়।
- পুরু ত্বক, মুখমণ্ডলের পরিবর্তন দেখা দেয়।
- পুরু ঠোট, বড় জিহ্বা, মানসিক প্রতিকৰ্ষী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

প্রতিকার

যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা করা হলে শিশুদের দৈহিক অসুবিধাগুলো দূর হয় ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঠিক রাখা যায়।

প্রতিরোধ

খাবারে আয়োডিনযুক্ত লবণ দিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

রক্তাঙ্গতা বা এ্যানিমিয়া

লোহা, লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের গঠন উপাদান। শিশু ও সলতান সম্ভবা মায়ের খাদ্যে লোহার ঘাটতির জন্য রক্তাঙ্গতা দেখা যায়। সাধারণত শিশুদের পেটে কৃমি হলে রক্তাঙ্গতা দেখা দিতে পারে। এর লক্ষণগুলো হলো—

- দুর্বলতাবোধ, মাথা, গা বিমর্শিম করা।
- বুক ধড়ফড় করা।
- মাথা ঘোরানো, অঙ্গ পরিশ্রমে ইঁপিয়ে উঠা।
- ওজন হ্রাস ও খাওয়ায় অব্যুটি দেখা দেয়।

প্রতিকার

লৌহ সমৃদ্ধ শাকসবজি, ফল, মাংস, ডিমের কুসুম, ঘৃণ্ণ ও বৃক্ষ ইত্যাদি বেশি করে খাওয়া। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করা। রোগ কঠিন আকার ধারণ করলে হ্রৎপিণ্ডের দ্রুত রক্ত সঞ্চালন ও হৃদস্পন্দন ক্রম হয়ে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পানি

পানি জীবন ধারণের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রাণী দেহের ৬০-৭০ ভাগই পানি। দেহ গঠনে পানির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। এ পানি অস্থি, মাংস, ত্বক, নখ, দাঁত ইত্যাদি কোষের ভিতরে ও বাইরে থাকে। প্রায় সব খাদ্যেই কম-বেশি পানি থাকে। তবে আমরা আলাদাভাবে পানি পান করে দেহের চাহিদা মেটাই।

দেহ গঠন ছাড়াও পানি দেহের সব অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। পানি ছাড়া দেহের ভিতরে কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া হতে পারে না। পানি দেহে দ্রাবক রূপে কাজ করে। বিভিন্ন খনিজ লবণ পানিতে দ্রবীভূত থাকে। পানিতে দ্রবণীয় অবস্থায় খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া চলে। আবার পানিতে দ্রবীভূত থেকেই খাদ্য উপাদান দেহে শোষিত হয়।

কাজ

- পানির জন্যই রক্ত সঞ্চালন ও তাপ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়।
- পানি দেহ থেকে দৃষ্টিতে পদার্থ অপসারণ করে। যেমন— মুক্তি ও ঘাম।

কলেরা ও উদরাময় রোগে মলের সঙ্গে বা বমির সঙ্গে দেহ থেকে হঠাৎ বেশ কিছু পানি বের হয়ে যায়। ফলে দেহে পানি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কলেরা বা উদরাময় রোগ হলে রোগীকে স্যালাইন বা লবণ পানির শরবত খাওয়াতে হবে। এটা কলেরা বা উদরাময়ের সবচেয়ে সহজ চিকিৎসা। এছাড়া আন্তর্জ্ঞিক উদরাময় গবেষণাকেন্দ্র কর্তৃক তৈরি খাওয়ার স্যালাইনের প্যাকেট পাওয়া যায়। প্যাকেটের স্যালাইন পানিতে গুলে রোগীকে খাওয়াতে হয়। সম্প্রতি শস্য স্যালাইন নামক আর একটি খাওয়ার স্যালাইন উৎসাহিত হয়েছে। ১ লিটার পানি, ৫০ গ্রাম চালের গুড়া ও এক চিমটি লবণ মিলিয়ে এ স্যালাইন তৈরি করা হয়।

কাজ : তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে খাবার স্যালাইন বানাতে শিখেছ। এবার তোমরা পুনরায় খাবার স্যালাইন তৈরি কর। স্যালাইন তৈরির সময় তোমরা কী কী সাবধানতা অবলম্বন করবে তা লিপিবদ্ধ করবে।

শুরুক্তা

কোনো কারণে দেহে পানির পরিমাণ কমে গেলে কোষগুলোতে পানির স্বল্পতা দেখা দেয়। কোষের পানি কমে গেলে অতিরিক্ত পিপাসা হয়, রক্তের চাপ কমে যায়, রক্ত সঞ্চালনে অসুবিধা হয়, বিপাক ক্রিয়ায় ব্যাধাত ঘটে। পানির অভাবে দেহের ওজন কমে যায় এবং পেশি ও স্নায়ুকোষ দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহে পানির পরিমাণ ২০ শতাংশের নিচে নেমে গেলে দেহের স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন ঘটে, ফলে রোগী অচেতন হয়ে পড়ে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

রাফেজ বা ঔষধুক্ত খাদ্য

শস্যদানা, ফলমূল, সবজির অপাচ্য অংশকে রাফেজ বলে। দেহের ভিতর রাফেজের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। রাফেজ কোনো পুষ্টি উপাদান নয়। তবে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাফেজ পৌষ্টিক নালির ভিতর দিয়ে সরাসরি স্থানান্তরিত হয়। ফল ও সবজির রাফেজ, সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর। ঔষধুক্ত খাদ্য থেকে রাফেজ পাওয়া যায়।

খাদ্য নির্বাচন

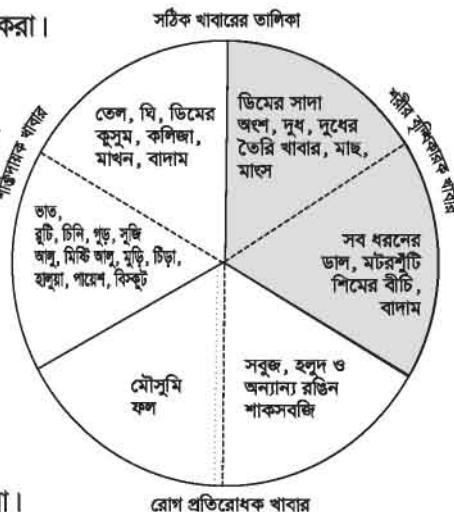
যে সমস্ত খাদ্যবস্তু দেহের ক্যালরি চাহিদা পূরণ করে, টিস্যু কোষের বৃদ্ধি ও গঠন বজায় রাখে এবং দেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে সুষম খাদ্য বলে। অর্থাৎ সুষম খাদ্য বলতে বোঝায় ৬টি উপাদান বিশিষ্ট পরিমাণ মতো খাবার যা ব্যক্তিবিশেষের দেহের চাহিদা মেটায়। বয়স, লিঙ্গাভেদ, দৈহিক অবস্থা, শ্রমের পরিমাণ হিসেবে পুরুষের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো উপর্যুক্ত পরিমাণে সুষম খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। যে শর্ত পালনে খাবার সুষম হয় সেগুলো হলো-

১. প্রতিবেদার খাবারে আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ এই তিনিটি শ্রেণির খাবার অন্তর্ভুক্ত করে খাদ্যের ছয়টি উপাদানের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা।
২. প্রত্যেক শ্রেণির খাদ্য বয়স, লিঙ্গ ও জীবিকা অনুযায়ী সরবরাহ করা।
৩. দৈনিক ক্যালরি ৬০-৭০% শর্করা, ১০% আমিষ ও ৩০-৪০% স্নেহ জাতীয় পদার্থ থেকে গ্রহণ করা।

সুষম খাদ্য তালিকা

কতগুলো নিয়ম মেনে একটি সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হবে। যথা-

১. প্রথমত খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলো ব্যক্তিবিশেষের বয়স, কর্ম ও শারীরিক অবস্থাভেদে যে বিভিন্ন ধরনের হয় সেদিকে লক্ষ রেখে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা।
২. দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যের তাপমূল্য বা ক্যালরি তাপ শক্তির পরিমাণ নিশ্চিতকরণ।
৩. খাদ্য দেহ গঠনের ও ক্ষয়পূরণের উপযোগী আমিষ সরবরাহ করা।
৪. খাদ্য যথোপযুক্ত ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির উপস্থিতি।
৫. বিভিন্ন খাদ্যের পুরুষান্তর ও খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন। প্রথমে খাদ্যের মূল বিভাগগুলো থেকে খাদ্য বাছাই করা। খাদ্য বাছাইয়ে বৈচিত্র্য থাকা।
৬. খাদ্য তালিকা প্রস্তুতির সময় খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন থাকা।
৭. ব্যক্তি ও পরিবারের আর্থিক সম্মতির দিক ভেবে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা।
৮. খাতু ও আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা।



নতুন শব্দ : আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, সহজ পাচ্যতার গুণক, অ্যামাইনো এসিড, কোয়াশিয়ারকর, মেরাসমাস, জেরপথালমিয়া, স্কার্টি, রিকেট্স, অস্টিওম্যালেশিয়া, প্রথ্রোন্সিন, ক্রোটিনিজম, এ্যানিমিয়া

এ অধ্যায় পাঠ শেবে আমরা যা শিখলাম—

- বিপাকক্রিয়া চালানোর জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তাকে মৌলিক বলে।
- ভিটামিন ও খনিজ লবণ আলাদা কোনো খাদ্য নয়। এগুলো অন্য খাদ্য উপাদান থেকে পাওয়া যায়।
- পানি দেহের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় দেহের সর্বত্র পরিবাহিত হয়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কিলোক্যালরি কী?
২. ভিটামিন ‘এ’-র অভাবে কী কী অসুবিধা দেখা দেয়?
৩. রিকেটস রোগের লক্ষণগুলো কী কী?
৪. রক্তে হিমোগ্লোবিনের প্রয়োজনীয়তা কী?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে?

- ক. পানি
গ. মেহপদাৰ্থ

- খ. ভিটামিন
ঘ. খনিজ লবণ

২. কোন ভিটামিনের অভাবে শিশুদের রিকেটস রোগ হয়?

- ক. ভিটামিন এ
গ. ভিটামিন ডি

- খ. ভিটামিন সি
ঘ. ভিটামিন ই

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সুমি টক খেতে পছন্দ করে না। এমনকি সে সবুজ শাকসবজি এবং টমেটোও খায় না। ইদানীং দেখা যাচ্ছে তার দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে।

৩. সুমির কী রোগ হয়েছে?

- ক. স্কার্টি
গ. মেরাসমাস

- খ. রিকেটস
ঘ. কোয়াশিয়ারকর

৮. উদ্দীপকের খাদ্যগুলোর অভাবে বয়স্কদের-

- i. হাড় নরম হয়ে যায়
- ii. ত্বক চুলকায় এবং ঘা হয়
- iii. বুকের হাড় ও পাঁজরে ব্যথা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. তালহা ইদানীঁ কিছুই খেতে চায় না। তার খাওয়ায় অরুচি এবং বমি বমি ভাব হয়। তার ত্বক খসখসে হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার তাকে ডিম ও দুধ বেশি করে খেতে বললেন।

- ক. খাদ্য কী?
- খ. পৃষ্ঠি বলতে কী বোঝায়?
- গ. ডাক্তার তালহাকে উল্লিখিত খাবারগুলো খেতে বললেন কেন?
- ঘ. ডাক্তারের পরামর্শমতো খাবার না খেলে পরবর্তীতে তালহার আরও কী সমস্যা হতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

২. নূরজাহান বেগম তার আট বছরের ছেলে বকুলের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ে ভীষণ চিকিৎসা। তিনি তার শারীরিক বৃদ্ধি ও সুস্থিতা নিশ্চিত করার জন্য তাকে বিশেষ ধরনের খাবার খাওয়াতে শুরু করেন। তবে তিনি নিজের এবং বকুলের বাবা, দাদা ও দাদীর খাদ্য তালিকায় ভিন্ন ধরনের খাবার রাখেন।

- ক. প্রোটিন কী?
- খ. রাফেজ বলতে কী বোঝায়?
- গ. নূরজাহান বেগম বকুলের খাদ্য তালিকা কীভাবে তৈরি করেন? বর্ণনা কর।
- ঘ. নূরজাহান বেগমের পরিবারের সদস্যদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য নির্বাচনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র

আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ তা তোমরা জানো। আরও জানো, একটি স্থানে বেসকল জড়বস্তু ও জীব থাকে সেগুলো নিয়েই সেখানকার পরিবেশ গড়ে উঠে। তোমরা নিচয়েই লক্ষ করেছ, এই ভূমভঙ্গে বিভিন্ন পরিবেশ রয়েছে। এসব পরিবেশকে আমরা স্বাদু পানি, সোনা পানি ও স্থল এই প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এই তিনি রকমের পরিবেশের প্রত্যেকটিতে স্বতন্ত্র ধরনের অজীব ও জীব উপাদান থাকে।

এসব অজীব ও জীব উপাদানসমূহ একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তোমরা জানো, পরিবেশের জীব উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উদ্ধিদ ও প্রাণী। জীবন ধারণের জন্য এসকল উদ্ধিদ ও প্রাণী একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- বাস্তুতন্ত্রের উপাদান ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজাল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- জীবে বাস্তুতন্ত্রের অবদান উপলব্ধি করব এবং সুরক্ষার অন্তর্দের সচেতন করতে পারব।

পাঠ ১ : বাস্তুতন্ত্র

পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জীব বসবাস করে। প্রতিটি বাসস্থানের বিভিন্ন এলাকায় জলবায়ু, আবহাওয়া ও অন্যান্য অজীব এবং জীব উপাদানের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এসব পার্থক্যের কারণে পৃথিবীজুড়ে স্থানভেদে সব জীবের বসতি। বনজঙ্গলে তুমি যে ধরনের জীব দেখবে, পুরুষে বসবাসরত জীব তাদের থেকে ভিন্ন। এসব পরিবেশের জীব ও অজীব উপাদানের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। আবার একটি পরিবেশের উদ্ধিদ ও প্রাণী জীবন ধারণের জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এভাবে যে কোনো একটি পরিবেশের অজীব এবং জীব উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া, আদান-প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশে যে তন্ত্র গড়ে উঠে তাই বাস্তুতন্ত্র নামে পরিচিত।

পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবে বাস্তুতন্ত্রের সকল উপাদানের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে। তোমার বাড়ি অথবা বিদ্যালয়ের কাছের বাগান একটি ছোট বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ।

পাঠ ২ : বাস্তুতন্ত্রের উপাদান

তোমরা জেনেছ অজীব এবং জীব এই দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে বাস্তুতন্ত্র গঠিত।

অজীব উপাদান : বাস্তুতন্ত্রের প্রাণহীন সব উপাদান অজীব উপাদান নামে পরিচিত। এই অজীব উপাদান আবার দুই ধরনের। (ক) অজৈব বা ভৌত উপাদান এবং (খ) জৈব উপাদান। অজৈব উপাদানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ, মাটি, আলো, পানি, বায়ু, তাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি। সকল জীবের মৃত ও গলিত দেহাবশেষ জৈব উপাদান নামে পরিচিত। পরিবেশের জীব উপাদানের বেঁচে থাকার জন্য এসব অজৈব ও জৈব উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

জীব উপাদান : পরিবেশের সকল জীবস্ত অংশই বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদান। বাস্তুতন্ত্রের সকল জীব ও অজীব উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা তোমরা প্রথম পাঠে জেনেছ। বাস্তুতন্ত্রকে কার্যকরী রাখার জন্য এ সকল জীব যে ধরনের ভূমিকা রাখে তার উপর ভিত্তি করে এসব জীব উপাদানকে (ক) উৎপাদক, (খ) খাদক এবং (গ) বিয়োজক এ তিনি ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) উৎপাদক : সবুজ উদ্ধিদ যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে তারা উৎপাদক নামে পরিচিত। যারা উৎপাদক তারা সূর্যের আলোর উপর্যুক্তিতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। যার উপর বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য সকল প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।

(খ) খাদক বা ভক্ষক : যে সকল প্রাণী উদ্ধিদ থেকে পাওয়া জৈব পদার্থ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে বা অন্য কোনো প্রাণী থেয়ে জীবন ধারণ করে তারাই খাদক বা ভক্ষক নামে পরিচিত। বাস্তুতন্ত্রে তিনি ধরনের খাদক রয়েছে।

প্রথম স্তরের খাদক : যে সকল প্রাণী উদ্ধিদভোজী তারা প্রথম স্তরের খাদক। এরা তৃণভোজী নামেও পরিচিত। তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে ছোট কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে অনেক বড় প্রাণী। যেমন- গরু, ছাগল ইত্যাদি।

দ্বিতীয় স্তরের খাদক : যারা প্রথম স্তরের খাদকদেরকে খেয়ে থাঁচে। যেমন- পাখি, ব্যাঙ, মানুষ ইত্যাদি। ১৫
এরা মাংসাশী বলেও পরিচিত।

তৃতীয় স্তরের খাদক বা সর্বোচ্চ খাদক : যারা দ্বিতীয় স্তরের খাদকদের খায়। যেমন- কচ্ছপ, বক, ব্যাঙ, মানুষ ইত্যাদি। এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রাণী আবার একাধিক স্তরের খাবার খায়। এদেরকে বলা হয় সর্বভুক। আমরা যখন ডাল, ভাত, আলু ইত্যাদি খাই, তখন আমরা প্রথম স্তরের খাদক। আবার আমরা যখন মাছ, মাংস খাই, তখন আমরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের খাদক।

(গ) বিযোজক : এরা পচনকারী নামেও পরিচিত। পরিবেশে কিছু অণুজীব আছে, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক যারা মৃত উদ্ধিদ ও প্রাণীর দেহের উপর ক্রিয়া করে। এসময় মৃত উদ্ধিদ ও প্রাণীদেহে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে মৃতদেহ ক্রমশ বিযোজিত হয়ে নানা রকম জৈব ও অজৈব দ্রব্যাদিতে রূপান্বিত হয়। এসব দ্রব্যের কিছুটা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক নিজেদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মৃতদেহ থেকে তৈরি বাকি খাদ্য পরিবেশের মাটি ও বায়ুতে জমা হয়। যা উদ্ধিদ পুনরায় ব্যবহার করে। এভাবে প্রকৃতিতে অজীব ও জীব উপাদানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়ে বাস্তুসংস্থান সচল থাকে।

পাঠ ৩-৫ : বাস্তুতত্ত্বের প্রকারভেদ

প্রাকৃতিক পরিবেশে দু'ধরনের বাস্তুতত্ত্ব রয়েছে। স্থলজ এবং জলজ বাস্তুতত্ত্ব। তোমরা এ পাঠে স্থলজ বাস্তুতত্ত্ব এবং জলজ বাস্তুতত্ত্ব সম্পর্কে জানবে।

স্থলজ বাস্তুতত্ত্ব

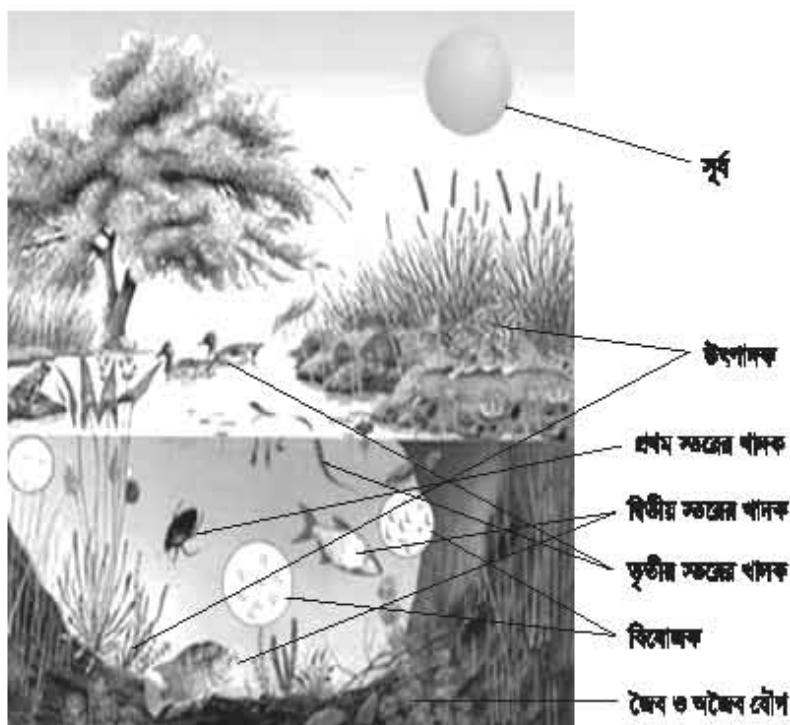
এ ধরনের বাস্তুতত্ত্ব আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- বনভূমির বাস্তুতত্ত্ব, মরুভূমির বাস্তুতত্ত্ব ইত্যাদি। বনভূমির বাস্তুতত্ত্বের উদাহরণ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের বনভূমি অঞ্চলের কথা বলতে পারি। বাংলাদেশের বনভূমি অঞ্চলকে প্রধান দুটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। (ক) সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল এবং (খ) খুলনার সমুদ্র উপকূলবর্তী সুন্দরবন অঞ্চল। নিচে সুন্দরবনের বাস্তুতত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সুন্দরবনের বনভূমি অন্যান্য অঞ্চলের বনভূমি থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের। খুলনা জেলার দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল থেকে ভিতরের দিকে এ অঞ্চল বেশ কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। জোয়ার-ভাটার কারণে এ অঞ্চলের মাটির স্ববনান্ততা বেশি, কাজেই লবণাক্ত পানি সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধিদই এ বনাঞ্চলে জন্মে। সুন্দরবনের বনাঞ্চল ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিত। এ বনের মাটি বেশ কর্দমাক্ত। কাজেই এর ভিতর দিয়ে সহজে বাতাস চলাচল করতে পারে না। তাই এখানকার উদ্ধিদের মূল মাটির নিচে না গিয়ে খাড়াভাবে মাটির উপরে উঠে আসে। এসব মূলের আগায় অসংখ্য ছিদ্র থাকে। যার সাহায্যে উদ্ধিদ শুসনের জন্য বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে। এ বনের উল্লেখযোগ্য উদ্ধিদ হলো সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, গোলপাতা ইত্যাদি। এরা এ বনের উৎপাদক। পোকামাকড়, পাখি, মুরগি, হরিণ এ বনের প্রথম স্তরের খাদক। বানর, কচ্ছপ, সারস ইত্যাদি দ্বিতীয় স্তরের খাদক। এ বনের তৃতীয় স্তরের খাদকদের মধ্যে রয়েছে বাঘ, শুকর ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে শুকর সর্বভুক। এ বনের উল্লেখযোগ্য প্রাণী রয়েল বেঙাল টাইগার, চিতা বাঘ, বানর, চিত্রল হরিণ, বন্য শুকর, কুমির, নানা ধরনের সাপ, পাখি এবং কীটপতঙ্গ।

জলজ বাসস্থানত

জলজ বাসস্থানত প্রধানত তিনি ধরনের। প্রধা-

১. পুরুজের বাসস্থানত
২. নদী-নদীর বাসস্থানত
৩. সমুদ্রের বাসস্থানত



চিত্র ১৭.১ : একটি পুরুজের বাসস্থানত

জোড়াদের বোধাম সূবিধার্থে এখানে একটি পুরুজের বাসস্থানত সম্পর্কে সহকেশে আলোচনা করা হলো। সামুদ্রিক একটি ছোট পুরুজের জলজ বাসস্থানের একটি অঘৃণনাশূর্ণ উদাহরণ। পুরুজের গরোছে অঙ্গীব ও জীব উৎপাদন। অঙ্গীব উৎপাদনের মধ্যে পুরুজের গানি, মুরীভূত অঙ্গীজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং কিছু জৈব পদার্থ। এসব উৎপাদন জীব সমাজের ব্যবহার করতে সক্ষম। জীব উৎপাদনের মধ্যে আছে উৎপাদক, প্রথম স্তরের খাদক, তৃতীয় স্তরের খাদক ও নানা ঝরনের বিবোজক। পুরুজের বাসস্থানের উৎপাদক হচ্ছে সান্তা ধরনের তাসমান ক্ষয় ক্ষয় আণুবীক্ষণিক টেক্সিস যারা ফাইটেপ্রাক্টিন নামে পরিচিত। তাসমান বড় উত্তিসের মধ্যে রয়েছে ক্ষয়ীপানা, শাশ্বতা ইত্যাদি। তাসমান ক্ষয় উত্তিস বেমল পুরুজের গানিকে রয়েছে তেমনি রয়েছে ক্ষয় ক্ষয় আণুবীক্ষণিক প্রাণী। এরা ক্ষ-প্লাইটিন নামে পরিচিত। বিভিন্ন প্রকার জলজ বীটপ্লাটল, ছোট মাছ, খিলুক, শামুক ইত্যাদি যারা উৎপাদকদের পায় তারা প্রথম স্তরের খাদক। আবার এদেরকে যারা খায় আরও একটি বড় মাছ, ব্যাট এরা বিড়িয় স্তরের খাদক। এদেরকে আবার যারা খায় যেমন কচ্ছপ, বক, সাল এরা তৃতীয় স্তরের খাদক। পুরুজে মৃত জীবের উপর ব্যাকটেরিয়া, ক্যারক বিবোজকের কাজ করে। বিবোজিত দ্রুত্যাদি আবার পুরুজের উৎপাদক খাদ্য হিসেবে ইহন করে।

পাঠ ৬ ও ৭ : খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজাল

তোমরা জেনেছ বাস্তুতত্ত্বে কোনো জীবই এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য একে অনেকের উপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। জীবের বেঁচে থাকার জন্য তার চারপাশের সমস্ত উপাদান নানাভাবে প্রতিবাসিত করে।

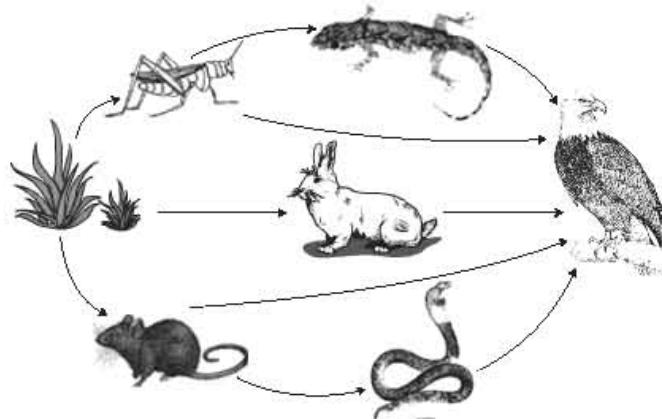
খাদ্যশৃঙ্খল

এ পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস সূর্যের আলো। বাস্তুতত্ত্বের উৎপাদক হচ্ছে সবুজ উষ্ণিদ। তোমরা জেনেছ প্রাথমিক স্তরের খাদক খাদ্যের জন্য উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল। আবার দ্বিতীয় স্তরের খাদক নির্ভরশীল প্রাথমিক স্তরের খাদকের উপর। তৃতীয় স্তরের খাদক আর দ্বিতীয় স্তরের খাদকদেরকে। এভাবে একটি বাস্তুতত্ত্বে সকল জীব (উষ্ণিদ ও প্রাণী) পৃষ্ঠি চাইসার দিক থেকে খারাবাহিকভাবে সহ্যেক্ষণ। ফলে গড়ে উঠে খাদ্যশৃঙ্খল। তাহলে দেখা যাবে উষ্ণিদ উৎস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একে অন্যকে খাবার মাধ্যমে শক্তির বে স্থানান্তর ঘটে তাই খাদ্যশৃঙ্খল।

যেমন : ঘাস —> পতঙ্গ —> ব্যাঙ —> সাপ —> ঈগল।

খাদ্যজাল

বাস্তুতত্ত্বে অসংখ্য খাদ্যশৃঙ্খল থাকে তা নিচয়ই দেখেছ। এসব খাদ্যশৃঙ্খল কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পর সম্পর্কবৃক্ষ। খাদ্যশৃঙ্খলের এ ধরনের সংযোগকে খাদ্যজাল বলা হয়।

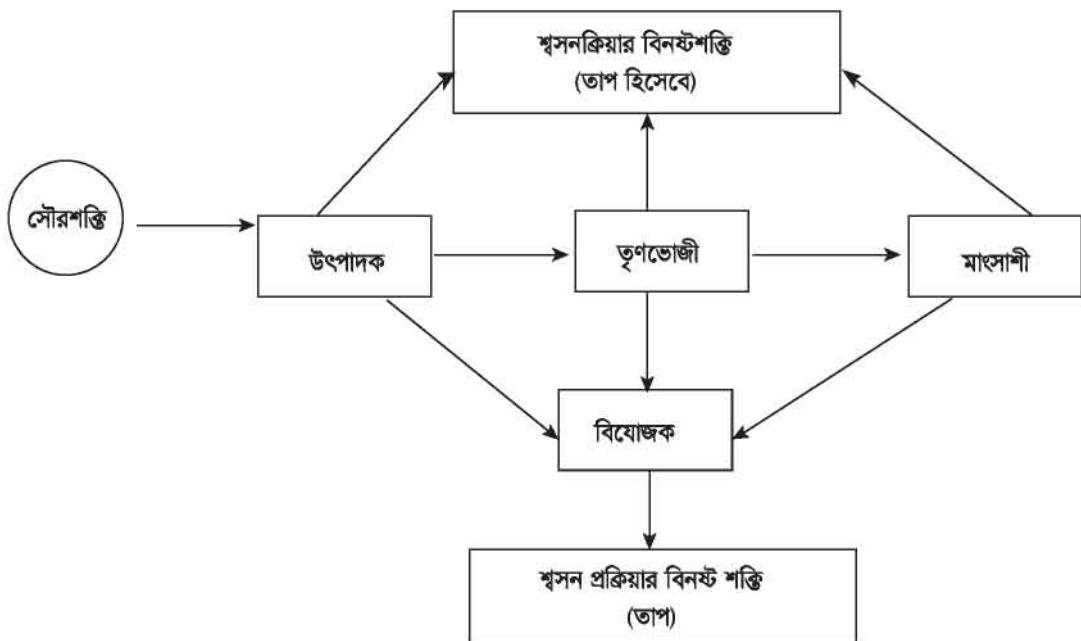


চিত্র ১৪.২ : খাদ্যজাল

পাঠ ৮ ও ৯ : বাস্তুতত্ত্বে শক্তি প্রবাহ

তোমরা জেনেছ পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল জীবই সূর্যের আলোর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ জীবজগতের সকল শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্যের বত আলো পৃথিবীতে আসে তার মাঝ শতকরা ২ ভাগ সবুজ উষ্ণিদ সালোকসংযোগের মাধ্যমে কাছে সালিগ্নে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। সালোকসংযোগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ প্রক্রিয়া চলার সময় সবুজ উষ্ণিদ বিভিন্ন

ধরনের প্রাকৃতিক যৌগ, যেমন- পানি, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, আয়রন, সালফার ইত্যাদি ব্যবহার করে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জড় ও জীবজগতের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হয়।



চিত্র ১৪.৩ : বাস্তুতন্ত্রে শক্তির একমুখী এবং পদার্থের চক্রাকার প্রবাহ

সবুজ উদ্ভিদের মাধ্যমেই সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই রাসায়নিক শক্তি বিভিন্ন প্রাণীতে খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। উৎপাদক থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ খাদক পর্যন্ত শক্তি রূপান্তরের সময় প্রতিটি ধাপে শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে উৎপাদক থেকে শক্তি যায় তৃণভোজী প্রাণীর দেহে। সেখান থেকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং দ্বিতীয় স্তরের খাদক থেকে যায় সর্বোচ্চ খাদকে। এভাবেই শক্তি প্রবাহ চলতে থাকে। প্রতি স্তরে শক্তি হ্রাস পেলেও বিযোজক যখন বিভিন্ন মৃত জীবে, বর্জ্য পদার্থে বিক্রিয়া ঘটায় তখন অজৈব পুষ্টিদ্রব্য পরিবেশে মুক্ত হয়ে পুষ্টিভাবারে জমা হয়; যা আবার সবুজ উদ্ভিদ কাজে লাগায়। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে বাস্তুসংস্থানে পুষ্টিদ্রব্য চক্রাকারে প্রবাহিত হয় এবং শক্তিপ্রবাহ একমুখী।

পাঠ ১০ : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা

পরিবেশে বাস্তুতন্ত্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। যেকোনো পরিবেশে বাস্তুতন্ত্র মোটামুটিভাবে স্বনিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতিতে যেকোনো জীবের সংখ্যা হঠাতে পারে না। প্রতিটি জীব একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে এরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সহজে এর কোনো একটি অংশ একেবারে শেষ হতে পারে না। কোনো একটি পরিবেশে বিভিন্ন স্তরের জীব সম্পদায়ের সংখ্যার অনুপাত মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে। পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটলেও বছু দিন পর্যন্ত প্রাকৃতিক

ভারসাম্য বজায় থাকে। এসো একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা এ বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করি। মনে কর কোনো একটি বনে বাঘ, হরিণ, শূকর ইত্যাদি বাস করে। এ বনে বাঘের খাদ্য হলো হরিণ ও শূকর। হরিণ ও শূকরের সংখ্যা বেড়ে গেলে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কারণ বাঘ প্রচুর খাদ্য পাবে। আবার বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে হরিণ ও শূকরের সংখ্যা কমে যাবে। হরিণ ও শূকরের সংখ্যা কমে গেলে বাঘের খাদ্যাভাব দেখা দিবে। ফলে বাঘের সংখ্যাও কমে যাবে। আবার বাঘের সংখ্যা যদি কমে যায় তবে হরিণ ও শূকরের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এভাবে হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে একটি এলাকার বাস্তুতত্ত্বের ভারসাম্য প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

কাজ : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতত্ত্বের ভূমিকা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি কর।

দল গঠন কর। যেকোনো একটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতত্ত্বের ভূমিকা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : বাস্তুতত্ত্ব, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যজাল, ফাইটোপ্লাঞ্চটন, জু-প্লাঞ্চটন

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম—

- যেকোনো একটি পরিবেশের জড় এবং জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান-প্রদান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে উঠে বাস্তুতত্ত্ব।
- অজীব এবং জীব এই দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে বাস্তুতত্ত্ব গঠিত।
- উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একে অন্যকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তির যে স্থানান্তর ঘটে তাই খাদ্যশৃঙ্খল।
- প্রকৃতিতে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। খাদ্যশৃঙ্খলের এ ধরনের সংযুক্তি খাদ্যজাল নামে পরিচিত।

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. যে সমস্ত প্রাণী ————— তারা প্রথম স্তরের খাদক।
২. বাস্তুতন্ত্রের প্রাণহীন সব উপাদান ————— উপাদান নামে পরিচিত।
৩. প্রকৃতিতে জীব বিভিন্ন ————— মাধ্যমে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
৪. প্রকৃতিতে অজীব ও জীব উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়ে ————— সচল থাকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. চিত্রসহকারে একটি পুরুরের বাস্তুতন্ত্র বর্ণনা কর।
২. প্রকৃতি কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

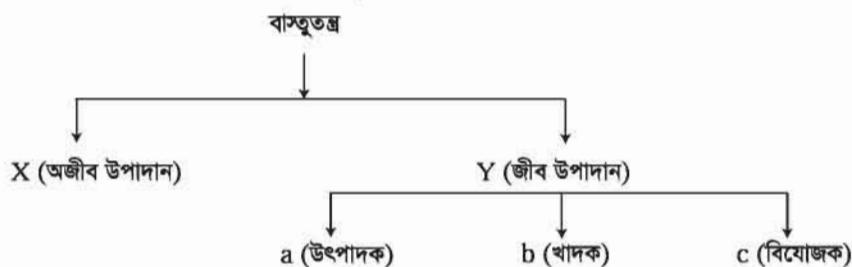
১. নিচের কোনটি প্রথম স্তরের খাদক?

- | | |
|--------------------|----------|
| ক. ফাইটোপ্ল্যাংকটন | খ. শামুক |
| গ. বাঘ | ঘ. বক |

২. নিচের কোন খাদ্যশৃঙ্খলাটি সঠিক?

- | | | | | |
|--------------------|---|---------|---|---------------|
| ক. ফাইটোপ্ল্যাংকটন | → | ছোট মাছ | → | জু-প্ল্যাংকটন |
| খ. ফল | → | পতঙ্গ | → | পাখি |
| গ. ঘাস | → | কচ্ছপ | → | ছোটমাছ |
| ঘ. ক্ষুদিপানা | → | মাছ | → | শামুক |

নিচের ছক্টি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও



৩. নিচের কোনটি C এর অন্তর্ভুক্ত?

ক. ফাইটোপ্ল্যাংকটন

গ. ব্যাকটেরিয়া

খ. জু-প্ল্যাঞ্জিটন

ঘ. কীটপতঙ্গ

৪. উপরের ছকে-

i. X এর উপর Y নির্ভরশীল

ii. a এর উপর b নির্ভরশীল

iii. a ও c পরস্পর নির্ভরশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফাহিম একটি বনে বেড়াতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছপালার মাঝে বিভিন্ন রকমের প্রাণীর উপস্থিতি লক্ষ করল। এদের মধ্যে ছিল খরগোশ, হরিণ, বানর, বাঘ, শুকর ইত্যাদি প্রাণী। সে খেয়াল করল বনের একটি অংশে বড় বড় গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে আর সে অংশে এই সকল প্রাণীর উপস্থিতি খুবই কম।

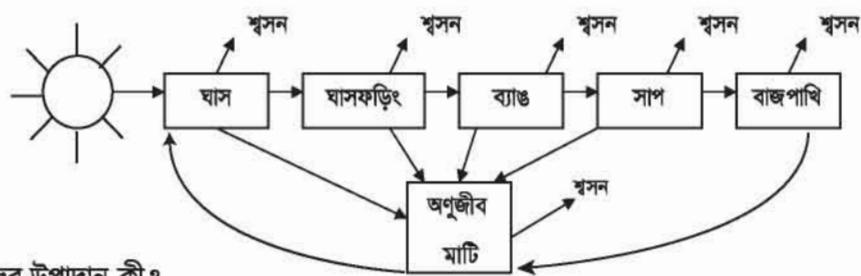
ক. বাস্তুতন্ত্র কী?

খ. বিযোজক বলতে কী বোঝায়?

গ. ফাহিমের দেখা জীবগুলো দিয়ে একটি খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি করে শৃঙ্খলটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বড় বড় গাছপালা কেটে ফেলা অংশে প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২০.



- ক. জৈব উপাদান কী ?
 খ. খাদ্যজাল বলতে কী বোঝায় ?
 গ. উপরের শৃঙ্খলটিতে শক্তিপ্রবাহ কীভাবে চলে ? ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. উদ্দীপকে পুষ্টিপ্রবাহের চক্রটি কীরূপ হবে ? বিশ্লেষণ কর।

প্রয়োগ : পরিবেশের কয়েকটি খাদ্যশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ কর। পর্যবেক্ষণ শেষে এসব খাদ্যশৃঙ্খল ব্যবহার করে পোস্টার কাগজে খাদ্যজাল তৈরি কর এবং শ্রেণিতে প্রদর্শন কর।

সমাপ্ত

২০২০

শিক্ষাবর্ষ ৮ম-বিজ্ঞান

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে ভোগার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম কখনও নিষ্পত্তি হয় না

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য